

দ্য ওশেন অ্যাট
দি এন্ড
অফ দি লেন
নিল গেইম্যান

BanglaBook.org



অনুবাদ : সালমান হক

গল্পটা ইংল্যান্ডের সাসেক্সের। এক মাঝবয়সী লোক ফিরে আসেন তার শৈশবের বাড়িতে, শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে। যে বাড়িতে কেটেছে তার শৈশব, সেটা অবশ্য অনেক আগেই মিশে গেছে ধূলোর সাথে। কিন্তু রয়ে গেছে পথের শেষের সেই পুকুরটা। সাত বছর বয়সে এখানেই ঘটেছিল তার জীবনের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা, পরিচয় হয়েছিল লেটি হেম্পস্টক আর তার মা ও নানীমার সাথে। লেটির কথা গত কয়েক যুগ মনে পড়েনি তার, তবুও যখন এই পুকুরটার পাশে বসলো (লেটির মতে যেটা একটা সমুদ্র), ফিরে আসতে লাগলো পুরনো সব স্মৃতি। সেই ভীষণ অদ্ভুত, ভীতিকর, বিপদজনক ঘটনার স্মৃতি ছেঁটে থাকতে যার মুখোমুখি হয়েছিল সে।

চল্লিশ বছর আগে এই পথের শেষে খামারটায় চুরি করা গাড়িতে বসে আত্মহত্যা করে এক লোক। কিন্তু সেই মৃত্যু যেন অনুরণন ঘটায় খামারের পরিবেশে। এমন কিছু মুক্তি পায়, যার সৃষ্টিই হয়েছে আঁধারের রাজত্ব কায়েমের জন্য। সাত বছর বয়সে কিছু না বুঝেই তাকে মুখোমুখি হতে হয় বোধাতীত সেই সত্তার। আর লেটি – বয়সের তুলনায় জ্ঞানী, যাদুকরী – কথা দেয় যেকোন মূল্যে তাকে রক্ষা করার।

নিল গেইম্যানের এই যুগান্তকারী আখ্যান, দ্য ওশেন অ্যাট দি এন্ড অফ দি লেন, একটি মডার্ন ফ্যান্টাসি-যা আপনাকে নিয়ে যাবে শৈশবের সেই ভয়, স্বপ্ন আর অদম্য ইচ্ছের দিনগুলোতে। যে দিনগুলো ছিল স্বপ্নের মতন প্রাণবন্ত, প্রজাপতির পাখনার মত রঙিন আর অন্ধকারে চকচক করা ছুরির ফলার মতই বিপদজনক।

পাঠক আপনাকে স্বাগতম এমন এক জগতে, যেখানে সৃষ্টি হয়েছে বাস্তবতা আর পরাবাস্তবতার অপরূপ এক মেলবন্ধন।

www.BanglaBook.org

ISBN 964872945-3



9 789648 729458



ব্রিটিশ ও বেশী নামকরা ও একাধিক
পুরস্কার প্রাপ্ত বই এর রচয়িতা নিল গেইম্যান
এর জন্ম ১০ই নভেম্বর ১৯৬০ সালে,
হ্যাম্পশায়ার, ইংল্যান্ডে।

কি লিখেননি তিনি?

তার লেখা বইগুলোর মাঝে রয়েছে—
আমেরিকান গডস, স্টারডাস্ট, আনানসি
বয়েজ, নর্স মিথলজি, দ্য হেভ ইয়ার্ড বুক।

নিল গেইম্যানের বইয়ের কাহিনী অবলম্বনে
বানানো হয়েছে চলচিত্র, টিভি সিরিজ
এমনকি রেডিও নাটক পর্যন্ত।

জর্জ আর আর মার্টিন শুধু শুধু বলেননি—
'নিল গেইম্যানের মতো আর কেউ নেই।'

দ্য ওশেন অ্যাট দি এন্ড অফ দি লেন
নিল গেইম্যান
অনুবাদ: সালমান হক

 *The Online Library of Bangla Books*
BanglaBook.org





দ্য ওশেন অ্যাট দি এন্ড অফ দি লেন

মূলঃ নিল গেইম্যান

অনুবাদঃ সালমান হক

The Ocean at the End of the Lane

প্রকাশকঃ সৈয়দ মোহাম্মদ রেজওয়ান

বুক স্ট্রিট পাবলিশিং হাউজ

সুট-১১, লেভেল-৩, সার্কেল আশিয়া পয়েন্ট শপিং মল, পূর্ব
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

অনুবাদসমূহঃ বুক স্ট্রিট পাবলিশিং হাউজ

প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট' ২০১৭

প্রচ্ছদঃ ক্রুব

মুদ্রণঃ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর,
ঢাকা।

গ্রাফিক্সঃ ডটপ্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা।

কম্পোজঃ অনুবাদক

পরিবেশকঃ বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বর্ণমালা মার্কেট, ৩য় তলা,
বাংলাবাজার, ঢাকা।

অনলাইন পরিবেশকঃ www.rokomari.com

www.facebook.com/bookstreetbd

মূল্যঃ ২২০ টাকা

Price: Tk. 220 only

 The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অনুবাদের কথা

নিজের প্রিয় বইগুলোর সাথে অন্যদের পরিচয় করিয়ে দিতে যেকোন বইপ্রেমীরই ভীষণ ভালো লাগে। নিল গেইম্যানের যাদুকরী লেখার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল এই বইটির মাধ্যমেই। প্রথম দর্শনেই প্রেম বলা যায়। এই অদ্ভুত সুন্দর বইটা আবেশিত করে রেখেছিল আমাকে অনেক দিন পর্যন্ত। আমার সৌভাগ্য, বাংলাদেশের পাঠকদের নিল গেইম্যানের লেখার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারছি। সে জন্যে বিশেষ ধন্যবাদ পাবেনপ্রকাশক সৈয়দ মোহাম্মদ রেজওয়ান ভাই। তার উৎসাহেই শুরু করেছিলাম বইটির কাজ। কারিগরী সহায়তার জন্যে ধন্যবাদ পাবে বিশিষ্ট লেখক কিশোর পাশা ইমন।

আশা করি সবার ভালো লাগবে আমাদের এই নিবেদন।

সালমান হক

ঢাকা

২/৭/২০১৭

উৎসর্গ

ফাইজা যাইমা

ও

আরেফিন জামান সিফাত'কে

(দীর্ঘ নীরবতাও যে বন্ধুত্বে ফটল ধরাতে পারে না তার প্রমাণ এই দু'জন)

পুকুর না সাগর?

খামারের পেছনে একদম ছোট্ট একটা পুকুর। বড় বলা যাবে না কোনভাবেই।

কিছু লেটি হেম্পস্টকের মতে ওটা নাকি একটা সাগর। কি বোকার মত কথাবার্তা! ও বলে যে ওদের পরিবার নাকি সাগর পেরিয়ে অনেক পুরনো আমলের একটা দেশ থেকে এসেছে।

ওর মা অবশ্য বলেন যে ব্যাপারটা অনেক আগের হওয়াতে লেটি ভুলে গেছে সে সম্পর্কে। আর পুরনো দেশটাও ভুলে গেছে।

লেটির নানীমা আবার বলেন যে লেটি আর ওর মা দু'জনেই ভুল। যে জায়গাটা ভুলে গেছে সেটা আসলে পুরনো দেশটা নয়। পুরনো দেশটার কথা এখনও মনে আছে তার।

বিস্ফোরিত হয়েছিল সেটা।

পূর্বাভাস

আমার পরনে একটা কালো রঙের স্যুট আর সাদা শার্ট, সাথে কালো টাই, কালো জুতো- সবকিছু চকচক করছে। সচরাচর এমন পোশাকে অস্বস্তি বোধ হয় আমার, মনে হয় যেন চুরি করে অন্য কারো পোশাক পরেছি। বড় মানুষ সাজার চেষ্টা করছি। কিন্তু আজ স্বস্তি লাগছে বরং। একদম ঠিক পোশাকগুলোই পরনে।

আমার যা কর্তব্য ছিল সকালে, তা পালন করেছি ঠিকমতো। যা যা বলার ছিল, বলেছি। একদম মন থেকে বলেছি। আর অনুষ্ঠানটা শেষ হবার পর গাড়িতে উঠে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করেছি। আমার হাতে এক ঘণ্টা সময় ছিল পুরনো সবার সাথে দেখা করে হাত মেলানো আর চা খাবার আগ পর্যন্ত। সাসেব্রের মফস্বল রাস্তাগুলো একসময় হাতের তালুর মতই চিনতাম আমি, কিন্তু সময়ের আবর্তনে এখন বেশিরভাগ রাস্তাই অচেনা ঠেকেছে।

কিছুক্ষণ পর আবিষ্কার করি টাউন সেন্টারে পৌঁছে গেছি আমি, সেখান থেকে বামে মোড় নেই। আর তখনই বুঝতে পারি যে আমার আসল গন্তব্যস্থল কোথায়। অবচেতন মনে এতক্ষণ সেই জায়গায় যাওয়ার উদ্দেশ্যেই গাড়ি চালাচ্ছি আমি। নিজের বোকামিতে নিজেই হাসলাম।

এমন একটা বাড়ি খুঁজছি আমি যেটার কয়েক যুগ ধরে কোন অস্তিত্বই নেই। একবার ভাবলাম ফিরে যাই। একটা চওড়া রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছিলাম তখন। আগে গমের ক্ষেত ছিল দুপাশে। অতীতকে না ঘাটিয়ে ফিরে যাওয়াটাই বোধহয় উচিত হতো। কিন্তু বরাবরই কৌতূহলী মন আমার।

পুরনো বাড়িটা, (যেখানে সাত বছর ছিলাম আমি, পাঁচ বছর থেকে বারো বছর পর্যন্ত), সেটা ভেঙে ফেলা হয়েছিল, হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে। আমার বাবা-মা নতুন একটা বাড়ি বানিয়েছিলেন বাগানের সীমানায়, অ্যাজালিয়া ঝোপ আর গাঢ় সবুজ ঘাসের মাঝে। সেটাও ত্রিশ বছর আগে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল।

নতুন বাড়িটার সামনে এসে গাড়ির গতি কমলাম। এই বাড়িটাকে সবসময়ই 'নতুন বাড়ি' হিসেবেই চিনবো আমি। ড্রাইভওয়েতে গাড়ি থামিয়ে সত্তর দশকের স্থাপত্যের নিদর্শন সম্বলিত বাড়িটা দেখতে লাগলাম। ভুলে গিয়েছিলাম যে বাড়িটার ইটগুলোর রঙ ছিল বাদামী, অনেকটা চকলেটের মত। নতুন বাসিন্দারা আমার মা'র শখের ছোট্ট বারান্দাটা ভেঙে ফেলেছে।

তাকিয়ে থাকলাম বাড়িটার দিকে, যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক কম স্মৃতি মানসপটে ভাসছে। অবশ্য তখনকার সময়টা খুব একটা ঘটনাবহুলও ছিল না।

কিশোর বয়সে কিছুটা সময় এখানে কাটিয়েছি আমি। কিন্তু সেই সময়টুকুকে এখন আর আমার জীবনের অংশ বলে মনে হয় না।

ড্রাইভওয়ে থেকে পেঁছাতে লাগলাম গাড়িটা।

সময় হয়ে এসেছিল, আমার বোনের হাসিখুশী বাড়িটাতে যাওয়ার, জানতাম আমি। একদম পরিপাটি করে সাজানো বাড়িটা। সেখানে এমন সব মানুষজনের সাথে কথা বলতে হবে যাদের অস্তিত্ব অনেক বছর আগেই ভুলে গিয়েছিলাম আমি। তারা নিশ্চয়ই আমার বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করবে (এক যুগ আগেই ভেঙে গেছে সেটা, সম্পর্কটায় ক্ষয় ধরেছিল বেশ আগেই, অবশেষে যা হবার তাই হলো)। বর্তমানে কোন সম্পর্ক আছে কিনা সেটাও জিজ্ঞেস করবে (নেই; আর কোনদিন কোন সম্পর্কে জড়াতে পারবো কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে আমার)। আমার ছেলেমেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করবে (বড় হয়ে গেছে প্রত্যেকে, যে যার জীবন নিয়ে ব্যস্ত), কি কাজ করছি (বেশ ভালোমতই চলে যাচ্ছে আমার, ধন্যবাদ জানিয়ে বলবো। কি কাজ করি সেটার ব্যাপারে বোধহয় কথা বলা সম্ভব না, বললেও কি বলবো সেটার ব্যাপারে নিশ্চিত না। ছবি আঁকি আমি, শিল্প নিয়ে কাজ করি, আর আমার জীবনের শূন্যতাগুলো মাঝে মাঝে পূরণ করে এসব। সবগুলো না, কিছু কিছু শূন্যতা)। গত হয়ে যাওয়া মানুষদের নিয়ে কথা বলবো আমরা, তাদের কথা স্মরণ করবো।

আমার শৈশবাকালীন সেই ছোট্ট গলিটা এখন একটা কালো কংক্রিটের সংযোগকারী রাস্তা। সেটা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ভেতরে যেতে লাগলাম। এই পথে যাবার কথা নয় আমার। কিন্তু ভালো লাগছে।

যতই সামনে এগোছি রাস্তা তত সরু হয়ে আসছে। এখন আর দু'টো গাড়ি পাশাপাশি চলাচল করতে পারবে না। আমি যখন ছোট ছিলাম তখনও রাস্তাটা এরকমই ছিল, সরু আর এবড়ো খেবড়ো, দুপাশে অসংখ্য ঝোপঝাড়।

এই উঁচুনিচু পথ ধরে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছি এখন। মনে হচ্ছে যেন শৈশবের সেই সময়গুলোতে ফিরে এসেছি। গলিটা একদম আগের মতই আছে, যদিও এর আশেপাশের সবকিছুতেই এসেছে আমূল পরিবর্তন।

ক্যারাওয়ে ফার্ম পার হয়ে আসলাম। এখানেই ষোল বছর বয়সে প্রথম ক্যালি অ্যান্ডার্সকে চুমু খেয়েছিলাম আমি। এর পরপরই মেইনে চলে যায় ওদের পুরো পরিবার। ওকে আরেকবার চুমু খাবার কিংবা ওর সাথে আরেকবার দেখা করার সুযোগ হয়নি আমার।

ক্যারাওয়ে ফার্মের পর গলির দুপাশ জুড়ে কেবল মাঠ আর মাঠ। এগুলোর মধ্যে দিয়েই চালাতে লাগলাম গাড়ি। গলিটা আগের চেয়েও সরু হয়ে আসছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

শেষ বাঁকটা ঘোরার আগেই ওটার কথা মনে পড়লো আমার। বাঁক ঘুরতেই চোখে পড়লো লাল ইটের বিশাল দালানটা।

হেম্পস্টক খামার।

এতদিন পরে খামারটাকে দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। অবশ্য কেন অবাক হলাম সেটা বলতে পারবো না, সবসময় এই খামারটাতেই এসে শেষ হয়েছে গলিটা। আর সামনে এগোনো সম্ভব না। খামারের সামনে গাড়িটা পার্ক করে রাখলাম। কি করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, আগে থেকে কোন পরিকল্পনা করে আসিনি আমি। এতদিন পরেও এখানে কেউ বসবাস করে কিনা ভাবতে লাগলাম। আসলে আমার কৌতূহলী মন জানতে চাইছে হেম্পস্টকরা এখনও আছে কিনা। সেটার সম্ভাবনা কম, তবে ওদের ব্যাপারে যতটুকু মনে আছে আমার, সাধারণ মানুষদের চেয়ে একটু আলাদা ধরনের ছিল হেম্পস্টকরা।

গাড়ি থেকে বের হতেই গরুর গোবরের গন্ধ এসে ধাক্কা দিল আমার নাকে। উঠোনটা পেরিয়ে সামনে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। কলিং বেল খুঁজে না পেয়ে কড়া নাড়লাম দরজায়। ভেতর থেকে আটকানো ছিল না দরজাটা, কেবল আলতো করে ভেজানো ছিল। ভেতরের দিকে খুলে গেলো ওটা।

এখানে বোধহয় অনেক আগে এসেছিলাম আমি, তাই না?

আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে এসেছিলাম। শৈশবের স্মৃতিগুলো মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ে যায় অন্য স্মৃতির ভিড়ে। ঠিক যেমনটা শৈশবের প্রিয় খেলনাটা এক সময় ওঠে ব্রাত্য। কিন্তু কখনোই চিরতরে হারিয়ে যায়না স্মৃতিগুলো, থেকে যায় মনের এক কোণে, আনমনে।

“কেউ আছেন?” জিজ্ঞেস করলাম।

কোন জবাব আসলো না। রুটির গন্ধ পাচ্ছি, সেই সাথে পুরনো কাঠ আর মোমের গন্ধ। ধীরে ধীরে ভেতরের অন্ধকারে চোখ সজ্জা আসলো। এবার উঁকি দিলাম আশেপাশে। কিছু না পেয়ে যখন ফেরার জন্যে ঘুরতে যাবো

তখন একজন বয়স্ক মহিলাকে ভেতর থেকে ডাস্টার হাতে বের হয়ে আসতে দেখলাম। ধূসর লম্বা চুল তার।

“মিসেস হেম্পস্টক?” জিজ্ঞেস করলাম।

আমার দিকে তাকালেব তিনি, বললেন, “হ্যাঁ, তোমাকে বোধহয় চিনি আমি। কিন্তু আমার এখন যেমন বয়স, এই বয়সে অনেক কিছুই ঠিকমত মনে করতে পারি না। তোমার পরিচয়টা বলো তো বাবা,” এমন ভঙ্গিতে কথাটা বললেন যেন একদম ছোট কারও সাথে কথা বলছেন, কিন্তু এখন আর ছোট নই আমি মোটেও।

“শেষবার যখন এখানে এসেছিলাম তখন আমার বয়স ছিল সাত কি আট”।

“তুমি তো লেটির বন্ধু? গলির মুখের বাসাটায় থাকতে?” হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে।

“আমাকে খাঁটি গরুর দুধ খেতে দিয়েছিলেন আপনি,” কথাটা বলার পরই মনে পড়লো যে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে সেই ঘটনার পর, “না, আসলে আপনি না। আপনার মা খেতে দিয়েছিলেন সেটা”। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের চেহারা আমাদের বাবা-মায়ের মত হয়ে যায়। লেটির মা’র কথা মনে আছে আমার। শক্ত গড়নের মহিলা ছিলেন তিনি। কিন্তু এখন আমার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি একদম শুকনো। তাকে তার মা’র মত দেখাচ্ছে এখন, যাকে নানীমা হেম্পস্টক বলে ডাকতাম আমি।

মাঝে মাঝে আয়নার দিকে তাকিয়ে বাবার চেহারার ছাপ খুঁজে পাই আমার নিজের চেহারায়। খুঁজে ফেরার চেষ্টা করি তার সেই হাসিটা। বাইরের যাবার আগে আয়নায় নিজেকে দেখে বলতেন তিনি, “ভালোই দেখাচ্ছে আমাকে, কি বলো?”

“লেটির সাথে দেখা করতে এসেছো?” মিসেস হেম্পস্টক জিজ্ঞেস করলেন।

“ও আছে এখানে?” অবাক হয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম। দূরে কোথাও চলে গিয়েছিল ও, অ্যামেরিকা বোধহয়।

“চায়ের পানি চড়াতে এসেছিলাম আমি। খাবে নাকি এক কাপ?” কিছুক্ষণ দ্বিধাবোধ করে বললাম যে তিনি কিছু মনে না করলে আগে পুকুরটা দেখতে চাই আমি।

“পুকুর?”

লেটি অবশ্য পুকুর বলতে রাজি ছিল না ওটাকে। “ও তো সমুদ্র বলে ডাকতো ওটাকে,” বললাম।

হাতের ডাস্টারটা ড্রেসারের ওপর নামিয়ে রাখলেন তিনি। “সমুদ্রের পানি তো খাওয়া যায় না, তাই না? লবণাক্ত, রক্তের মত। রাস্তা মনে আছে তোমার? বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে সামনে এগোলেই চোখে পড়বে ওটা”।

যদি একঘন্টা আগে আমাকে জিজ্ঞেস করা হতো যে পথটা মনে আছে কিনা তাহলে নিশ্চিত না বলতাম। এমনকি লেটি হেম্পস্টকের নামটাও মনে আসতো না আমার। এখন এই হলওয়েতে দাঁড়িয়ে সবকিছু মনে পড়ছে, মনের আনাচ কানাচ থেকে স্মৃতিগুলো এসে ভিড় জমাচ্ছে। মলিন সব স্মৃতি। এই সময় যদি কেউ আমাকে বলতো যে আমার বয়স সাত বছর, তাহলে তার কথা মেনে নিতে খুব একটা কষ্ট হতো না।

“ধন্যবাদ,” তাকে বললাম আমি।

পেছনের দরজা দিয়ে বাইরের বের হয়ে আসলাম। মুরগীর খোঁয়াড় ডানদিকে রেখে উঠোন পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলাম। দুপাশে সারি সারি হ্যাজেল গাছ। ওখান থেকে বাদাম কিছু কাঁচা বাদাম ছিড়ে নিয়ে পকেটে পুরলাম।

এরপরেই পুকুরটা, জানি আমি। সামনের ছাউনিটার পার হয়ে গেলেই ওটা চোখে পড়বে।

পুকুরটার সামনে আসতেই এক ধরণের প্রশান্তিতে ভর উঠলো মন। আর সেই প্রশান্তির ছোঁয়ায় সজীব হয়ে উঠলো মলিন স্মৃতিগুলো।

আগের চেয়ে ছোট লাগছে পুকুরটা। হাঁটার রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা পুরনো ছাউনি। আর সেই ছাউনির নিচে একটা পুরু কাঠের তৈরি বেঞ্চ। দেখে মনে হচ্ছে কয়েক বছর আগে সবুজ রঙ করা হয়েছে ওটাকে।

বেঞ্চটাতে বসে পুকুরের পানিতে আকাশের প্রতিবিশ্বের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। দেখতে লাগলাম ভেসে বেড়ানো পদ্ম পাতাগুলো। কিছুক্ষণ পর পর একটা দুটা বাদাম ছুড়ে মারছি পুকুরটার দিকে। পুকুরটাকে সমুদ্র বলে ডাকতো লেটি।

এটা তো আসলে সমুদ্র না, তাই না?

আমার চেয়ে খুব একটা বড় ছিল না লেটি। বড়জোর এগারো হবে, আর আমার বয়স... সেই জন্মদিনে অনুষ্ঠানটার ক’দিন পর ওর সাথে দেখা হয়েছিল আমার। তারমানে সাত বছর বয়সে ওর সাথে পরিচয় হয়েছিল আমার।

পুকুরের পানিতে কখনো নেমেছিলাম কিনা সেটা ভাবতে লাগলাম। ওকে কি কখনও পুকুরটাতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম আমি? ওকে পুকুরটায় নামতে দেখেছিলাম, সেটা মনে আছে। আমাকেও বোধহয় সেখানে নামতে বাধ্য করেছিল ও।

কোথায় চলে গেছে ও? অ্যামেরিকা? নাহ, অস্ট্রেলিয়া। সেখানেই আছে ও, অনেক দূরে।

আর এটা সমুদ্র ছিল না কখনোই। এটা আসলে একটা সাগর।

লেটি হেম্পস্টকের সাগর।

এই কথাটা মনে হতেই একসাথে সব স্মৃতি মনে পড়ে গেলো আমার।



বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন
বাংলা বই এর পিডিএফ
ডাউনলোড করার জন্য
আমাদের ওয়েবসাইটে
(**BANGLABOOK.ORG**)
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :



অধ্যায় ১

আমার সপ্তম জন্মদিনের দাওয়াতে কেউ আসেনি।

এক টেবিল ভর্তি জেলি, ট্রিফলস আর ওয়েফারের পেস্ট। প্রতিটা পেস্টের পাশে রাখা ছিল একটা করে জন্মদিনের টুপি। টেবিলের মাঝে শোভা পাচ্ছিল জন্মদিনের কেকটা, সেটায় একটা বইয়ের ছবি আঁকা। মা আমাকে পরে বলেছিলো, যখন বেকারিতে কেকের অর্ডার দিতে যান তারা, সেখানকার কর্মচারী কেকে বইয়ের ছবি আঁকতে হবে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আমার বয়সী ছেলেদের কেকে সাধারণত ফুটবল কিংবা স্পেসশিপের ছবি আঁকার ফরমাশ পান তারা। এই প্রথম বই আঁকতে হবে। যখন মা বুঝে গেলো যে কেউ আসবে না অনুষ্ঠানে, কেকের ওপর সাতটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলেন। ওগুলো ফুঁ দিয়ে নেভালাম আমি। কেকের ছোট একটা টুকরা খেতে হল আমাকে। আমার ছোটবোন আর তার এক বান্ধবীও খেল কেক (তারা দু'জন শুধু পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত আছে এখানে), এরপরে হাসিমুখে বাগানে চলে গেল খেলতে।

কিছু ছোটখাট খেলার ব্যবস্থা করেছিলো মা, কিন্তু কেউ উপস্থিত না থাকাতে (এমনকি আমার বোনও না), সেগুলো আর খেলা হলো না। খবরের কাগজ মোড়ানো উপহারের বাক্সটা খুলে দেখি ওটার ভেতরে নীল রঙের একটা ব্যাটম্যান। কেউ আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আসেনি সেটা ভেবে দুঃখবোধ করলেও, ব্যাটম্যানকে পেয়ে কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে গেলাম সেই দুঃখ। তবে এটাই আমার জন্মদিনের একমাত্র উপহার নয়। এক সেট বইও উপহার পেয়েছি। সি এস লুইসের নার্নিয়ার বইগুলোর একটা বক্সসেট। সেগুলো নিয়ে ওপরে আমার ঘরে চলে আসলাম। ডুবে গেলাম যাদুর গল্পে। এরকমটাই ভালো লাগে আমার। মানুষের চেয়ে বইয়ের সাহচর্য অনেক বেশি নিরাপদ।

এছাড়াও বাবা-মা আমাকে দিয়েছে গিলবার্ট আর সুলিভানের (ভিক্টোরিয়ান আমলের বৃটিশ অপেরা শিল্পী) একটা এলপি। তিন বছর বয়স থেকেই তাদের গান শুনতে ভালো লাগতো আমার। ভালো লাগাটা শুরু হয় যখন আমার ছোট ফুপু আমাকে থিয়েটারে নিয়ে গিয়েছিলেন একটা নাটক দেখাতে। সেখানেই তাদের যাদুকরী কাজগুলোর সাথে প্রথম পরিচয়। তাদের গানের কথায় থাকে পরী আর রঙধনুর গল্প। ছোট থাকতে পারীদের অস্তিত্ব নিয়ে কোন

অবিশ্বাস ছিল না আমার। একসাথে সেই নাটকটা দেখার কিছুদিন পরই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান আমার ফুপু।

সন্ধ্যাবেলা বাবা কাজ থেকে ফিরলো হাতে করে একটা কার্ডবোর্ডের বাড নিয়ে। আর সেই কার্ডবোর্ডের বাডের ভেতরে কালো রঙের এক ছোট্ট বিড়ালছানা। সেটা ছেলে নাকি মেয়ে বিড়াল তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছিলো না। দেখার সাথে বিড়ালটার নাম রাখি আমি 'ফ্লাফি'। ফ্লাফিকে আমার পছন্দ হয় ভীষণ।

ফ্লাফি রাতে আমার সাথে ঘুমোতো। যখন আমার বোন আশপাশে থাকতো না, ওর সাথে মাঝেমাঝে কথা বলতাম আমি। হয়তো এটা আশাও করেছিলাম যে মানুষের ভাষাতে জবাব দেবে ফ্লাফি- কিন্তু তেমনটা কখনোই হয়নি। আমি অবশ্য কিছু মনে করিনি। সাত বছরের একটা বাচ্চা ছেলে, যার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কেউ আসেনি তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে ফ্লাফির চেয়ে ভালো আর কেউ হতে পারতো না। আমার নেওটা হয়ে যায় ও কিছুদিনে মধ্যেই। আমার সব কাজ মনোযোগ দিয়ে, চোখ বড় বড় করে দেখতো।

স্কুলে আমার ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়েদের আমি কখনও জিজ্ঞেস করিনি যে কেন আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আসেনি তারা। জিজ্ঞেস করার দরকারও ছিল না অবশ্য। তাদের কেউই আমার বন্ধু নয়, সহপাঠী। বন্ধু আর সহপাঠীদের মধ্যে বিস্তর ফারাক।

যখন কারো সাথে বন্ধুত্ব হয় আমার, ধীরে ধীরে সময় নিয়ে ঘটে সেটা। আগে থেকেই অনেক বই ছিল আমার আর এখন একটা বিড়াল ছানাও আছে। ডিক হুইটিংটন আর তার বেড়ালছানার গল্পের মতন। যদি ফ্লাফি আরো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় তাহলে আমাদের গল্পটা হবে মিলারের ছেলে আর পুস ইন বুটসের মত। ফ্লাফি আমার বালিশে গুয়ে থাকে। ড্রাইভওয়েতে বেড়ার পাশে বসে অপেক্ষা করে কখন স্কুল থেকে ফিরবো। সেভাবে অপেক্ষারত অবস্থাতেই এক মাস পরে একদিন ট্যাক্সি নিচে চাপা পড়ে ও। সেই ট্যাক্সিতে করেই থাকতে এসেছিলেন এক ওপাল মাইনার^(বনিশ্রমিক) ঘটনার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে আমার ফ্লাফিকে দেখলাম না ড্রাইভওয়েতে। তার বদলে একজন লম্বা চওড়া, তামাটে গায়ের রঙের লোক দাঁড়িয়ে ছিল রান্নঘরে। চেক শার্ট আর জিন্সের প্যান্ট পরনে তার। বসে বসে কফি খাচ্ছিলো সে, সেটা গন্ধ গুঁকেই বুঝতে পারি। সেই আমলে সবার কফিই ছিল ইন্সট্যান্ট কফি,

কালচে বাদামী রঙের পাউডারগুলো গরম পানিতে মেশালেই তৈরি হয়ে যেত।

“আমি এখানে আসার পর ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা হয়েছে,” উৎফুল্ল ভঙ্গিতে আমাকে কথাটা বললো সে। “কিন্তু চিন্তার কোন কারণ নেই,” তার মুখের ইংরেজিতে কেমন যেন একটা টান আছে। সেই প্রথম দক্ষিন আফ্রিকান ইংরেজি শুনেছিলাম আমি।

তার সামনে টেবিলের ওপর একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স রাখা।

“কালো বিড়ালছানাটা কি তোমার ছিল?” জিজ্ঞেস করলো সে।

“ওর নাম ফ্লাফি,” উত্তর দিলাম।

“তো হ্যাঁ, যেমনটা বলছিলাম। একটা দুর্ঘটনা হয়েছে এখানে আসার পর। চিন্তার কিছু নেই। মৃতদেহটার সৎকারের ব্যবস্থা করে ফেলেছি ইতিমধ্যে। তোমাকে কিছু করতে হবে না। সব ঝামেলা শেষ। বাক্সটা খোল।”

“কি?”

বাক্সটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, “খোল বাক্সটা,” বললেন।

সেই ওপাল মাইনার অনেক লম্বা ছিলেন। সবসময়ই তার পরনে চেক শার্ট আর জিপ্সের প্যান্ট দেখেছি আমি, শেষবার বাদে। গলায় সবসময় মোটা একটা সোনার চেইন ঝুলানো থাকতো তার। ওটাও শেষবার চোখে পড়েনি। বাক্সটা খোলার কোন ইচ্ছেই ছিল না আমার। নিজের মত থাকতে চাচ্ছিলাম। কাঁদতে ইচ্ছে করছিল আমার মৃত বিড়ালছানাটার জন্যে। কিন্তু কেউ সামনে থাকলে সেটা সম্ভব না। আমার একাকীত্বের সঙ্গীকে বাগানের একদম কোণায়, রোডেনড্রন ঝোপগুলোর পাশে উজ্জ্বল সবুজ ঘাসের নিচে সমাহিত করতে চাই আমি। যেখানে কেউ যায় না আমি ছাড়া।

বাক্সটা নড়ে উঠলো।

“তোমার জন্যে কিনেছি,” বললো লোকটা। “সবসময় ঋণ শোধ করি আমি”।

সামনে ঝুঁকে বাক্সটার ওপরের ফ্ল্যাপ খুললাম। ভাবছিলাম পুরোটাই হয়তো কোন কৌতুক, ভেতরে অপেক্ষা করছে ফ্লাফি। কিন্তু না, বাক্সটার ভেতর থেকে হিংস্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে কমলা একটা মুখ। ওপাল মাইনার বাক্সটা থেকে বিড়ালটাকে বের করলো।

বিশাল একটা কমলা ডোরাকাটা টমক্যাট। এক কান নেই। আমার দিকে রাগী রাগী চোখে তাকিয়ে আছে। বাজত পুরে রাখায় মেজাজ বিগড়ে গেছে মনে হচ্ছে। অবশ্য কারোরই একটা বাজের মধ্যে বন্দি থাকতে ভালো লাগার

কথা নয়। হাত বাড়িয়ে ওকে আদর করার চেষ্টা করলাম মনের মধ্যে অপরাধবোধ নিয়েই, কিন্তু দূরে সরে গেলো বিড়ালটা। এরপর আমার উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ হিসহিস করে ঘরের এক কোণায় গিয়ে বসে পড়লো। সেখান থেকে বিরক্ত ভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকলো আমাদের দিকে।

“একটা বিড়ালের বদলে আরেকটা বিড়াল,” নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো ওপাল মাইনার। এরপর হাত দিয়ে আমার চুল এলোমেলো করে দিয়ে হলরুমে চলে গেলো। রান্নাঘরে এখন শুধু আমি আর বিড়ালটা।

“ওর নাম মঙ্গটার,” দরজা বাইরে থেকেই বললো লোকটা।

পুরো ব্যাপারটাই জঘন্য একটা কৌতুক মনে হচ্ছে আমার কাছে। রান্নাঘরের জানালাটা খুলে দিলাম যাতে বিড়ালটা ঐদিক দিয়ে বাইরে যেতে পারে। এরপর আমার ঘরে চলে আসলাম। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফ্ল্যফির জন্যে কাঁদলাম কিছুক্ষণ। সন্ধ্যার বাবা মা আসার পর ফ্ল্যফির কথা একবারের জন্যেও জিজ্ঞেস করলো না।

মঙ্গটার আমাদের বাসায় এক দু সপ্তাহ ছিল। ওর জন্যে প্রতিদিন বাটিতে করে খাবার রেখে দিতাম। একবার সকালে, একবার রাতে। ফ্ল্যফির জন্যেও একই কাজ করতাম আমি। মঙ্গটারকে সারাদিন বাসার মধ্যে খুব কমই দেখা যেতো। শুধু বাগানে গেলে ঝোপঝাড়ের আড়ালে ওর উপস্থিতি বোঝা যেতো মাঝেমাঝে, ওর গায়ের রঙের কারণে। কেবল খাবারের জন্যে ভেতরে আসতেন লাটসাহেব।

ফ্ল্যফির কথা খুব মনে পড়তো আমার। ছোট হলেও এটা জানতাম যে কেউ মারা গেলে তার জায়গা কখনো অন্য কেউ দখল করতে পারেনা। কিন্তু ভুলেও বাবা মার সামনে সেটা বলা সম্ভব ছিল না। আমার মন খারাপ হবার কারণটা তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভবই হতো না। একটা বিড়াল যাবে তো সে জায়গায় অন্য বিড়াল আসবে এটাই ছিল তাদের নীতি। আর সেবার ওপাল মাইনার আমার বিড়ালছানাকে মারার ক্ষতিপূরণ হিসেবে মঙ্গটারকে নিয়ে এসেছিল।

(এসব কিছুই আবার মনে পড়ে গেলো আমার। জানি এর সাথে অন্য স্মৃতিগুলোও ধীরে ধীরে ভেসে উঠবে মানসপটে। বসে আছি সেই ছোট পুকুরটার পাশে, একটা সবুজ বেঞ্চে। লেটি হেম্পস্টেকের মতো যেটা একটা সাগর)।

অধ্যায় ২

শৈশব যে খুব একটা হাসিখুশি ছিল তা নয়, তবে অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকতাম বিধায় মানিয়ে নিতে তেমন একটা সমস্যা হয়নি। বাস্তবের চেয়ে বইয়ের জগতেই ডুবে থাকতাম বেশি।

আমাদের বাসাটা ছিল বিশাল, অনেকগুলো ঘর ছিল ওতে। যখন কেনা হয়েছিল ওটা, বাবার টাকা পয়সার কোন অভাব ছিল না। কিন্তু পরে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির সাথে সাথে এই বিশাল বাড়িটাই গলার কাটায় পরিণত হয়।

একদিন মা-বাবা তাদের ঘরে ডেকে পাঠায় আমাকে। প্রথমে ভেবেছিলাম যে অজান্তেই কোন দুষ্টামি করে ফেলেছি বুঝি, সেটার শাস্তি দেয়ার জন্যেই ডাকছে। কিন্তু না, আমাকে জানানো হয় যে অর্থনৈতিক ভাবে একটু খারাপ অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদের। তাই কিছু পরিবর্তন আনতে হবে জীবনযাত্রায়। আর সেই পরিবর্তনের ধকল যাবে আমার ওপর দিয়ে। সিঁড়িঘরের ওপরে যে ছোট শোবার ঘরটা আছে, আমার শোবার ঘর, সেটা ছেড়ে দিতে হবে। খুব খারাপ লেগেছিল আমার; ওঘরে ছোট্ট একটা বেসিন লাগিয়ে দিয়েছিলো বাবা, একদম আমার মাপের। আবার ঘরটার একদম নিচেই টেলিভিশন রুম। রাতের বেলা যখন একা শুয়ে থাকতাম, সেখান থেকে বড়দের কথা বলার আওয়াজ ভেসে আসতো আমার আধ-খোলা দরজা দিয়ে। তখন একাকীত্ববোধ কিছুটা হলেও কমতো। আরেকটা কারণে ঘরটা খুব প্রিয় ছিল আমার, রাতের বেলা যখন সব ঘরের বাতি নিভিয়ে দেয়া হতো, তখন হলওয়ে থেকে মৃদু আলোর রেখা এসে পড়তো আমার ঘরে। সেই মিটিমিটি আলোয় গল্পের বই পড়তাম আমি, কারণ মাঝেমাঝেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হতো না অনেক গল্প। আর আমার ঘরটা সিঁড়ির ওপরে হওয়াতে কেউ বিরক্ত করতেও আসতো না।

আমাকে নির্বাসিত হতে হয় আমার বোনের বিশাল বেডরুমে। অবশ্য সেখানে গিয়ে খুব একটা যে খারাপ লাগে আমার তা নয়, কারণ ঘরটাতে আগে থেকেই তিনটা বিছানা পাতা ছিল, যার একটা আবার জানালার পাশে। সেই জানালা দিয়ে পাশের ব্যালকনিতে লাফিয়ে নামতে খুব ভালো লাগতো আমার। আর বর্ষাকালে বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগতো চোখেমুখে। মনে হতো যেন কোন বিশাল বনে আকাশের নিচে বৃষ্টির মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছি। কিন্তু আমার বোনের সাথে সব ব্যাপার নিয়েই তর্ক করতাম, এটা

আমাদের দু'জনেরই একটা স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। যেমন আমি দরজা খোলা রাখা ছাড়া শুতে পারতাম না, কিন্তু সে দরজা দিয়ে শোবে। এটা নিয়ে প্রথম দিনেই বড়সড় একটা বচসা হয় আমাদের মাঝে। তখন মা আসে সমস্যার সমাধান নিয়ে। দরজার বাইরে একটা তালিকা টাঙ্গিয়ে দেয় সে। একদিন ঘরটায় আমার ইচ্ছে মোতাবেক সব হবে আর এর পরের দিন আমার বোনের ইচ্ছে মার্কিন। এর অর্থ একদিন পরপর রাতের বেলা প্রায় না ঘুমিয়ে কাটাতে হতো আমাকে, কারণ দরজা বন্ধ থাকলেই প্রচণ্ড ভয় পেতাম আমি।

এরপর থেকেই আমার আগের ঘরটায় শুরু হয় নানা ধরনের লোকের আনাগোনা। তাদের সবাইকেই সন্দেহের চোখে দেখতাম আমি। আমার বিছানায় ঘুমোচ্ছে তারা, আমার বেসিন ব্যবহার করছে। এটা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যেতো। এক অস্ট্রিয়ান মহিলা ছিলেন কিছুদিন, আমাকে এই বলে ভয় দেখাতেন যে মাথা খুলে রেখে নাকি সিলিঙে হেঁটে বেড়াতে পারতেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের এক প্রকৌশলবিদ্যার ছাত্র ছিল রুমটায় কিছুদিন। এরপর এক মার্কিন দম্পতি, তাদের অবশ্য বাসা থেকে জোর করে বের দেন মা। তারা নাকি ঘরটাকে কলঙ্কিত করছিলো। আর এখন সেখানে থাকে ওপাল মাইনার।

সাঁউথ আফ্রিকান তিনি, যদিও তার সব টাকা পয়সার উৎস অস্ট্রেলিয়ার ওপাল (এক ধরনের খনিজ পাথর) খনি। আমাকে আর আমার বোনকে একটা করে ওপাল পাথর দিয়েছিলেন তিনি। কালো রঙের পাথরগুলোর ভেতরটা আবার রঙিন। এই উপহার পাওয়াতে আমার বোনের খুব পছন্দ হয় তাকে। কিন্তু আমি তাকে কখনোই আমার বিড়াল ছানাকে খুনের জন্যে ক্ষমা করতে পারিনি।

বসন্তকালীন ছুটির প্রথম দিন। আগামী তিন সপ্তাহ বন্ধ থাকবে স্কুল। সকাল সকাল উৎফুল্ল চিত্তে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। সারাদিন যা ইচ্ছে করতে পারবো, এটা ভাবতেই ভালো লাগছিল। বই পড়া যাবে, ঘোরাঘুরি করা যাবে।

হাফপ্যান্ট, টিশার্ট, স্যান্ডেল পরে নিচে রান্নাঘরে চলে আসলাম। বাবা রান্না করছে, মা এখনও ঘুমে মগ্ন। পায়জামার ওপর একটা ড্রেস গাউন পরে আছে সে। প্রতি শনিবার সকালের নাস্তা তৈরির দায়িত্ব বাবার।

“আমার কমিকস কোথায়?” জিজ্ঞেস করলাম। প্রতি শুক্রবার বাসায় আসার পথে আমার জন্যে একটা ‘স্ম্যাশ’ কমিকস নিয়ে আসতো সে, আর শনিবার সকাল বেলা মজা করে সেটা পড়তাম আমি।

“গাড়ির পেছনের সিটে। টোস্ট খাবে তুমি?”

“হ্যাঁ,” বললাম। “কিন্তু পোড়া না হয় যেন”।

টোস্টার ব্যবহার করতে পছন্দ করতো না বাবা। কয়লার যে গ্রিল মেশিনটা ছিল সেটায় টোস্ট করতেন, তাই পুড়ে যেতো সবসময়।

বাইরে ড্রাইভওয়েতে গিয়ে আশেপাশে তাকালাম। এরপর বাসায় ফিরে রান্নাঘরের দরজা খুলে আবার ভেতরে ঢুকলাম। এই দরজাটা খুব পছন্দ আমার। কারণ দুই দিকেই খোলে ওটা। এর ফলে আমাদের আগের মালিকদের যে বাবুর্চি, চাকর-বাকররা ছিল- খাবার ভর্তি পেমেন্ট নিয়ে তাদের আসা যাওয়ায় কোন অসুবিধে হতো না।

“বাবা? গাড়িটা কোথায়?”

“ড্রাইভওয়েতে”।

“নাহ, সেখানে তো কিছুই নেই”।

“কি?”

এইসময়টা ফোন বেজে উঠলে হলওয়েতে চলে গেলো বাবা। ফোনে তাকে কারো সাথে উদ্বিগ্ন গলায় কথা বলতে শুনলাম।

একটা চেয়ারে উঠে গ্রিলটা বন্ধ করে দিলাম।

“পুলিশ থেকে ফোন করেছিল,” বাবা বললো, “কেউ একজন আমাদের গাড়িটাকে গলির শেষ মাথায় পড়ে থাকতে দেখে স্টেশনে ফোন দিয়েছিল। আমি অবশ্য বলেছি যে চুরির ব্যাপারটা কেবলই জানলাম। এখন গলির শেষ মাথায় গেলে তাদের সাথে দেখা হয়ে যাবে। টোস্ট!”।

গ্রিলের নিচ থেকে প্যানটা বের করে আনলেন তিনি। যথারীতি টোস্টগুলোর একপাশ পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

“আমার কমিক্সটা পেয়েছে তারা? নাকি ওটা চুরি হয়ে গেছে?”

“জানি না। তোমার কমিক্সে ব্যাপারে কিছু বলেনি তারা”।

টোস্টের পোড়া অংশের ওপর পীনাট বাটার লগ্নালাম বাবা। এরপর ড্রেসিং গাউনটা খুলে একটা ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে জুতা পড়ে নিলো। গলি ধরে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম আমরা। হাঁটতে হাঁটতেই টোস্ট চিবোচ্ছে বাবা। আমার টোস্টটা হাতে ধরে আছি, খাইনি এখনও।

সরু গলিটা ধরে প্রায় পাঁচ মিনিটের মতন হাঁটলাম আমরা। দুপাশে সারি সারি ক্ষেত। আমাদের পেছন পেছন একটা পুলিশের গাড়ি আসছিলো। গাড়ি থামিয়ে বাবার নাম ধরে ডাক দিলেন ওটার চালক।

বাবা যখন পুলিশের লোকটার সাথে কথা বলায় ব্যস্ত, পোড়া টোস্টটা পিঠের পেছনে লুকিয়ে রাখলাম। আমার পরিবারে যদি অন্য সব সাধারণ গৃহস্থালির মত সাদা রুটি কেনা হতো, যেগুলো খুব সহজেই ঢুকে যায় টোস্টারের ভেতর, তাহলে বেশ হতো। কিন্তু না, আমাদের বাসায় বাদামি রুটিগুলো আসতো স্থানীয় এক বেকারি থেকে, তাদের সাথে চুক্তি করেছিলো বাবা। এগুলোই নাকি বেশি সুস্বাদু লাগতো তার কাছে, যেটা একদম বানোয়াট কথা মনে হতো আমার। ভালো রুটি হবে সাদা, আগে থেকে কাটা আর কোন স্বাদ থাকবে না সেটার।

পুলিশের লোকটা গাড়ি থেকে বের হয়ে প্যাসেঞ্জার সিটের দরজাটা খুলে আমাকে ভেতরে ঢুকতে বললেন। বাবা ড্রাইভারের পাশের সিটটায় বসলো। গলিটা তখনও পাকা করা হয়নি। এবড়খেবড়ো পথ দিয়ে কোনমতে একটা গাড়ি চলতে পারত। আর খামারের বড় বড় গাড়িগুলো বারবার যাওয়া আসা করায় সেটার অবস্থা আরো করুণ হচ্ছিল দিনদিন।

“আজকালকার ছেলে ছোকরাদের কাজকর্ম বুঝি না,” পুলিশ অফিসারটা গজগজ করতে লাগলেন আপনমনে। “যখন ইচ্ছে একটা গাড়ী চুরি করে ঘুরে বেড়াও। আর ইচ্ছে মতন ফেলে যাও সেটা যেখানে খুশি। স্থানীয় কারো কাজ এটা আমি নিশ্চিত”।

“এত দ্রুত যে গাড়িটার হদিস পাওয়া গেছে তাতেই খুশি আমি,” বাবা বললো।

ক্যারাওয়ে খামারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা মেয়েকে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। চুলগুলো সোনালী তার। সে যেমন তেমন সোনালী নয়, একদম উজ্জ্বল সোনালী। প্রায় সাদাই মনে হবে দূর থেকে। আর গালগুলো লাল, একদম লাল। আমার পোড়া টোস্টটা হাত দিয়ে ঢেকে রাখলাম।

“এখানে যারা থাকে তাদের কথা ভেবে অবাক না হয়ে পারিনি,” পুলিশ অফিসারটা বললেন। “যেকোন জায়গায় যেতে হলে এটা পথ হাঁটতে হয়”।

গলির বাঁকটা পার হয়ে সাদা মিনিভ্যানটা চোখে পড়লো আমাদের। ক্ষেতের ভেতরে যাবার গেটটার সামনে পড়ে আছে গাছ, চাকাগুলো ডুবে আছে

বাদামী কাদার ভেতর। ওটার একটু সামনে গাড়িটা পার্ক করা হলে ঘাসের ওপর বের হয়ে আসলাম আমরা। এরপর তিনজন হেঁটে গেলাম গাড়িটার কাছে। পুলিশ অফিসারটা বাবাকে স্থানীয়দের অপরাধপ্রবণতার কথা বলেই যাচ্ছিলেন তখনও। তিনি একদম নিশ্চিত যে এখানকার কারো কাজ এটা। এরপর বাবা তার বাড়তি চাবিটা দিয়ে প্যাসেঞ্জার সিটের দরজাটা খুললো। “পেছনের সিটটাতে কিছু একটা ফেলে গেছে কেউ,” এটুকু বলে সামনে ঝুঁকে পেছনের সিটের ওপর থাকা নীল রঙের কম্বলটা ধরে টান দিলো সে। ওটার নিচেই আছে জিনিসটা। পুলিশের লোকটা বাবাকে সেটা করতে নিষেধ করতে একটু দেরি করে ফেললেন। আমিও মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম পেছনের সিটটার দিকে, কারণ আমার কম্বলটা সেখানেই থাকার কথা।

যে জিনিসটা চোখে পড়লো তাকে একটা ‘জিনিস’ই বলবো। লোক নয়। ছোটবেলায় একটু ভিন্ন স্বভাবের ছিলাম আমি, রাতের বেলা দুঃস্বপ্ন দেখলে খুব সহজেই ভয় পেতাম। তা সত্ত্বেও বাবা-মা’কে একবার রাজি করিয়েছিলাম আমাকে মাদাম তুসোর মোমের জাদুঘরে নিয়ে যাবার জন্যে। সেখানকার চেম্বার হররস দেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল আমার। একটা ভূতের গল্পের বইয়ে সেটার নাম পড়েছিলাম আমি। ড্রাকুলা, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন আর নেকড়ে মানবকে দেখে শিহরিত হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে টুঁকে ভীষণ হতাশ হতে হয় আমাকে। কেবল সারি সারি অপরিচিত, বিকট দর্শন বয়স্ক পুরুষ আর মহিলার মূর্তি ছিল ঘরটাতে। মূর্তিগুলো যাদের তারা সবাই নাকি নিজেদের পরিবারের লোকজনকে খুন করেছিলো। কেউ বিষ দিয়ে, কেউ ছুরি দিয়ে। সেগুলোরই বাস্তব দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মোম দিয়ে। যে গাইড আমাদের ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন জাদুঘরটা, তার মতে- মৃত পরিবারের সদস্যের দেহগুলো নাকি বিক্রি করা হতো ‘অ্যানাটমি’র জন্যে। ‘অ্যানাটমি’ শব্দটার প্রতি তখন থেকেই একটা ভয় কাজ করতে শুরু করে আমার। আমার ধারণা ছিল ‘অ্যানাটমি’ অর্থ নিজের পরিবারের মানুষদের খুন করা।

চেম্বার অফ হররস থেকে ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে যাইনি আমি, কারণ মোম দিয়ে বানানো দৃশ্যগুলো অতটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি আমার কাছে। তাছাড়া মৃতদেহগুলোকে মৃত মনে হচ্ছিল না কারণ কখনো জীবিতই ছিল না ওগুলো।

আমাদের গাড়ির পেছনের সিটে নীল কম্বলের নিচে (কম্বলটা আমার চেনা, কারণ ছোট থাকতে ঠাণ্ডা লাগলে ওটাই গায়ে দিতাম আমি) যে জিনিসটা (নাকি মৃতদেহ বলাটাই উচিত হবে?) ছিল, সেটা কোনদিন জীবিত ছিল কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ হয় আমার। দেখতে অনেকটা ওপাল মাইনারের মত, কিন্তু চেক শার্ট আর জিন্স নেই পরনে। সেগুলোর জায়গা দখল করেছে কোট, প্যান্ট আর টাই। কালো চুলগুলো চকচক করছিলো। চোখ খোলা, ঠোট দু'টো নীলচে। কিন্তু চেহারার লাল রঙটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তখনও। মৃতদেহটার গলায় কোন সোনার চেইন ছিল না।

ওটার নিচে আমার স্ম্যাশ কমিঞ্জের দোমড়ানো কপিটা দেখতে পাচ্ছিলাম, যেটার প্রচ্ছদে শোভা পাচ্ছে ব্যাটম্যানের ছবি।

তখন আমাকে কে কি বলেছিল সেটা ভুলে গেছি, শুধু এটুকু মনে আছে যে আমাকে মিনিভ্যানটা থেকে দূরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। রাস্তার অন্য পাশে গিয়ে একা একা দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। পুলিশের লোকটা বাবার সাথে কথা বলছিলেন আর নোটবুকে এটা ওটা টুকে নিচ্ছিলেন।

আমার দিকে নজর ছিল না কারো, তাই এই সুযোগে একবার হাতের টোস্টটাতে কামড় বসলাম। আগেই পুড়ে গিয়েছিলো, এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

বাসায় থাকতে বাবা সবগুলো পোড়া টোস্ট খেয়ে ফেলতেন আর বলতেন, “পুড়ে যাওয়ার কারণেই স্বাদ আরো বেড়ে যায় টোস্টগুলোর। তাছাড়া কয়লা দেহের জন্যে ভালো!” যখন একটু বড় হলাম তখন এক সময় শিকার করেছিলো, পোড়া টোস্টগুলো খেতে ভালো লাগতো না তার। ওগুলো যাতে না নষ্ট হয়, সেজন্যেই জোর করে খেত। তার কথাটা শুনে কিছুক্ষণের জন্যে আমার মনে হয়েছিল যে আমার ছেলেবেলার সব ঘটনাই বুঝি মিথ্যে, অভিনয়। আমার বিশ্বাসের খুঁটিগুলো ভেঙে গুড়ো গুড়ো হয়ে যাবে একসময়।

পুলিশের লোকটা তার গাড়ির রেডিওতে স্টেশনের লোকজনের সাথে কথা বলতে লাগলেন।

এরপর রাস্তা পার হয়ে আমার কাছে এসে বললেন, “আমি দুঃখিত যে তোমাকে এসব দেখতে হচ্ছে বাবু। এদিক দিয়ে আরো কয়েকটা গাড়ি আসবে এখন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ওগুলোর যে কোন একটার সাথে ধাক্কা লাগতে পারে। আমার গাড়ির পেছনের সিটে বসে থাকবে আবার?” মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলাম, আবার গাড়ির পেছনে ঢুকতে চাই না আমি।

“ও আমার সাথে খামারবাড়িতে ভেতরে যেতে পারে। কোন সমস্যা হবে না আমাদের,” একটা মেয়ের কণ্ঠ কানে আসলো এই সময়।

আমার চেয়ে বড় মেয়েটা, অন্তত দশ-এগারো হবে বয়স। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় চুলটা ছোট করে কাটা আর নাকটা বোঁচা। চোখগুলো ধূসর নীল রঙের। তার পরনে একটা লাল রঙের স্কার্ট- তখনও মেয়েদের জিন্স পরার চল শুরু হয়নি। সাসেঙ্গে স্থানীয় ইংরেজিতে কথা বলছিলো সে। গলার স্বরে আন্দ্র একটা ভাব আছে। এত কিছু থাকতে মেয়েটার গলার আন্দ্রতা নিয়ে কেন ভাবছিলাম জানি না।

পুলিশ অফিসারটার সাথে আমার বাবার কাছে গেলো মেয়েটা। তাঁর কাছ থেকে আমাকে খামারবাড়িতে নিয়ে যাবার অনুমতি আদায় করার পর একসাথে গলির ভেতর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম আমরা।

“আমাদের গাড়িতে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে,” বললাম।

“সেজন্যেই এখানে এসেছিল লোকটা,” আমাকে বললো মেয়েটা। “গলির একদম শেষ মাথায়। কেউ তাকে খুঁজে পাবে না এখানে আর নিষেধও করবে না। একদম কাদা কাদা হয়ে থাকে ওখানকার মাটি। রাত তিনটার দিকে আসে সে”।

“তোমার কি ধারণা? আত্মহত্যা করেছে সে?”

“হ্যাঁ। দুধ খাও তো তুমি? নানীমা দুধ দোয়াচ্ছে এখন”।

“মানে, একদম আসল গরুর দুধ?” জিজ্ঞেস করলাম আমি। পরমুহূর্তেই লজ্জা পেয়ে গেলাম বোকার মত প্রশ্নটা করায়।

ছোট একটা গোয়াল ঘরের সামনে এসে থামলাম আমরা। সেখানে আমার বাবা-মা’র চেয়েও বয়স্ক, লম্বা ধূসর চুলের একজন মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা গরুর পাশে। কালো রঙের টিউব লাগানো দেখলাম গরুটার ওলানের সাথে। “আগে হাত দিয়ে দুধ দোয়াতাম আমরা,” আমার উদ্দেশ্যে বললেন তিনি, “কিন্তু এটাতে সময় কম লাগে”।

তিনি আমাকে দেখালেন কিভাবে টিউবগুলোর মাধ্যমে দুধ একটা মেশিনে গিয়ে জমা হয়। সেই মেশিনে ঠাণ্ডা হয় দুধগুলো। এরপর আরেকটা পাইপের মাধ্যমে গিয়ে জমা হয় বিশাল একটা ধাতব পাত্রে। ধাতব পাত্রগুলো উঁচু কাঠের পাটাতনের ওপর রাখা। সেখান থেকে প্রতিদিন একটা লরি এসে সংগ্রহ করে নিয়ে যায় দুধ।

আমাকে ফেনা ভর্তি এক মগ ঘন দুধ দিলেন মহিলা। দুধ যে এতটা সুস্বাদু লাগতে পারে সেটা আগে ধারণা ছিল না আমার। সবকিছু ভুলের যাবার পরেও সেদিন খাওয়া দুধের স্বাদটা মনে ছিল আমার।

“গলির শেষ মাথায় ভিড় বাড়ছে আস্তে আস্তে। ঐ লাল-নীল আলো জ্বলা গাড়িগুলো আসছে একের পর এক,” হঠাৎই কথাটা বলে উঠলেন তিনি। “ছেলেটাকে রান্নাঘরে নিয়ে যাও তুমি। ক্ষিধে লেগেছে ওর। আর এরকম বাড়ন্ত বয়সে এক কাপ দুধ যথেষ্ট নয়”।

“তুমি কিছু খেয়েছো?” জিজ্ঞেস করলো মেয়েটা।

“শুধু একটা টোস্ট। তাও পোড়া”।

“আমার নাম লেটি। লেটি হেম্পস্টক। আর এটা হচ্ছে হেম্পস্টক খামার। আসো আমার সাথে,” আমাকে সামনের দরজা দিয়ে ভেতরের বিশাল রান্নাঘরে নিয়ে গেলো সে। সেখানে বিশাল একটা কাঠের টেবিলের পাশে পাতা চেয়ারে বসলাম। টেবিলটা দেখে অনেক পুরনো মনে হচ্ছিল।

“এখানে আমরা সকাল সকাল নাস্তা খেয়ে ফেলি,” বললো সে। “একদম ভোরে শুরু হয় দুধ দোয়ানো। সসপ্যানে কিছু পরিজ রয়ে গেছে বোধহয়, ওটাই খাও জ্যাম দিয়ে, ভালো লাগবে”।

একটা চীনা মাটির বাটিতে গরম গরম পরিজ এনে আমার সামনে রাখলো সে। সাথে বাসায় বানানো ব্ল্যাকবেরি জ্যাম, আমার পছন্দের। পরিজের ওপর দুধের ক্রিম ঢেলে দিলো লেটি। খাওয়ার আগে সবকিছু বাটির মধ্যে চামচ দিয়ে গুলে নিলাম আমি। এরপর বেগুনী রঙের খাবারটা মুখে দিলাম। এর চেয়ে সুস্বাদু কোন কিছু খুব কমই খেয়েছি আগে।

এসময় শক্ত সমর্থ গড়নের আরেকজন মহিলা ভেতরে ঢুকলেন। তার লালচে বাদামী রঙের চুল ধূসর হতে শুরু করেছে। ছোট করে কাটা ওগুলো। আপেলের মতন লাল তার গাল। হাঁটু অবধি লম্বা সবুজ রঙের একটা স্কার্ট পরে আছেন। “এই ছেলেটার বাসাই নিশ্চয়ই গলির শুরুতে। গাড়িটা নিয়ে তো তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। পাঁচজনের জন্যে চা তৈরি করতে হবে আমাদের”।

একটা বিশাল পেতলের কেতলি ট্যাপ থেকে পানি নিয়ে উত্তীর্ণ করলো লেটি। ম্যাচ দিয়ে চুলো জ্বালিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দিলো কেতলিটা। এরপর কাপবোর্ড থেকে পাঁচটা মগ বের করে রাখার সময় দ্বিধাশ্রিত চোখে মহিলাটার দিকে তাকালো।

“হ্যাঁ, তোমার ধারণাই ঠিক। ছয়টা কাপ বের কর। ডাক্তারটাও আসতে পারে,” মহিলা বললেন।

এরপর ঠোঁট দিয়ে আফসোস জাতীয় একটা শব্দ করলেন তিনি, বললেন, “চিরকুটটা চোখে পড়েনি ওদের। অবশ্য ওটা বুক পকেটে ভাঁজ করে রাখা আছে, ওখানে এখনও হাত দেয়নি ওরা”।

“কি লেখা আছে সেখানে?” জিজ্ঞেস করলো লেটি।

“নিজেও তো পড়তে পারো,” বললেন তিনি। আমার ধারণা ভদ্রমহিলা লেটির মা। “সাউথ আফ্রিকা থেকে চোরাই পথে আসার সময় ওপাল খনি থেকে কামাই করা সব টাকা একজন দালালকে দেয় সে, ব্যাংকে জমা রাখার জন্যে। তার আর তার তিন বন্ধুর টাকা। কিন্তু ব্রাইটনের এক ক্যাসিনোতে জুয়া খেলে সব হারায় সে। এরপর ব্যাংকের টাকা খরচ করা শুরু করে। কিন্তু বন্ধুদের টাকা ফিরিয়ে দেয়ার ইচ্ছে ছিল তার, কোন ভাবে আবার টাকা কামানোর পর,” এটুকু বলে থামলেন তিনি।

“এরপর ব্যাংকের টাকাও শেষ হয়ে যায়,” কিছুক্ষণ বিরতির পর বললেন।

“আঁধার নেমে আসে জীবনে”।

“এটা কিন্তু লেখেনি সে,” লেটি বললো। “লেখেছে-

‘আমার সব বন্ধুদের উদ্দেশ্যে,

আমি যেরকমটা চেয়েছিলাম সেরকম কিছুই হয়নি। তোমরা আশা করি ব্যাপারটা বুঝবে আর ক্ষমা করে দেবে আমাকে। নিজেকে অবশ্য কখনো ক্ষমা করবো না আমি’।

“ওই একই কথা,” ভদ্রমহিলা বললেন। এরপর আমার দিকে ঘুরে বললেন,

“আমি লেটির মা। আমার মা’র সাথে অবশ্য এর মধ্যেই দেখা হয়ে গেছে

তোমার, দুধ দোয়ানোর ঘরে। আমি মিসেস হেম্পস্টক। আমার আগে

অবশ্য তিনিই মিসেস হেম্পস্টক নামে পরিচিত ছিলেন। তুমি নানীমা

হেম্পস্টক বলে ডাকতে পারো তাকে। এটা হচ্ছে হেম্পস্টক খামারবাড়ি।

এখানকার সবচেয়ে পুরনো খামার। এমনকি ডোমসডের বইয়েও এটার

উল্লেখ পাবে” (Domesday Book-১০০০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত উইলিয়াম দ্য কনকোয়েরার নামের এক ইংরেজ

পরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনী)।

তাদের সবার নাম হেম্পস্টক কেন, এটা ভাবছিলাম, কিন্তু জিজ্ঞেস করলাম

না। এটাও জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না যে ওপাল মা’র আত্মহত্যার

চিরকুট বা মৃত্যুর আগে সে কি ভাবছিল এটা কিভাবে জানলেন তারা।

একদম সাধারণ ভঙ্গিতে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, যেন অমনটা হওয়াই স্বাভাবিক।

“আমি তাকে বুক পকেটে দেখার জন্যে ইশারা দিয়েছি। সে ভাববে যে নিজে থেকেই ওখানটায় দেখার কথা কথা মনে হয়েছে তার,” লেটি বললো। “লক্ষী মেয়ের মত কাজ করেছো একটা,” মিসেস হেম্পস্টক বললেন। “কেতলিতে পানি ফুটতে শুরু করলে এখানে প্রশ্ন করার জন্যে আর চা খেতে আসবে তারা। কিছু দেখেছি কিনা সেটা জিজ্ঞেস করবে নিশ্চয়ই। তুমি নাইয় ছেলেটাকে নিয়ে পুকুরটা ঘুরিয়ে দেখাও?”

“পুকুর না,” লেটি বলল, “আমার সাগর ওটা”। এরপর আমার দিকে ঘুরে হেসে বললো, “আসো আমার সাথে”। যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলাম বাসার ভেতরে সেদিক দিয়েই বের হলাম।

এখনও বেশি রোদ ওঠেনি। ধূসর দেখাচ্ছে চারপাশ।
বাসাটার পেছন দিকে যেতে লাগলাম আমরা, গরু চরানোর রাস্তা দিয়ে।
“ওটা কি আসলেও সাগর?” জিজ্ঞেস করলাম।

“হ্যাঁ!” বললো ও।

একদম হঠাৎ করেই ওটার কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা। একটা পুরনো কাঠের চালা, তার নিচে পুরনো একটা বেঞ্চ। আর সেগুলোর সামনে একটা ছোট পদ্মপুকুর। পদ্ম ফুলের পাতা ভেসে বেড়াচ্ছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। তবে আমার চোখ চলে গেলো একটা রূপালি রঙের মাছের দিকে। মৃত হয়ে ভাসছে ওটা।

“লক্ষন ভালো না,” লেটি বললো।

“তুমি তো একটা সাগরের ব্যাপারে কথা বলেছিলে,” আমি বললাম ওকে,
“এটা তো একটা পুকুর”।

“এটা সাগরই,” বললো ও, “আমি যখন একদম বাচ্চা ছিলাম তখন এটার দেখা পাই আমরা, পুরনো দেশটাতে”।

কাঠের চালার ভেতরে গিয়ে একটা লম্বা লাঠি বের করে নিয়ে আসলো লেটি। ওটার মাথায় একটা ছোট জাল লাগানো দেখলাম। লাঠিটার মাথায় পুকুর থেকে মৃত মাছটা তুলে ফেললো লেটি।

“হেম্পস্টক খামারের কথা ডোমসডে বইয়েও উল্লেখ আছে, তোমার মা তো সেটাই বললেন,” আমি বললাম। “উইলিয়াম দ্য কনকোয়েরার লেখেছিলেন বইটা”।

“হ্যাঁ,” ছোট করে জবাব দিলো লেটি হেম্পস্টক।

মাছটা জাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওটা পর্যবেক্ষণ করা শুরু করলো ও। এখনও নরম আছে ওটার শরীর, শক্ত হয়ে যায় নি। আমার মনে হলো ওর হাতে একবারের জন্যে নড়ে উঠলো মাছটা। এত রঙিন কিছু আগে দেখিনি। প্রাথমিক ভাবে রূপালি মনে হয় মাছটা, কিন্তু সেই রূপালীর নিচে আবার নীল, সবুজ, বেগুনী ডরাটো।

“এটা আবার কোন ধরনের মাছ?” জিজ্ঞেস করলাম।

“খুবই অদ্ভুত এটা,” বললো লেটি। “মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে এই পুকুরের মাছগুলো সহজে মারা যায় না”।

এরপর একটা ছুরি দিয়ে মাছটার পেট থেকে লেজ অবধি ফেড়ে ফেললো ও। ছুরিটা হঠাৎ করে কিভাবে উদয় হলো, সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ হবে না, জবাব দিতে পারবো না।

“এটাই মাছটার মৃত্যুর কারণ,” বললো লেটি।

মাছটার ভেতর থেকে চিটচিটে কিছু একটা বের করে আনলো সে, এরপর আমার হাতের তালুর ওপর রাখলো। ঝুঁকে আঙুল দিয়ে পানিতে পরিষ্কার করে নিলাম ওটা, এরপর তাকালাম। রানী ভিক্টোরিয়ার চেহারা চোখে পড়লো।

“ছয় পেনি?” বললাম। “ছয় পেনির একটা পয়সা খেয়েছিল মাছটা?”

“ব্যাপারটা মোটেও ভালো ঠেকছে না,” বললো লেটি হেম্পস্টক। সূর্যের আলো একদম কমে গেছে এখন। ওর চুলটা লালচে দেখাচ্ছে। “তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে চিন্তা করছেন। ফেরার সময় হয়ে গেছে”।

ওকে ছয় পেনির পয়সাটা দেয়ার চেষ্টা করলে, মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলো। “তুমি রাখো ওটা। চকলেট বা টফি কিনতে পারবে”।

“মনে হয় না পারবো,” বললাম। “এখন আর ছয় পেনির পয়সার চল নেই। দোকানদাররা নেবে না”।

“তাহলে তোমার টাকা জমানোর ব্যাংকে ফেলে দিও,” বললো ও। “তোমার জন্যে হয়তো সৌভাগ্য বয়ে আনবে ওটা,” শেষের কথাটা বলার সময় কেমন যেন অনিশ্চিত শোনালো ওর গলার স্বর।

পুলিশের লোকটা, বাবা আর খয়েরী রঙের কোট পরিহিত দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে খামারবাড়ির রান্নাঘরে। তাদের একজন আমাকে বললো যে সাদা পোশাকের পুলিশ সে। এটা শুনে একটু হতাশ হলাম আমি। কখনও পুলিশ অফিসার হতে পারলে সবসময় ইউনিফর্ম পরে থাকার ইচ্ছে আমার।

অন্য লোকটাকে চিনতে পারলাম, ডক্টর স্মিথসন। আমাদের পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তার কাছেই যাই। চা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তাদের।

বাবা মিসেস হেম্পস্টক এবং লেটিকে ধন্যবাদ জানালো আমার খেয়াল রাখার জন্যে। জবাবে তারা বললেন যে আমি খুব লক্ষী ছেলে, এরপর থেকে যেকোন সময় চাইলেই তাদের এখানে চলে আসতে পারি। যে পুলিশ অফিসারের গাড়িতে চড়ে মিনিভ্যানটার কাছে গিয়েছিলাম আমরা, তিনিই আবার আমাদের বাসায় পৌঁছে দিলেন।

“তোমার বোনের সাথে এ ব্যাপারে কথা না বললেই বোধহয় ভালো হবে,” বাবা বললো।

ব্যাপারটা নিয়ে কারো সাথেই কথা বলার ইচ্ছে নেই আমার। নতুন একটা বন্ধু আর ঘোরার জায়গা পেয়েছি আমি। অবশ্য আমার কমিঞ্জটা হারাতে হয়েছে। আর আমার মুঠোয় একটা ছয় পেনির মুদ্রা।

“আচ্ছা বাবা, সাগর আর সমুদ্রের মধ্যে কি পার্থক্য?” জিজ্ঞেস করলাম।

“সমুদ্রের চেয়ে সাগরের ব্যাপ্তি আর গভীরতা দু’টাই বেশি,” বললো বাবা।

“সাগর সমুদ্রের তুলনায় বড়। এই জন্যেই তো মহাসাগর বলা হয়। কেন?”

“না, এমনি ভাবছিলাম,” বললাম, “একটা সাগর কি কখনো পুকুরের সমান হতে পারে?”

“না,” বাবা বললো, “পুকুর হচ্ছে পুকুরের সমান। যেমন হ্রদ, হ্রদের সমান। সমুদ্র, সমুদ্রের মত আর সাগর তো সাগরই। প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর আর দক্ষিণ মহাসাগরের নাম মনে পড়ছে এই মুহূর্তে আমার”।

বাবা উঠে বেডরুমে চলে গেলো, মা’র সাথে কথা বলতে। এরপরে হয়তো ফোনে কারো সাথে যোগাযোগ করবে। আমি পয়সাটা আমার ব্যাংকে ফেলে দিলাম। না ভেঙে এই ব্যাংক থেকে বের করা যায় না কিছু। একদিন যখন পুরোপুরি ভরে যাবে, তখন ওটা ভাংবো আমি। তবে তার মনে হয় অনেক দেরি আছে।

অধ্যায় ৩

সেই মিনিভ্যানটাকে আর কোনদিন দেখিনি আমি। ঘটনাটার দু'দিন পর, সোমবারে বাবা একটা কালো রোভার কিনে আনে, লাল রঙের চামড়ার সিট ছিল ওটার। মিনিভ্যানটার চেয়ে আকারেও অনেক বড়। তবে আমার কাছে আরামদায়ক লাগতো না ওটা। কেমন যেন সিগারেটের ধোঁয়ার মত গন্ধ পেতাম গাড়িতে উঠলেই। মাঝে মাঝে যখন লম্বা সফরে যেতে হতো রোভারের পেছনের সিটটাতে চড়ে, অসুস্থ হয়ে পড়তাম।

সোমবারে সকালে যে শুধু রোভারটাই এসেছিল আমাদের বাসায়, তা নয়। আমার উদ্দেশ্যে প্রেরিত একটা চিঠিও এসে উপস্থিত হয়।

তখন আমার বয়স ছিল সাত। এই বয়সী বাচ্চারা সাধারণত চিঠি পায় না তেমন একটা। জন্মদিনে কার্ড পেতাম আমার দাদা দাদীর কাছ থেকে আর এলেনা হেন্ডারসনের কাছ থেকে (আমার মা'র বান্ধবী তিনি, যাকে কখনও দেখিনি আমি)। একটা ক্যারাভানে থাকতেন এলেনা হেন্ডারসন, সেখান থেকেই প্রতি বছর আমার জন্যে রুমাল পাঠাতেন। চিঠি কখনোই আসতো না। তবুও প্রতিদিন পোস্টবক্সটা খুলে দেখতাম আমার জন্যে কিছু এসেছে কিনা।

আর সেই সকালে পেয়ে যাই চিঠিটা।

ওটা খুলে বেশ খানিকক্ষণ পড়ার চেষ্টা করেও আগা-মাথা কিছুই বুঝতে না পেরে মা'র কাছে নিয়ে গেলাম।

“তুমি প্রিমিয়াম বন্ড জিতেছো!”

“মানে?”

“তোমার যখন জন্ম হয়, তোমার দাদী তোমাকে একটা প্রিমিয়াম বন্ড কিনে দেন। ওনার সব নাতি নাতনির ক্ষেত্রেই এটা করতেন তিনি। অনেক বছর পর পর একটা লটারির মত হয়। সেখানে যদি কারো প্রিমিয়াম বন্ডের নম্বরটা ওঠে তাহলে হাজার হাজার পাউন্ড পর্যন্ত পওঅয়া যায়”।

“আমি কি হাজার হাজার পাউন্ড জিতেছি?”

“না,” একবার কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে বললো মা, “তুমি শীচিশ পাউন্ড জিতেছো”।

হাজার হাজার পাউন্ড না জেতায় মন একটু খারাপ হল আমার। আমি ঠিকও করে ফেলেছিলাম কি করবো পাউন্ডগুলো দিয়ে। দু'ঘণ্টা জায়গায় একটা বাড়ি কিনে একা একা থাকতাম। ব্যাটম্যানের মত একটা ব্যাটকেভ বানিয়ে উল্টো

হয়ে ঝুলেও থাকা যেতো সেখানে। আর ব্যাটকেভে ঢোকান জন্যে থাকবে লুকোনো একটা পথ। তবে পঁচিশ পাউন্ডও খারাপ না। অনেক চকলেট কেনা যাবে। আমার কল্পনার চাইতেও অনেক বেশি চকলেট।

“তোমার পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্টে টাকাগুলো রেখে দেয়ার ব্যবস্থা করবো আমি,” মা বললো, আমার স্বপ্নগুলো চুরমার করে দিয়ে।

তবে মা ওটা পোস্ট অফিসে রাখতে যাওয়ার আগে তার কাছ থেকে কিছু টাকা নিতে ভুললাম না (বলেছিলাম, আমার টাকা থেকে কেটে রাখতে)। সেই টাকা দিয়ে অন্যান্য দিনের তুলোনায় অনেক বেশি চকলেট খেয়েছিলাম সেদিন। কাগজটা মা তার হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে রাখার আগে আমার নামটাও দেখে নিয়েছিলাম ওখানে।

সেটা ছিল সোমবার সকালের কথা। সোমবার বিকেলে বুড়ো মিস্টার উইলোরি, যিনি প্রতি সোমবার আর বৃহস্পতিবার বাগানের কাজ করতে আসতেন আমাদের বাসায় (আর তার স্ত্রী, মিসেস উইলোরি আসতেন প্রতি বুধবার), সবজির বাগানে খোড়াখুড়ি করতে গিয়ে অনেকগুলো পেনি ভর্তি একটা বোতল আবিষ্কার করলেন। সবগুলো পেনিই ১৯৩৭ সালের বা তারও আগেকার সময়ের। বিকেলটা আমি কাটলাম ভিনেগার আর ব্রাউন সস দিয়ে ওগুলো ঘষে ঘষে। কাজ শেষে একদম চকচক করছিলো ওগুলো।

মা পয়সা ভর্তি বোতলটা ডাইনিং রুমের কাঠের তাকের ওপর রেখে দিয়ে আমাকে বললো যে কোন মুদ্রা সংগ্রাহক বেশ কয়েক পাউন্ড খরচ করতে রাজি হতে পারেন পয়সাগুলো কেনার জন্যে।

সেদিন রাতে খুশিমনে বিছানায় ঘুমোতে গেলাম আমি। সকাল সকাল অনেকগুলো অর্থের মালিক হয়েছি আর বিকেল বেলা হারানো গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছি।

.....

স্বপ্নগুলো কিভাবে গুরু হয়েছিলো তা বলতে পারবো না। কিন্তু স্বপ্ন তো সবসময় অমনই হয়, তাই না? দেখলাম স্কুলে একটা খারাপ দিন কাটছিলো আমার। যে বদমাশ বাচ্চাগুলো আমাকে মারতো, তাদের থেকে পালিয়ে ছিলাম স্কুলের পেছনভাগের রোডেনড্রন বোপগুলোর মাঝে। কিন্তু আমাকে সবসময়ই ঠিকই খুঁজে বের করতো তারা। এটা বুঝতে পারছিলাম যে স্বপ্ন দেখছি আমি (কিন্তু স্বপ্ন দেখাকালীন সময়ে তো সেটা সন্দেহ যায় না; তখন সব কিছু একদম আসল মনে হয়), কারণ আমার দাদাও ছিল সেই ছেলেদের সাথে। আর ছিল দাদার বেশ কয়েকজন বন্ধু (ধূসর চুল

প্রত্যেকের, কাশছিলো খকখক করে)। তাদের সবার হাতে চোখা পেঙ্গিল, যেগুলো দিয়ে খোঁচা দিলে রক্ত বের হয়ে যাবে। তাদের কাছ থেকে পালানোর জন্যে প্রাণপণে দৌড়ানো শুরু করলাম। কিন্তু আমার চেয়ে দৌড়ানোর গতি বেশি তাদের। যে বাথরুমের ভেতরে লুকিয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ, সেটা থেকে বদমাশ ছেলেগুলো টেনে বের করে আনলো আমাকে। এরপর মাটিতে শুইয়ে দিয়ে জোর করে টেনে খুললো আমার মুখটা।

আমার দাদার (আসল দাদা নয়; এতক্ষণে বুঝতে পারলাম তার আদলে গড়া মোমের মূর্তি ওটা। আমাকে নিশ্চয়ই অ্যানাটমি করার ইচ্ছা তার) হাতে একটা চকচকে, ধারালো জিনিস। সেটা তার বড় বড় আঙুলগুলো দিয়ে ঠেসে ঢোকাতে লাগলেন আমার মুখের ভেতর। রক্তের নোনতা স্বাদে ভরে উঠলো মুখ। দম বন্ধ হয়ে আসলো লাগলো আমার।

আমার দিকে ঘৃণাভরা বিজয় মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সবাই। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছিলাম মুখের ভেতর ঢোকানো জিনিসটার কারণে যারতে আমার দম বন্ধ হয়ে না আসে। ওদের সম্ভ্রষ্ট চেহারা দেখার কোন ইচ্ছে নেই আমার।

তখনই ঘুম ভেঙে যায় আমার, দেখি আসলেও দম বন্ধ হয়ে আসছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। কিছুটা একটা আটকে আছে আমার গলায়, সেটার কারণেই শ্বাস নিতে পারছি না, চিৎকার করতে পারছি না। ভীষণ রকম কাশতে লাগলাম, পানি গড়াতে লাগলো নাক চোখ দিয়ে।

গলার যতটা ভেতরে সম্ভব আঙুল ঢুকিয়ে জিনিসটা বের করে আনার চেষ্টা করলাম। ধারালো কিছু একটা লাগলো আঙুলে ডগায়। এরপর দুই আঙুল দিয়ে শক্ত করে ধরে টেনে বের করে আনলাম জিনিসটা।

হাপড়ের মতি শ্বাস নিতে লাগলাম, প্রায় বমিও করে ফেলেছিলাম চাদরের ওপর। সামলালাম কষ্ট করে। তবে রক্ত মিশ্রিত লাল গড়াতে লাগলো ঠোঁট বেয়ে, ধারালো জিনিসটার কারণে কেটে গেছে গলার ভেতরে।

জিনিসটার দিকে তখনও তাকাইনি আমি। শক্ত করে আমার হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছি পিচ্ছিল বস্তুটা। ওটার দিকে তাকাতে ইচ্ছেও করছিলাম না। ওটার অস্তিত্ব মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল। এটার জন্যেই এত খারাপ অবস্থা আমার।

দৌড়ে বাড়ির ভেতর দিককার হলওয়ার বাথরুমে ছুটে গেলাম। কুলি করলাম কয়েকবার, সরাসরি ট্যাপ থেকে পানি নিয়ে খেলাম। এখনও মুখ থেকে অল্প অল্প রক্ত যাচ্ছে লালার সাথে। বেশ কিছুক্ষণ পর সাদা

বাথটাবতে বসে জিনিসটা যে হাতে ধরে রেখেছি সেটার মুঠো ফাঁক করলাম। ভয় লাগছে আমার।

কিন্তু আমার হাতের বস্তুটা যেটা কিছুক্ষণ আগেও ছিল আমার গলার ভেতর মোটেও ভয়ঙ্কর কিছু না। একটা পয়সা রূপালি রঙের শিলিং। বেডরুমে ফিরে গেলাম আমি। কাপড়চোপড় ঠিক করে বিছানার চাদর থেকে লাল পরিষ্কার করলাম একটা ভেজা ফ্লানেলের কাপড় দিয়ে। আবার ঘুমোতে আসার আগে ভেজা জায়গাগুলো শুকোলেই হয়। এরপর নিচে চলে আসলাম।

কাউকে শিলিংটার ব্যাপারে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু কাকে বলবো বুঝতে পারছিলাম না। এটা জানা আছে যে বড়দের কিছু বললে কি ঘটবে, আমার কথা বিশ্বাস হবে না কারো। আমি সত্য কথা বললেও কখনোই কেন যেন বিশ্বাস হয় না তাদের। আর এই অদ্ভুত ব্যাপারটা বিশ্বাস করার প্রশ্নই আসে না।

আমার বোন বাগানে খেলছিলো ওর বন্ধুদের নিয়ে। আমাকে দেখে রাগী ভঙ্গিতে ছুটে আসলো। বললো, “খুব বেশি বাড় বেড়েছো তুমি! মা-বাবা আসলে তাদের সবকিছু বলে দেবো”।

“কি?”

“তুমি ভালোমতোই জানো কি!” বললো ও, “আমি জানি ওটা তোমারই কাজ”।

“কি আমার কাজ!”

“পয়সা ছুড়ে মারছিলে আমার দিকে। আমাদের সবার দিকে, ঝোপের আড়াল থেকে। এরকম জঘন্য একটা কাজ কেন করলে?”

“আমি করিনি”।

“ব্যাথা লাগছিলো ভীষণ”।

ওর বন্ধুদের কাছে ফিরে গেলো ও। তারপর সবাই একসাথে বাঁকা চোখে তাকালো আমার দিকে। আমার গলায় এখনও ব্যাথা করছে ভীষণ।

ড্রাইভওয়ে ধরে হাঁটতে লাগলাম। কোথায় যাবো সেটা জানি না। শুধু এটা জানি যে এখানে থাকতে ভালো লাগছে না।

লেটি হেম্পস্টক দাঁড়িয়ে ছিল ড্রাইভওয়ের শেষ মাথায়, চেস্টনাট গাছগুলোর ছায়ায়। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে শত বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, দরকার পড়লে আরো শত বছর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে।

‘হ্যালো!’ বললাম আমি।

“দুঃস্থপ্ন দেখছিলে তুমি, তাই না?” জিজ্ঞেস করলো ও।

আমার পকেট থেকে শিলিংটা বের করে দেখালাম ওকে। “এটার কারণে আরেকটু হলেই দম আটকে মরত বসেছিলাম,” বললাম। “ঘুমিয়ে ছিলাম তখনও। কিভাবে সেটা মুখের ভেতর গেলো জানি না। কেউ নিশ্চয়ই সেটা ঢুকিয়ে দিয়েছে আমার মুখে, কিন্তু তেমনটা হলে জেগে ওঠার কথা আমার। ঘুম ভেঙ্গেই ওটার অস্তিত্ব বুঝতে পারি আমি, যেন হঠাৎ করেই উদয় হয়েছে”।

“হ্যাঁ,” বললো ও।

“আমার বোন বলছিলো যে আমি নাকি ঝোপের আড়াল থেকে পয়সা ছুড়ে মারছিলাম ওদের দিকে। কিন্তু তেমন কিছুই করিনি আমি”।

“না,” আমার সাথে একমত হলো লেটি। “সেটা করোনি তুমি”।

“লেটি? কি হচ্ছে এসব?” জিজ্ঞেস করলাম।

“ওহ,” এমন ভঙ্গিতে বললো লেটি, যেন একদম সহজ ব্যাপারটা। “কেউ মানুষজনকে পয়সা দেয়ার চেষ্টা করছে, এই তো। কিন্তু কাজটা করছে খুব খারাপ ভাবে। আর সেটাতে এখানে এমন কিছু জেগে উঠতে পারে, যেটার ঘুমিয়ে থাকাই মঙ্গল সবার জন্যে। জেগে উঠলে মোটেও ভালো কিছু হবে না”।

“এটার সাথে লোকটার মৃত্যুর কোন সম্পর্ক আছে?”

“লোকটার সাথে সম্পর্ক? হ্যাঁ, আছে”।

“সে-ই কি করছে এসব?”

মাথা ঝাঁকাল ও জবাবে। এরপর জিজ্ঞেস করলো, “নাস্তা খেয়েছো?”

“না?”

“বেশ তাহলে,” বললো ও। “আসো আমার সাথে”।

একসাথে গলি ধরে হাঁটতে লাগলাম আমরা। তখন গলিটার আশেপাশে, এখানে সেখানে ছড়ানো ছিটানো বেশ কয়েকটা বাড়ি ছিল। ওরকমই একটা বাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করলো ও, বললো, “ঐ বাড়িতে একটা লোক নিজেকে টাকায় রূপান্তরিত হতে দেখেছে স্বপ্নে। এখন আয়নাতেও উল্টোপাল্টা জিনিস দেখা শুরু করেছে”।

“কিরকম জিনিস?”

“নিজেকেই। কিন্তু তার হাত পা রূপান্তরিত হয়েছে কাঁকড়ার হাত পায়ে”।

আয়নাতে লোকটার প্রতিবিম্ব দেখার কথা বললো ও, শিউরে উঠলাম।

“আমার গলার ভেতর একটা শিলিং পাওয়া গেছে কেন?”

“সে চায় সবাই যাতে পয়সা পায়” ।

“ওপাল মাইনার? গাড়িতে মারা গেছে যে লোকটা?”

“হ্যাঁ, সেরকমই অনেকটা । কিন্তু পুরোপুরি নয় । এসব তার কারণেই শুরু হয়েছে, অনেকটা বারুদের ফ্যাঙ্করিতে আগুন দেয়ার মতো । তার মৃত্যু ছিল অনেকটা আগুনের মত । কিন্তু যে বারুদগুলো বিস্ফোরিত হবে, সেটার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই । আর সেই বিস্ফোরন হচ্ছে এখন যা ঘটছে ওগুলো । ভিন্ন একজন দায়ী এর জন্যে । সম্পূর্ণ ভিন্ন” ।

হাত দিয়ে নিচের ঠোঁটে একবার চিমটি কাটলো ও ।

“ঐ বাসটাতে একজন মহিলা তো পাগলই হয়ে গেছে,” আমাকে বললো সে । “কিন্তু তাকে আগে থেকে সাবধান করে দিতে পারিনি আমি ।

“তোষকের নিচে টাকা লুকিয়ে রেখেছে মহিলা । এখন বিছানা থেকেই নামে না এই ভয়ে যে কেউ তার টাকা চুরি করে নিয়ে যাবে” ।

“সেটা কিভাবে জানলে তুমি?”

জবাবে নির্বিকার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ও । “আমার মত কয়েকদিন একই জায়গায় থাকলে তুমিও জানতে সেটা” ।

একটা পাথরে লাথি দিলাম । “কয়েক দিন বলতে কি ‘অনেক লম্বা সময়’ বোঝাতে চাচ্ছে তুমি?”

মাথা নাড়লো ও ।

“তোমার আসল বয়স কত?” জিজ্ঞেস করলাম ।

“এগারো” ।

ভাবলাম কিছুক্ষণ । এরপর জিজ্ঞেস করলাম, “কতদিন ধরে এগারো বছর বয়সেই আটকে আছো তুমি?”

আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটা হাসি দিল ও ।

ক্যারাওয়ে খামার পার করে আসলাম আমরা । সেখানকার খামারিরা (যাদেরকে আমি পরে ক্যালি অ্যান্ডারসনের বাবা-মা হিসেবে চিনবো), দাঁড়িয়ে ছিল ক্ষেতের পাশে । চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে কি যেন বলছিলো একে অপরের উদ্দেশ্যে । আমাদের দেখে থেমে গেলো তারা ।

তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে, গলি ধরে আরো কিছুদূর আসার পর, লেটি বললো, “বেচারাদের জন্যে খারাপই লাগে” ।

“তাদের বেচারা বলছো কেন?”

“কারণ অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে তাদের । আর এই সকালে একটা স্বপ্ন দেখি আমি, যেখানে... যেখানে খারাপ কাজ করছিলো

মহিলাটা, টাকা উপার্জনের জন্যে। লোকটা তার পার্স খুলে দেখে সেখানে অনেকগুলো ভাঁজ করা দশ শিলিং এর নোট। কিন্তু মহিলা তাকে বলে যে সে জানে না ওগুলো কোথা থেকে আসলো, আর তার কথা বিশ্বাস হয়না লোকটার। আসলে সে বুঝতেই পারে না যে কি বিশ্বাস করবে আর কি করবে না”।

“এই ঝগড়া আর স্বপ্ন। সব টাকা পয়সা নিয়ে, তাই না?”

“আমি নিশ্চিত না এখনও,” লেটি কথাটা একদম বড় মানুষদের ভঙ্গিতে বললো, কিছুক্ষণের জন্যে ভয়ই পেয়ে গেলাম আমি।

“যা-ই ঘটছে না কেন,” কিছুক্ষণ পর বললো ও, “সবকিছুর সমাধান করা যাবে”। এরপর আমার চেহারায় ভয় আর দুশ্চিন্তার ছাপ দেখে বললো, “প্যানকেক খাবার পর”।

বিশাল তাওয়ায় আমাদের দু’জনের জন্যেই প্যানকেক বানালো লেটি, ওদের রান্নাঘরে। একদম পাতলা দেখাচ্ছিলো ওগুলো। প্রত্যেকটা প্যানকেকের ওপর লেবুর রস ছিটিয়ে দিয়ে মাঝে জ্যাম ভরে পেচিয়ে ফেললো লেটি, সিগারের মত। যথেষ্ট পরিমাণে বানানোর পরে টেবিলে বসে মজা করে ওগুলো খেলায় আমরা।

একটা পুরনো আমলের চুল্লি চোখে পড়লো আমার, সেটায় গত রাতের ছাই পড়ে আছে এখনও। এই রান্নাঘরটাকে ভালো লাগতে শুরু করেছে আমার।

“আমার কেমন যেন ভয় হচ্ছে,” লেটিকে বললাম।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো ও, “তোমার যাতে কিছু না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবো আমি, কথা দিচ্ছি। আমার ভয় লাগে না এসবে”।

ওর আশ্বাসের পরে ভয় একটু কমলো, তবে পুরোপুরি না। “ঘটনাটাই আসলে ভয়ঙ্কর”।

“কথা দিলাম না?” বললো লেটি হেম্পস্টক। “তোমার কোন কষ্ট হবে না”।

“কষ্ট?” উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করলো কেউ। “কে কষ্ট পাবে? কেন কষ্ট পাবে?”

ঘুরে দেখি নানীমা হেম্পস্টক। পরনের অ্যাপ্রনটা ঝুলছে তার কাঁধ থেকে। হাতে এক গুচ্ছ ড্যাফোডিলের তোড়া, ওগুলোর সোনালী আভায়ে তার ফরসা চেহারাটা আরো উজ্জ্বল মনে হচ্ছে।

“কেউ একজন আশপাশের সবাইকে টাকা পয়সা দেয়ার চেষ্টা করছে। স্বপ্ন আর বাস্তব দুই জগতেই। খুব সমস্যা হচ্ছে সবাই,” লেটি বললো।

“আমার বন্ধু আজ সকালে ঘুম ভেঙে দেখে দম সন্ধিতে পারছে না, এটা আটকে ছিল ওর গলায়,” এই বলে শিলিংটা তাকে দেখালো সে।

হাতের ফুলগুলো এবং অ্যাগ্রনটা রান্নাঘরের টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে শিলিংটা লেটির কাছ থেকে নিয়ে দেখতে লাগলেন নানীমা হেম্পস্টক। গন্ধ শুঁকলেন, চোখ কুঁচকে কি যেন দেখার চেষ্টা করলেন আর সবশেষে ঘষতে লাগলেন। এমনকি একবার কানের কাছে নিয়ে কিছু একটা শোনার চেষ্টাও করলেন কিছুক্ষণ (বানিয়ে বলছি না)। এরপর আমাকে অবাক করে দিয়ে জিহবার অগ্রভাগ দিয়ে একবার ছুঁলেন ওটাকে।

“এটা নতুন,” অবশেষে বললেন তিনি। “যদিও এটার গায়ে ১৯১২ লেখা, কিন্তু কালকের আগে কোন অস্তিত্বই ছিল না এটার”।

“আমার কাছে গোলমেলে ঠেকছিলো পয়সাটা,” লেটি বললো।

নানীমা হেম্পস্টকের চোখের দিকে তাকালাম আমি, “আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন?”

“ভালো প্রশ্ন করেছে ডার্লিং। ইলেক্ট্রনের ক্ষয় দেখে কোন জিনিসের বয়স বোঝা যায়। তবে সেজন্যে সূক্ষ্ম দৃষ্ট থাকতে হবে কিন্তু। চোখ একদম কাছে নিয়ে গেলে পিচ্চি পিচ্চি হাস্যোজ্জ্বল ইলেকট্রনগুলোকে দেখবে ছুটে বের হচ্ছে। কিন্তু এই শিলিংটার ইলেকট্রনগুলোকে একটু বেশিই হাসিখুশি মনে হচ্ছিল। তাই এটায় যে রাজার ছবিটা আছে, ওটা ভালোমতো খেয়াল করলাম। ওখানকার ইলেকট্রনগুলোকে দেখে একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছিলো, কিন্তু কেউ যেন তাদের জোর করে ক্লান্ত করে রেখেছে যাতে শিলিংটাকে দেখে পুরনো মনে হয়”।

“আপনার দৃষ্টিশক্তি নিশ্চয়ই অনেক ভালো,” বললাম। একদম অবাক হয়ে গেছি আমি, এরকম বয়সে এত ভালো দৃষ্টিশক্তি! পয়সাটা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন তিনি।

“এখন আর আগের মত ভালো নেই। তবে আমার মত বয়স হলে সবারই দৃষ্টিশক্তি একটু দুর্বল হতে শুরু করে,” মুচকি হেসে বললেন নানীমা হেম্পস্টক।

“কত বয়স হলো আপনার?”

আমার দিকে তাকালো লেটি। সাথে সাথে মনে হলো প্রশ্নটা করা উচিত হয়নি একদমই। বড়রা অনেক সময় তাদের বয়স নিয়ে কথা বললে বিরক্ত হন। আবার অনেকে কিছু মনে করেন না, বিশেষ করে একটু বেশি বয়স যাদের। তারা আবার তাদের বেশি বয়স নিয়ে গর্বই করেন। এই যেমন মিস্টার উইলোরির বয়স উননব্বই আর মিসেস উইলোরির সাতাত্তর। তারা দু’জনই আমাকে প্রায়ই মনে করিয়ে দেন তাদের বেশি বয়সের কথা।

কাপবোর্ডের কাছে গিয়ে সেটার ওপরে থাকা বেশ কয়েকটা রঙিন ফুলদানী তুলে নিলেন নানীমা হেম্পস্টক, এরপর বললেন, “তা হয়েছে অনেক। যখন চাঁদ বানানো হয় তখনও ছিলাম আমি”।

“চাঁদ তো সবসময়ই ছিল”।

“না বাবু, মোটেও না। প্রথম যেদিন চাঁদটাকে ঝোলানো হয় আকাশে, সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার। আমরা সবাই ওপরে তাকিয়ে ছিলাম তখন অবশ্য চাঁদটা এখনকার মত নীল ছিল না। বাদামী দেখাতো ওটাকে, একটু ময়লা ময়লা,” কথা বলতে বলতেই ফুলদানীগুলোতে পানি ভরলেন নানীমা হেম্পস্টক।

“আপনি কি নিশ্চিত যে ঐ লোকটার ভূতের কাজ নয় এসব? আমাদের হয়তো ভয় দেখাতে চাইছে সে”।

তারা দু’জনই হেসে উঠলেন আমার কথা শুনে, লেটি আর ওর নানীমা। বোকা বোকা লাগতে লাগলো, “দুঃখিত,” বললাম।

“ভূতরা কখনও কিছু বানাতে পারে না,” লেটি বললো। “ওরা তো কোন কিছু ভালোমতো নাড়াতেও পারে না”।

“যাও তোমার মা’কে ডেকে নিয়ে এসো,” লেটিকে বললেন নানীমা হেম্পস্টক, এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমাকে ফুলগুলো সাজাতে সাহায্য করো তো বাবু”।

তাকে ড্যাফোডিলগুলো ফুলদানীর ভেতর ঢুকিয়ে রাখতে সাহায্য করলাম আমি। কোথায় ফুলগুলো রাখলে ভালো দেখাবে সেটা আমার কাছ থেকেই শুনে নিলেন তিনি। নিজের মতামতকে এভাবে গুরুত্ব পেতে দেখে খুব ভালো লাগলো মনে মনে, সচরাচর এমনটা কমই হয়।

ড্যাফোডিলগুলোর কারণে রান্নাঘরটার উজ্জ্বলতা বেড়ে গেলো বহুগুণে। আরো বেশি রঙিন মনে হচ্ছে চারপাশটা। টালি পাথরের মেঝে আর ধবধবে সাদা রঙের দেয়ালেরও অবদান আছে এর পেছনে।

আমাকে মধু দিয়ে রুটি খেতে দিলেন নানীমা হেম্পস্টক। লেটিদের নিজস্ব মৌমাছির খামারের মধু। দারুণ লাগলো।

বাটি থেকে শেষ ফোটা মধুটুকুও চেটে খাচ্ছিলাম এই সময় লেটি ফিরে আসলো ওর মা’কে নিয়ে। মিসেস হেম্পস্টক একটা বিশাল বুট পড়ে আছেন এখনও, দেখে মনে হচ্ছে যেন খুব তাড়া আছে তার। “মা! আপনি যে কি করেন না! বাচ্চাটার দাঁতে পোকা হবে তো এত মিষ্টি খেলে”।

“কেউ ওর দাঁতের ক্ষতি করার চেষ্টা করার চেষ্টা করে দেখুক,” বললেন নানীমা হেম্পস্টক। “আমার সাথে বোঝাপড়া করতে হবে তাদের”।

“ব্যাক্টেরিয়ারা তো আপনার কথা শোনার জন্যে বসে আছে,” মিসেস হেম্পস্টক বললেন। “অন্যদের মাতবরি পছন্দ করে না ওরা”।

“বোকার মত কথা বলো না তো। শক্তের ভক্ত, নরমের যম সবাই। আমি যে পনিরগুলো বানাই ওগুলোতে কিভাবে কাজ করে ওরা, সেটা তো জানোই তুমি। একসময় পনির বানিয়েই কত পুরস্কার পেয়েছি আমি। লোকজন ঘোড়ায় চড়ে একসপ্তাহ ভ্রমণ করে দেশের আরেক মাথা থেকে আসতো আমার পনির কেনার জন্যে। আর তাছাড়া ব্যাক্টেরিয়াদের চোখে চোখে না রাখলে যে কোন সময় অসুখ বিসুখ দেখা...”

“নানীমা,” তার কথার মাঝেই বলে উঠলো লেটি। চুপ করে গেলেন তিনি। লেটির মা বললো, “হ্যাজেল কাঠের একটা লাঠি নিয়ে যেও, লাগবে ওটা, আর...” খানিকটা বিভ্রান্তি ভর করলো তার কণ্ঠস্বরে, “ছেলেটাকেও সাথে নিতে পারো। ওটা যেহেতু ওরই। ও থাকলে মহিলা যে পয়সাটা বানিয়েছে সেটা বহন করতেও সমস্যা হবে না”।

“মহিলা?” লেটি জিজ্ঞেস করলো। ওর হাতে আবার সেই ছুরিটা দেখতে পেলাম আমি, ভাঁজ করা আছে এখন।

“মনে তো হচ্ছে কোন নারী সত্ত্বা আছে এসবের পেছনে,” লেটির মা জবাব দিলেন। “আমার ভুলও হতে পারে”।

“ছেলেটাকে নেয়ার দরকার নেই,” নানীমা হেম্পস্টক বললেন। “শুধু শুধু বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে”।

একটু হতাশাই হলো তার কথা শুনে।

“আমাদের কোন সমস্যা হবে না,” লেটি বললো। “ওর খেয়াল রাখবো আমি। সেই সাথে আমারও। একটা অভিযানের মত হবে গোটা ব্যাপারটা, সেটাতে ওর সঙ্গ পেলে ভালো লাগবে আমার। যেতে দাও নানীমা”। আশা নিয়ে নানীমা হেম্পস্টকের দিকে তাকলাম আমি, অপেক্ষা করতে লাগলাম তিনি কি বলেন সেটা শোনার জন্যে।

“যদি সমস্যা হয় কোন, তখন আবার বলো না যে আমি সাবধান করি নি,” বললেন নানীমা হেম্পস্টক।

“ধন্যবাদ, নানীমা। সেটা বলতেও হবে না আমাকে। সাবধানে থাকবো আমরা”।

নানীমা হেম্পস্টকের চোখটা হঠাৎ ছলছল করতে লাগলো, “বোকার মত সাহস দেখাতে যেও না যেন। সাবধানে মুখোমুখি হবে জিনিসটার। এরপর বন্ধন মন্ত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। যাতে আর না ফিরে আসে”।

“আমি জানি,” বললো লেটি। “কিছু হবে না আমাদের”।

তেমনটাই বলেছিলো ও। কিন্তু কিছু একটা ঠিকই হয়েছিলো।

অধ্যায় ৪

লেটি আমাকে পুরনো রাস্তাটার পাশে হ্যাজেল গাছগুলোর ওখানে নিয়ে আসলো। হ্যাজেল গাছ বসন্তের সময় দারুণ দেখায়, ফুলগুলো ফোটান আগে উল্টো হয়ে ঝুলে থাকে কিছুদিন। একটা হ্যাজেল গাছের চিকন ডাল ভেঙে নিল লেটি, এরপর ওর সাথের ছুরিটা দিয়ে দক্ষ হাতে সেটার বাকল ছাড়িয়ে কাজে লেগে পড়লো। দেখে মনে হচ্ছে যেন এই কাজটার ব্যাপারে হাজার বছরের অভিজ্ঞতা আছে তার। দেখতে দেখতে ইংরেজি ওয়াই অক্ষরের মত হয়ে গেলো লাঠিটা। এরপর ছুরিটা রেখে দিয়ে (জানি না কোথায়), দুই হাত দিয়ে ওয়াই এর দুটো মাথা ধরে রাখলো লেটি।

“এটাকে শুধুমাত্র একটা নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করবো আমি। শুরুতে একটা নীল রঙের বোতল খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। অথবা বেগুনী আর নীল রঙের মাঝামাঝি, চকচকে”।

ওর সাথে আশেপাশে তাকালাম, “ওরকম কিছু তো চোখে পড়ছে না আমার”।

“পড়বে, চোখে অবশ্যই পড়বে,” আমাকে আশ্বস্ত করলো ও।

খুঁজতে লাগলাম মনোযোগ দিয়ে। একটা লাল-বাদামী রঙের মুরগীকে দেখলাম ভয়ে ভয়ে ঘাসের ভেতর থেকে গলা বের করে উঁকি দিচ্ছে আমাদের দিকে। কিছু জং ধরা খামারের যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আশেপাশে। হেম্পস্টকদের লাল ইটের খামারবাড়িটাও চোখে পড়লো আমার, সামনে বিশাল বিশাল ছয়টা খালি দুধের পাত্র কাঠের পাটাতনের ওপর। বাড়িটা দেখলেই যেন শান্তির একটা পরশ বয়ে যায় আমার মনে। ওখানে থাকার সময়টুকু নিরাপদ মনে হয় নিজেকে।

বসন্তের ফুল ফুটে আছে চারপাশে- ডেইজি, হলুদ রঙের ড্যানডেলিয়ন আর বুমকো ফুল (ওটার আসল নাম নাকি বাটারকাপ, কিন্তু সোনালি ফুলগুলো দেখলেই বুমকোর কথা মনে পড়ে আমার)। ঠিক এই সময়ে একটা নীল অপরাজিতার ওপর চোখ পড়লো, নিভতে পড়ে আছে কাঠের পাটাতনটার নিচে। ওটার গায়ে জ্বলজ্বল করছে শিশির কণা।

“ওটা?” জিজ্ঞেস করলাম।

“বাহ, বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তো তোমার!” সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বললো লেটি।

একসাথে অপরাজিতা ফুলটার কাছে হেঁটে গেলো আমরা। ওটার কাছে পৌঁছে চোখ বন্ধ করে ফেললো লেটি। তারপর ফুলটা ঘিরে চক্কর দিতে

লাগলো, হাত দিয়ে পূর্বদিকে বাড়িয়ে রেখেছে লাঠিটা। মনে হচ্ছে যেন কম্পাসের কাটা ঘুরছে কেন্দ্রকে ঘিরে। “কালো,” হঠাৎ করে বলে উঠলো ও, যেন স্বপ্নের বর্ণনা দিচ্ছে, “আর নরম”।

ফুলটা থেকে দূরে সরে যেতে থাকলাম আমরা, একটা সরু পায়ে হাঁটা পথ দিয়ে। একশ কদম এগিয়ে মিনিভ্যানটা যেখানে পাওয়া গিয়েছিল প্রায় সেখানে পৌঁছে গেলাম। এরপরেই ওর চোখে পড়লো জিনিসটা ; একটা কালো কাপড়ের টুকরো আটকে আছে বেড়ার তারকাটার সাথে।

ওটার দিকে এগিয়ে গেলো লেটি। আবার আগের মতো বাড়িয়ে ধরলো লাঠিটা, সেই সাথে ঘুরছে, সামনে পেছনে। এবার একদম নিশ্চিত ভঙ্গিতে বললো, “একদম লাল। ঐ দিকে”।

ওর নির্দেশিত দিকটার দিকে একসাথে হেঁটে যেতে লাগলাম আমরা। একটা ঘাসের মাঠ পেরিয়ে ঘন গাছপালার কাছে চলে আসলাম কিছুক্ষণের মধ্যে। “ওখানে,” বললাম আমি, মুগ্ধ ওর কর্মকাণ্ডে।

একটা ছোট্ট ইদুর সদৃশ প্রাণীর মৃতদেহ পড়ে আছে সবুজ মসের কার্পেটের ওপরে। মাথা নেই ওটার, সেই জায়গা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ায় লাল হয়ে আছে আশপাশের খানিকটা মস। ওটার লোমশ গায়েও লেগে আছে রক্ত। রক্তগুলো কেমন যেন একটু বেশিই লাল মনে হল আমার।

“এখন থেকে,” লেটি বললো, “আমার হাত ধরে রাখবে শক্ত করে, ছাড়বে না একদম”।

আমার ডানহাত দিয়ে ওর বামহাতটা ধরলাম, কনুইয়ের নিচে। হ্যাজেল কাঠের লাঠিটা আবার সামনে বাড়িয়ে ধরলো ও, “এদিকে”।

“এখন কি খুঁজছি আমরা?”

“কাছাকাছি চলে এসেছি,” বললো ও। “এখন যা খুঁজছি সেটা হচ্ছে একটা ঝড়”।

গাছপালার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা বনে পৌঁছে গেলাম আমরা। এখানে ঘন হয়ে জন্মে আছে নাম না জানা অনেক ঝোপঝাড়। ওগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে পথ সৃষ্টি করে সামনে এগোতে থাকলাম। একসময় বনের ভেতর খালি একটা জায়গা চোখে পড়লো, অরুচিরদিকে সবুজের সমারোহ।

আমাদের বাম দিক থেকে মেঘের গর্জনের আওয়াজ কানে আসলো এই সময়।

“ঝড়,” গেয়ে উঠলো লেটি। সেই সাথে দোলাতে লাগলো শরীর। ওর হাত ধরে থাকায় আমার মনে হলো শক্তির প্রচণ্ড কোন আধার ধরে আছি আমি, ইঞ্জিনের মত। কাঁপতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম যে ওর হাতের লাঠিটার কারণে এমন হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরেই নতুন এক দিকে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। একটা ছোট্ট বর্ণা পার হলাম। এরপরই হঠাৎ থেমে গেলো ও, কিন্তু হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো না।

“আমরা কি ওখানে পৌঁছে গেছি?” জিজ্ঞেস করলাম।

“এখনও না,” বললো ও, “সে জানে আসছি আমরা। কিন্তু সেটা চায় না সে”।

হ্যাজেল কাঠের লাঠিটা কাঁপছে এখনও। দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা চুম্বককে জোর করে একই মেরুর আরেকটা চুম্বকের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে কেউ।

এসময় একটা দমকা হাওয়ার ঝলক ধূলো আর মরা পাতা ছুড়ে দিল আমাদের দিকে। কাছেই কোথাও থেকে গর্জনের শব্দ কানে আসছে, ট্রেনের ইঞ্জিনের মত শোনাচ্ছে অনেকটা। দেখতে কষ্ট হচ্ছে এখন আমাদের। ঘন গাছ পালার মাঝ দিয়ে যেটুকু আকাশ চোখে পড়লো, একদম কালো হয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কালো মেঘগুলো একদম আমাদের মাথার ওপরে ভিড় করেছে কিংবা মুহূর্তের ব্যবধানে গোধূলী নেমে এসেছে ধরনীতে।

“মাথা নিচু করো,” এসময় জোরে বলে উঠলো লেটি। এরপর হাঁটু মুড়ে মসের ওপর আমাকে নিয়ে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ পর ইশারায় উপুড় শোয়ার নির্দেশ দিলে সেটা পালন করলাম আমি। একটু বোকা বোকা লাগছে এভাবে ভেজা মাটির ওপর শুয়ে থাকতে।

“কতক্ষণ এভাবে...?”

“শশশশস,” প্রায় রাগী ভঙ্গিতে শব্দটা করলো ও। চুপ করে থাকলাম। বনের ভেতর থেকে আমাদের মাথার ওপর এসে থামলো কি যেন। ঊঁকি দিলাম আমি। লোমশ, বাদামী রঙের কিছু একটা চোখে পড়লো (অমন জিনিস এর আগে দেখিনি আমি, দেখবো কল্পনাও করিনি)। বিশাল এক কম্বলের মত দেখাচ্ছে ওটাকে, নড়ছে কোনার দিকগুলো, আর সামনের দিকে একটা মুখ, ধারালো দাঁত ভর্তি সেখানে।

কিছুক্ষণ আমাদের ওপর ভেসে থেকে উধাও হয়ে গেলো জিনিসটা।

“কি ছিল ওটা?” জিজ্ঞেস করলাম। আমার হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে লাফাচ্ছিল যে সন্দেহ হল উঠে দাঁড়াতে পারবো কি না।

“মন্ত নেকড়ে,” বললো লেটি (সেই প্রথম শুনেছিলাম মন্ত শব্দটা)। “আমরা ইতিমধ্যেই আমার কল্পনার চেয়ে একটু বেশি দূরে এসে পড়েছি”। উঠে দাঁড়িয়ে সেই কিস্তৃত বস্তুটার গমন পথের দিকে তাকালো ও। হ্যাজেল কাঠের লাঠিটা আস্তে করে উঠিয়ে একবার ঘোরালো চারপাশে।

“কোন সাড়া পাচ্ছি না আমি,” মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের ওপর এসে পড়া চুলগুলো সরালো ও। এখনও দু’হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রেখেছে লাঠিটা। “হয় ওটার একদম কাছে চলে এসেছি আমরা, নয়তো লুকিয়ে আছে”। ঠোঁটে কামড় দিয়ে ভাবলো কিছুক্ষণ। এরপর বললো, “শিলিংটা! তোমার গলায় যে শিলিংটা আটকেছিল ওটা বের করো”।

বামহাত দিয়ে পকেট থেকে ওটা বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলাম।

“না,” বললো ও। “এটা ধরা যাবে না আমার, অন্তত এখনই না। লাঠির আগায় রাখো ওটা”।

কারণ না জিজ্ঞেস করে রূপালী শিলিংটা লাঠির অগ্রভাগে রেখে দিলাম আমি। লেটি এবার দু’হাত আরো সামনে বাড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগলো চারপাশে। আমিও ঘুরছি ওর সাথে। কিন্তু এখন আর আগের মত অনুভূত হচ্ছে না। কাঁপছে না ওর হাত। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ থেমে গেলো ও, “দেখো!”

ও যদিও মুখ ফিরে ছিল সেদিকে তাকালাম, কিন্তু গাছপালা আর ঝোপঝাড় ছাড়া কিছু চোখে পড়লো না।

“ওদিকে না, এখানে দেখো,” চোখ দিয়ে নির্দেশ করলো ও।

হ্যাজেল কাঠের লাঠিটার সামনের প্রান্ত থেকে ধোয়া উঠছে। একবার বামে, এরপর ডানে, এরপর আবার একটু বামে সরলো ও। এবার উজ্জ্বল কমলা রঙ ধারণ করলো লাঠিটার অগ্রভাগ।

“এরকম কিছু আগে দেখিনি,” বললো লেটি। “পয়সাটা সংরক্ষিত বর্ধক হিসেবে ব্যবহার করছি আমি, কিন্তু ওটা যেন...”

এসময় মৃদু হুস! করে একটা আওয়াজ হলো আর আশুন ধরে গেলো লাঠিটার মাথায়। ওটা ভেজা মসের ওপর নামিয়ে রাখলো ও, বললো, “তোমার পয়সাটা উঠিয়ে নাও”। সেটাই করলাম আমি। সাবধানে উঠালাম পয়সাটা। ভেবেছিলাম ওটা হয়তো গরম হৈঁধে হাতে, কিন্তু বরফের মত

ঠাঙা হয়ে আছে। লাঠিটা সেই মসের ওপরেই রেখে দিলো লেটি, এখনও মৃদু ধোয়া উঠছে ওটার অগ্রভাগ থেকে।

লেটির পাশাপাশি আমিও হাঁটতে লাগলাম। এখনও হাত ধরাধরি করে আছি আমরা, আমার ডান হাত ওর বাম হাতের মুঠোয়। বাতাসে কেমন যেন অদ্ভুত একটা ঘ্রাণ, যেন কয়েকশো আতশবাজি পোড়ানো হয়েছে এক সাথে। যতই সামনে এগোচ্ছি ততোই অন্ধকার হয়ে আসছে পরিবেশ।

“আমি তো বলেছিলাম তোমাকে যেভাবে হোক রক্ষা করবো, তাই না?” বললো লেটি।

“হ্যাঁ”।

“কথা দিয়েছিলাম যে কষ্ট পাবে না তুমি”।

“হ্যাঁ”।

“শক্ত করে ধরে রাখো আমার হাত। ছাড়বে না, যা-ই ঘটুক না কেন”।

ওর উষ্ণ হাতের ছোয়ায় ভরসা পেলাম।

“ধরে রাখো,” আবারো বললো ও, “আর আমি না বলা পর্যন্ত কিছু করবে না। বুঝতে পেরেছো?”

“আমার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে,” বললাম।

সাথে সাথে কোন জবাব না দিলো না ও। কিছুক্ষণ পর বললো, “যেটুকু ইচ্ছে ছিল, তার চেয়ে বেশি দূরে চলে এসেছি আমরা। এতদূর আসবো ভাবিনি। এখানে কারা থাকে সেটা সম্পর্কে আমি নিজেও নিশ্চিত নই”।

এসময় হাঁটতে হাঁটতে গাছপালার ভেতর থেকে খোলা ময়দানে বের হয়ে আসলাম আমরা।

“আমরা কি তোমাদের খামার থেকে অনেক দূরে?” জিজ্ঞেস করলাম।

“না, আমরা এখনও খামারের সীমানার ভেতরেই আছি। হেম্পস্টক খামার অনেক বড়। এখানে আসার সময় এসবের বেশ বড় একটা অংশ পুরনো দেশটা থেকে নিয়ে এসেছি আমরা। খামারটাও এসেছে আমাদের সাথে, আর সেটার সাথে এসেছে কিছু আজব জিনিস। নানীমা ‘উটকো ঝামেলা’ বলে ডাকে ওসবকে”।

এ মুহূর্তে ঠিক কোথায় আছি আমরা সেটা হয়তো জানি না। কিন্তু এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল যে হেম্পস্টক খামারের সীমানার ভেতরেই আছি। যে পৃথিবীতে বড় হয়েছি আমি তার সাথে বড় বোশ আমিল জায়গাটার। এখানকার আকাশ অনেকটা কমলা; গাছপালাগুলোও অনেকটা অদ্ভুত, রূপালী সবুজ পাতা ওগুলোর, দেখতে কাঁটার মতো।

আমার বাম হাতে ধরে রাখা পয়সাটা আবারও বরফের মত হিম ছড়াতে শুরু করেছে। ডান হাত দিয়ে শক্ত করে আঁকড়ে রেখেছি লেটিকে।

“পৌঁছে গেছি আমরা,” বললো ও।

প্রথমে মনে হচ্ছিল কোন একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছি যেন। ধূসর আর গোলাপী রঙের ক্যানভাসে তৈরি এক ধরনের তাবু। সারকাসের তাবুগুলোর মত উঁচু চূড়া ওটার। বয়সের ভারে জীর্ণ তাবুটা এই কমলা আকাশের নিচে একটু বেমানান। ঝড়ো বাতাসে উড়ছে ওটার ক্যানভাসগুলো, শব্দ হচ্ছে ভীষণ।

এরপরে ওটা ঘুরে দাঁড়ালে চেহারাটা নজরে এলো আমার। কুকুরের কান্নার মত আওয়াজ কানে আসলো কোথা থেকে যেন এসময়, কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম যে ভয়ে আমার মুখ থেকেই বের হচ্ছে আওয়াজটা।

জীর্ণ চেহারার ক্যানভাসের গায়ে বড় বড় দু'টো ফুটো, ওটার চোখ। তার পেছনটা অন্ধকার।

ওটার একটা অংশ নড়ে উঠলো এ সময়। আমাদের দিকে তাকালো জীর্ণ চেহারার বস্তুটা।

“তোমার নাম বলো,” লেটি হেম্পস্টক আদেশ করলো।

কিছুক্ষণ যেন থেমে থাকলো সময়। শূন্য দৃষ্টিটা নিবন্ধিত আমাদের দিকে। এরপর বাতাসে যেন গুঞ্জন উঠলো হঠাৎ, “আমিই এই এলাকার কত্রী। দীর্ঘ সময় ধরে এখানে বসবাস আমার। মানব মানবীরা যখন একে অপরকে পাথরের বেদীতে উৎসর্গ করতো তারও আগে থেকে। আমার নাম শুধু আমার, সেটা শোনার কোন অধিকার কারো নেই মেয়ে। এখন যাও এখান থেকে, আমাকে নিজের মত থাকতে দাও। নাহলে পরিণাম ভাল হবে না”। আবিষ্কার করলাম যে কাঁপছি আমি।

লেটি আমার হাতে আলতো চাপ দেয়ায় কিছুটা সাহস ফিরে পেলাম।

“তোমাকে নাম জিজ্ঞেস করেছি, এসব ফাঁকা বুলি আওরাতের বুলিনি। ওরকম কথা ঢের শোনা আছে আমার। এখন ভালোয় ভালোয় নাম বলো, তৃতীয়বার আর জিজ্ঞেস করবো না আমি,” খানিকটা গ্রাম্য টানে কথাগুলো বললো লেটি; গলায় স্পষ্ট রাগ। রেগে গেলে কথা বলার ধরন পাল্টে যায় ওর।

“না,” ধূসর বস্তুটা জবাব দিলো, “তোমার সাথে বস্তুটা কে মেয়ে?”

“কিছু বলবে না,” ফিসফিসিয়ে আমাকে সতর্ক করলে দিলো লেটি। মাথা নাড়লাম চুপচাপ।

“ক্লান্ত লাগছে এসব ঠুনকো কথাবার্তা বলতে বলতে,” ধূসর জিনিসটা বললো। ভীষণ ভাবে দুলে উঠলো ওটার ডানপাশটা। “কেউ একজন এসেছিলো আমার কাছে। ভালোবাসা আর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলো। আমাকে বলেছে যে কিভাবে ওর মত অন্য সবাইকে খুশি করতে পারি। একদম সাধারণ জীব ওরা। আনন্দের জন্যে শুধু টাকার দরকার, আর কিছু না। ওদের চাইলে জ্ঞান, শান্তি আর ন্যায়বোধও দিতে পারতাম আমি...”

“ওসব কিছুই লাগবে না,” বললো লেটি হেম্পস্টক। “ওদের দেয়ার মত কিছুই নেই তোমার কাছে। শান্তিতে থাকতে দাও ওদেরকে”।

এসময়ে বাতাস গর্জে উঠলো ভীষণ, দমকা হাওয়ায় ঝাপটাতে লাগলো প্রকান্ড জিনিসটা, জাহাজের পালের মত। বাতাস থেমে আসার পর মনে হলো জায়গা পরিবর্তন হয়েছে ওটার। জমিন থেকে একটু ওপরে ভাসছে এখন। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা চালানোর আগে ল্যাবরেটরির সাদা ইঁদুরগুলোর দিকে যে দৃষ্টিতে তাকায় ঠিক সেভাবে ওটা পর্যবেক্ষণ করছে আমাদের।

দু’টা সাদা ইঁদুর, হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে।

লেটির হাত এতক্ষণে ঘামছে, সে-ও নিশ্চয়ই আমার মতই ভয় পাচ্ছে। এখনও শক্ত করে ধরে আছে আমার হাত, সেটা কি নিজেকে নাকি আমাকে আশ্বস্ত করার জন্যে তা বুঝতে পারলাম না। একবার চাপ দিলাম ওর হাতে, আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে।

জিনিসটার চেহারা যেখানে ছিল সেখানটা মুচড়ে উঠলো এসময়। হাসছে মনে হলো। আসলেই বোধহয় হাসছে। কেন যেন মনে হতে লাগলো যে আমাকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে সেটা। যেন আমার সম্পর্কে জানে সব কিছু যেগুলো এমনকি আমি নিজেও জানি না।

“আমাকে যদি তোমার নাম না বলো তবে অজ্ঞাত সত্ত্বা হিসেবেই তোমাকে বন্ধন মন্ত্র দিয়ে বেঁধে ফেলবো আমি। আর সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার সাধ্য হবে না তোমার। আটকে থাকবে ঝিনুকের খোলসের ভেতর বন্দি হয়ে থাকা মুক্তোর মতো,” লেটি শাসালো।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো ওটা কিন্তু কিছু বললো না। এবার ভিন্ন এক ভাষায় কথা বলে উঠলো লেটি। মন্ত্র জপার মত একটানা বিড়বিড় করছে লাগলো ও, মাঝেমাঝে মনে হচ্ছে যেন গান গাচ্ছে। এরকম ভাষা কৌনদিন শুনবো সেটা ভাবিনি আমি। ভবিষ্যতে আবার কৌনদিন শুনতে হবে নাকি তাও জানি না। তবে সুরটা পরিচিত আমার, বাচ্চাদের একটা ছড়াগানের সুর।

আমরা নার্সারীতে থাকতে গাইতাম ওটা। তবে সুরটাই শুধু এক, কথা আর ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন এটুকু নিশ্চিত।

আর এই কমলা আকাশের নিচের পরিবেশ প্রভাবিত হলো ওর গানের সুরে। আমাদের পায়ের কাছে ভূমি দুইভাগ হয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসলো কেঁচো সদৃশ কিছু বস্তু।

আর বিশাল তাবুটার ভেতর থেকে সশব্দে আমাদের দিকে ছুটে আসলো কিছু একটা। ফুটবল বলের চেয়ে একটু বড় ওটা। স্কুলে সাধারণত খেলার সময় আমার দিকে বল কিংবা অন্য কিছু ছুড়ে মারলে সেটা ধরতে পারি না আমি, উল্টো আমার মাথায় কিংবা পেটে আঘাত করে ওটা। কিন্তু এবার যখন বলসদৃশ বস্তুটা আমার আর লেটির দিকে ছুটে আসলো, কিছু না ভেবেই ওটা ধরে ফেললাম আমি।

দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলাম বস্তুটাকে। মাকড়সার জাল আর পুরনো কাপড়ে তৈরি জিনিসটা ঝাপটাচ্ছে হাতের ভেতরেই। আর ওটা ধরার সময় হঠাৎ আমার পায়ের পাতায়, গোড়ালির কাছটাতে সূচের মত কিছু একটা বিঁধলো। কিন্তু পরক্ষণেই চলে গেলো ব্যাথাটা। যেন ভুলক্রম একটা পিনে পা দিয়েছিলাম।

লেটি আমার হাত থেকে বস্তুটা নিয়ে ছুড়ে ফেললো দূরে। এরপর আবার আমার হাত আঁকড়ে ধরলো শক্ত করে। পুরো সময়টা এক নাগাড়ে গেয়েই যাচ্ছে ও।

এই গানটা স্বপ্নে শুনেছি আমি বেশ কয়েকবার, তখন ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম কি বলছে ও। স্বপ্নগুলোতে আমিও সেই ভাষাতেই কথা বলতাম। আদিম এই ভাষার অস্তিত্ব সময়ের একদম শুরু থেকে। যা বলা হবে এই ভাষাতে সেটাই ঘটবে, মিথ্যে কিছু আওড়ানো যায় না এটার মাধ্যমে। স্বপ্নে ভাষাটার ওপর আমার দখল ছিল অবাক করার মত। সেখানে কথা দিয়েই পীড়িত মানুষদের দুন্দশা দূর করেছিলাম। উড়ে বেড়িয়েছিলাম আকাশে। সাগরতীরে একটা বিশাল বিছানা আর নাস্তার টেবিল তৈরি রাখতাম সবসময়। আমার সাথে থাকতে সেখানে যারা আসতো তাদের উদ্দেশ্যে বলতাম, ‘পূর্ণতা প্রাপ্তি হোক’। আর পূর্ণ হয়ে যেতো তারা, দূর হয়ে যেতো ভেতরের সব গল্পানি কারণ সেই ভাষাতে কথাটা বলতাম আমি।

আর লেটি যেহেতু সেই যাদুকরী ভাষাতেই কথা বলছে তাই অর্থ না বুঝতে পারলেও ধারণা করতে পারলাম কি বলছে ও। প্রকান্ড বস্তুটাকে এখানে

আটকে ফেলা হবে, চিরদিনের জন্যে। যেন অন্য কোন সত্ত্বাকে আর কখনো প্রভাবিত না করতে পারে সেটা।

শেষ হলো লেটির গান।

আমার মনে হতে লাগলো জিনিসটা যেন ছটফট করছে, চিৎকার করে বাঁধা দেয়া চেষ্টা করছে। আশেপাশের পরিবেশ একদম নীরব। মাঝে মাঝে শুধু তারুর ক্যানভাস ঝাপটাচ্ছে।

বাতাস থেমে গেলো এসময়।

হাজার হাজার ছেড়া মলিন ধূসর কাপড়ের টুকরো ঝড়ে পড়লো মাটির ওপর, প্রাণহীন বস্তুর মত। নাড়াচাড়া করছে না কিছু।

“এটুকুতেই কাজ হবার কথা,” আমার হাতে চাপ দিয়ে বললো লেটি। মৃদু হেসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলো, কিন্তু কাজ হলো না ওতে। পরক্ষণেই গম্ভীর স্বরে বললো, “চলো তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেই”।

হাত ধরাধরি করেই চিরসবুজ গাছপালার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগলাম আমরা। একটা রঙিন পুকুর পার হলাম অলঙ্কার দিয়ে সাজানো সেতুর ওপর দিয়ে।

তারপর ভূট্টা ক্ষেতের মাঝ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। সারি সারি গাছগুলোতে কেবল ফুল আসতে শুরু করেছে। ভূট্টার ক্ষেত পার হবার পর অদ্ভুত একটা মাঠে চলে আসলাম আমরা। এটায় বোনা জিনিসগুলো অনেকটা সাপের মত সরু, কিন্তু লোমশ ঠিক বেড়ালের লেজের মত। সাদা, কালো, কমলা নানা রঙের।

“এগুলো কি?” জিজ্ঞেস করলাম।

“টান দিয়ে একটা বের করে দেখতে পারো তুমি, ইচ্ছে করলে,” বললো লেটি।

নিচের দিকে তাকলাম, আমার পায়ের কাছে থাকা জিনিসটা একদম কালো। ঝুঁকে ওটার গোড়া ধরে টান দিলাম জোরে।

মাটি ফুড়ে বের হয়ে আসলো কিছু একটা, মোচড়াচ্ছে ভীষণ। হঠাৎ মনে হলো যেন ধারালো কিছু দিয়ে আঁচড় দেয়া হচ্ছে আমার হাতে। আরেক হাত দিয়ে ওটার গা থেকে মাটি পরিষ্কার করে ক্ষমা চাইলাম। কিন্তু ওটার দৃষ্টিতে রাগের বদলে বিভ্রান্তি খেলা করছে। লাফ দিয়ে আমার হাত থেকে ঘাড়ের ওপর উঠে গেলো। হাত বুলিয়ে দিলাম ওটার গায়ে। একটা ছোট্ট, কালো বিড়াল ছানা। কানের কাছটাতে সাদা ছোপ সজবুজ নীল রঙের চোখটা অদ্ভুত সুন্দর।

“আমাদের খামারের বিড়ালগুলো অবশ্য স্বাভাবিক ভাবেই জন্ম নেয়া,” লেটি বললো।

“তাই?”

“হ্যাঁ। অলিভার নামের একটা বিড়াল উদয় হয়েছিল খামারে, প্যাগানদের আমলে। ওকেই আমাদের এখানকার সব বেড়ালের পূর্বপুরুষ বলা যায়”।

“এটাকে কি বাসায় নিতে পারি আমি?” জিজ্ঞেস করলাম। মায়া লাগছে বেড়াল ছানাটাকে দেখে।

“না, খামারের এই অংশ থেকে বাসায় কিছু নেয়াটা নিরাপদ হবে না,” লেটি বললো।

নামিয়ে রাখলাম ওটাকে। সাথে সাথে একটা প্রজাপতিকে তাড়া করতে শুরু করলো ছোট ছোট পায়ে, আমার দিকে ঘুরেও তাকালো না।

“আমার বেড়ালছানাটা ট্যাজ্জি চাকার নিচে পড়ে মারা গেছে,” লেটিকে বললাম। “একদম বাচ্চা ছিল ওটা। যে লোকটা আত্মহত্যা করেছে, সে-ই আমাকে জানিয়েছিল ওর মৃত্যুসংবাদ, অবশ্য তিনি নিজে ট্যাক্সিটা চালাচ্ছিলেন না। ফ্লুফিকে নাকি দেখতে পায়নি চালক”।

“আমি দুঃখিত,” বললো লেটি। একটা আপেলের বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটছি আমরা এখন। চারদিকে আপেল ফুলের গন্ধে ম ম করছে। “জীবিত যে কোন কিছুর এই এক সমস্যা। বেশিদিন স্থায়ী হয়না। চোখের নিমেষে বুড়ো হয়ে যায় ছোট্ট বেড়াল ছানা। রয়ে যায় শুধু স্মৃতি। একসময় স্মৃতিও হয়ে যায় মলিন...”

একটা কাঠের তক্তার তৈরি দরজার কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা কথা বলতে বলতে। ওটা ঠেলে বের হয়ে আসলাম। এখন আমার হাত ছেড়ে দিয়েছে লেটি। গলির শেষ মাথায় পৌঁছে গেছি আমরা। সবকিছু আবার স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। লেটিদের খামার বাড়ি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

“আমরা কি আসলেও ফিরে এসেছি?” জিজ্ঞেস করলাম।

“হ্যাঁ,” লেটি হেস্পটক জবাব দিলো। “ওটা আর বিস্তৃত করবে না এখানকার কাওকে। বিশাল ছিল জিনিসটা, তাই না? একদম জঘন্য। এত বড় কিছু আগে দেখিনি আমি। আমি যদি আগে থেকে জানতাম যে ওটা এত বড়, এত প্রাচীন আর এত জঘন্য হবে, তাহলে তোমাকে রেখে যেতাম”।

কিন্তু ওর সাথে যেতে পেরে খুশি আমি।

“তখন আমার হাতটা কিছুক্ষণের জন্যে না ছাড়লেও পারতে,” হঠাৎ বলে উঠলো লেটি। “তবে তোমার তো কিছু হয়নি, তাই না? একদম ঠিক আছো”।

“চিন্তা করো না তো, কিছুই হয়নি আমার,” বললাম। “আমি অনেক সাহসী”।

আমার দাদা কথাটা বলতেন সবসময়।

আমার দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল একটা হাসি দিলো লেটি। কিছুক্ষণ আগের উদ্বেগ আর নেই চেহারায়।

মনে হয় ঠিক কথাটাই বলেছি আমি।

অধ্যায় ৫

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার বোন ওর বিছানায় বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল। প্রতি রাতে ঘুমোনের আগে একশবার চুল আঁচড়ায় ও, আর গোণে এক দুই করে। কেন? সেটা জিজ্ঞেস করিনি কোনদিন।

“কি করো তুমি?” জিজ্ঞেস করলো ও।

“পায়ের দিকে তাকিয়ে আছি,” বললাম।

আসলেও আমার ডানপায়ের গোড়ালির দিকে তাকিয়ে আছি। গোড়ালির মাঝখানে একটা গোলাপি রঙের দাগ। একদম ছোট থাকতে এই জায়গাটাতেই কেটে গেছিলো একবার, ভাঙা কাঁচ পায়ে লেগে। মনে আছে সেদিন ঘটনার পরে বিছানায় বসে সেলাইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। আমার একদম ছোটবেলার হাতে গোণা যে কয়টা স্মৃতি মনে আছে তার মধ্যে এটা একটা। এই গোলাপী রঙের ক্ষতচিহ্নটা আমার অস্তিত্বেরই একটা অংশ হয়ে গেছে এতদিনে। কিন্তু সেটার পাশে একটা ছোট গর্ত চোখে পড়লো, এটা নতুন। আজকে সেই পিনের খোঁচার মত অনুভূতিটার পরে হয়তো সৃষ্টি হয়েছে এটা। অবশ্য কোন প্রকার ব্যাথা করছে না। শুধু একটা গর্ত।

আঙুল দিয়ে একবার খোঁচা দিলাম গর্তে, মনে হলো কিছু একটা যেন ভেতরে ঢুকে গেলো।

আমার বোন চুল আঁচড়ানো বন্ধ করে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। উঠে বেডরুম থেকে বের হয়ে হলওয়ার শেষ মাথার বাথরুমটাতে চলে আসলাম।

বড় কারো সাথে কেন কথা বললাম না ব্যাপারটা নিয়ে তা জানি না। খুব ঠেকায় না পড়লে বড়দের সহজে কিছু জিজ্ঞেস করি না আমি। একবার আমার হাঁটু থেকে একটা আঁচিল ছোট ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে বের করেছিলাম এটা দেখার জন্যে ব্যাথা না পেয়ে কতদূর কাটাকাটি করা যায়। আর আঁচিলের গোড়ায় কি থাকে সেটা দেখারও ইচ্ছে ছিল আমার। বাথরুমের আয়নার পেছনের তাকে একটা স্টেইনলেস স্টীলের চিমটা রাখা আছে। মাথাটা একদম চোখা ওটার। বাথটাবে এক পাশে বসে গোড়ালির গর্তটা পরীক্ষা করতে লাগলাম। একদম সাধারণ একটা গর্ত। কতটা গভীর সেটা বোঝা যাচ্ছে না, কারণ কিছু একটা আছে গর্তটাতে। আলো পড়লেই ভেতরে চলে যাচ্ছে ওটা।

চিমটা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু কিছু ঘটলো না।

বামহাতের একটা আঙুল গর্তটার ওপর নিয়ে গেলাম, যাতে আলো না যায় ভেতরে। এরপর চিমটাটা হাতে নিয়ে আবার অপেক্ষা শুরু করলাম। একশ পর্যন্ত গুণলাম মনে মনে, এরপর আঙুল সরিয়ে চিমটা গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম।

কেঁচোটা (যদি আসলেও একটা কেঁচো হয়ে থাকে ওটা) চিমটার মাথা দিয়ে চেপে ধরে টান দিলাম।

কখনও একটা কেঁচোকে গর্ত থেকে টেনে বের করার চেষ্টা করে দেখেছেন? কতটা দৃঢ় ভাবে পুরো দেহের সাহায্যে আটকে থাকে ওরা জানেন? প্রায় এক ইঞ্চির মত কেঁচোটোর দেহ টেনে বের করলাম আমি চিমটা দিয়ে। এরপর হঠাৎ থেমে গেলো ওটা। চেপে ধরে আছে আমার পায়ের মাংস, পরিষ্কার অনুভব করতে পারছি। অবশ্য ব্যাপারটায় একদমই ঘাবড়ে যাইনি আমি। এরকমটা অনেকের সাথেই আগে হয়েছে নিশ্চয়ই। পায়ের গর্ত পেয়ে একটা কেঁচো ঢুকে গেছে সেখানে আশ্রয়ের আশায়।

কাঁটাচামচ দিয়ে নুডলস খাওয়ার সময় যেভাবে ওটা চামচের চারপাশে পৌঁচিয়ে নেই ঠিক সেভাবে ঘুরাতে লাগলাম চিমটাটা। আবার ভেতরে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করছে কেঁচোটা, কিন্তু আস্তে আস্তে মোচড় দিয়ে ওটাকে বের করে আনতে লাগলাম আমি।

এখনও অনুভব করতে পারছি যে মাংসে চেপে আছে কেঁচোটোর শরীরের শেষ অংশ। খুব কষ্টে সামনে ঝুঁকে বাথটাবের গরম পানির কলটা খুললাম। তিন চার মিনিট অপেক্ষা করার পর গরম পানি পড়তে শুরু করলো। ধীরে ধীরে খুব সাবধানে পা কলের কাছে নিয়ে যেতে লাগলাম। চিমটাটা দিয়ে এখনও শক্ত করে ধরে আছে কেঁচোটাকে, যেটুকু বের করতে পেরেছি গর্ত থেকে।

যখন ধোঁয়া উঠতে লাগলো গরম পানি থেকে, গর্তটা কলের নিচে ধরলাম। আগে থেকেই তৈরি ছিলাম বিধায় সহ্য করতে সমস্যা হলো না। আর গোড়ালির অংশের চামড়া মোটা হওয়ার কারণে তেমন অসুবিধাও হচ্ছে না। কিন্তু কেঁচোটা আগে থেকে মোটেও তৈরি ছিল না। সুস্থিতে পারলাম যে মাংসে ওটার চাপ শিথিল হয়ে আসছে। মুচড়ে সরে আসতে চাইছে গরম পানির সংস্পর্শ থেকে। কিন্তু সেটাকে সে সুযোগ না দিয়ে চিমটা দিয়ে টান দিলাম। তেমন প্রতিরোধ ছাড়াই গর্ত থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করলো ওটা।

ধীরে ধীরে বের করতে লাগলাম ওটাকে, গরম পানি লাগতেই কুকড়ে যাচ্ছে। প্রায় বের হয়ে এসেছে এসময় একটু বেশিই আত্মবিশ্বাসী হয়ে হ্যাঁচকা টান দিলাম। ভাবলাম যে পুরোপুরি বের হয়ে এসেছে ওটা, কিন্তু শেষ মাথা দেখে বুঝতে পারলাম কিছু অংশ ভেতরে রেখে ছিড়ে বের হয়ে এসেছে কেঁচোটা।

তবে ভেতরে রয়ে যাওয়া অংশটুকু একদম ক্ষুদ্র।

দেখতে লাগলাম কেঁচোটাকে। ধূসর আর গোলাপী রঙের মিশ্রণ ওটার গায়ের রঙ। সেই সাথে সাধারণ কেঁচোর মতোই ডোরাকাটা। মোচড়াচ্ছে চিমটার মাথায়।

ওটাকে মারার ইচ্ছে নেই আমার। সাধারণত কোন জীবিত প্রাণিকে মারি না আমি। কিন্তু কেঁচোটাকে কিছু একটা করতেই হবে, খুবই বিপজ্জনক এটা। বাথরুমের পানি যেখান দিয়ে ড্রেনে পড়ে যায় সেখানে চিমটা নিয়ে ছেড়ে দিলাম। গরম পানির সাথেই ড্রেনের ভেতর উধাও হয়ে গেলো ওটা। পায়ের গর্তটার ওপর একটা ব্যান্ড এইড লাগিয়ে বাথটাবের কলটা বন্ধ করে দিলাম। সেই সাথে ড্রেন লাইনের গর্তটাও ঢেকে দিলাম যাতে ওটা আবার ফেরত না আসতে পারে।

চিমটাটা জায়গামতো রেখে দিলাম আয়নার পেছনে। এরপর আয়নাটা চাপিয়ে দিয়ে নিজের প্রতবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

সেই বয়সে একটা চিন্তা প্রায়ই ভাবাতো আমাকে। কে আমি? যদি আয়নার ওপাশে থাকা মুখটা আমার না হয়ে থাকে? কারণ এই চেহারাটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমার ভেতরে যে সত্ত্বাটা আছে তার ওপর তো সেটার কোন প্রভাব পড়বে না। তাহলে আমার আসল পরিচয় কি?

বেডরুমে ফিরে গেলাম। আজকে ইচ্ছে করলে রুমের দরজা খোলা রাখতে পারবো। আমার বোনের ঘুমোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। এরপর হলওয়ার মৃদু আলোতে থ্রি ইনভেস্টিগেটরস সিরিজের একটা রহস্য উপন্যাস পড়লাম ঘুমে চোখ লেগে আসার আগ পর্যন্ত।

অধ্যায় ৬

আমার নিজের সম্পর্কে একটা স্বীকারোক্তি একদম ছোট থাকতে, তিন কি চার বয়স হবে তখন, খুবই দসি় ছিলাম। বড় হবার পরে আমার বেশ কয়েকজন আত্মীয় স্বজনের কাছে শুনেছি ‘ছোট্ট থাকতে জ্বালিয়ে মারতে তুমি’। মজার ছিলেই কথাগুলো বলতেন তারা, তাই কখনো মন খারাপ হয়নি। তবে আমার যতটুকু মনে পড়ে, আসলে দসি় ছিলাম না আমি, শুধু চাইতাম যে সবকিছু যেন আমার ইচ্ছে মোতাবেক হয়।

বাচ্চাদের চাহিদা সবসময় এরকম অবাস্তবই হয়, সবকিছু তাদের মেজাজ মর্জি মত চললেই কেবল হাসি ফোটে তাদের মুখে। দুনিয়াটাকে সবসময় রঙিন মনে হয় ওদের, যে রঙ মলিন হতে শুরু করে বয়স বাড়ার সাথে সাথে।

কিন্তু আমি আর ছোটটি নেই। শৈশবের রঙিন দিনগুলো ফেলে এসেছি আরো আগেই। তখনকার মত আর সাহসও নেই, ছোটোখাটো ঘটনায় ভয় পেয়ে যাই মাঝে মধ্যে।

আমার পায়ের ভেতরে কেঁচো ঢুকে যাবার ঘটনাটা অবশ্য আমাকে ভীত করেনি। কারো সাথে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলিনি আমি। অবশ্য পরের দিন এটা ভাবছিলাম যে অন্য কারো সাথেও এমনটা আগে ঘটেছে কিনা। নাকি সেই কমলা আকাশের নিচে হেম্পস্টক খামারের সীমান্তে আমিই এর প্রথম ভুক্তভোগী।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে পায়ের ব্যান্ড এইডটা খুলে ফেললাম। এটা দেখে স্বস্তি লাগলো যে গর্তটা অনেকটাই বুজে এসেছে। গর্তের জায়গায় ছোট্ট একটা গোলাপী রঙের ক্ষত।

নাস্তা খেতে নিচে চলে আসলাম। মার চোখে মুখে খুশীর দীপ্তি। “ভালো খবর আছে একটা,” বললো সে। “চাকরি পেয়েছি আমি। ডিকসন অপটিশিয়ানসে একজন অপটোমেট্রিস্ট (লেন্স বিশেষজ্ঞ) দরকার। আজ বিকেল থেকেই কাজ করতে বলেছে। সপ্তাহে চার দিন যেতে হবে”।

“সমস্যা হবে না আমার,” বললাম। নিজের দেখভাল নিজেই করতে পারবো।

“আরেকটা ভালো খবর আছে। তোমাদের দেখা শোনার জন্যে একজন মহিলা আসবেন। তার নাম আরসালা। তোমার পুরোনো ঘরটায় শোবে সে, সিঁড়ির ওপর তলায়। গৃহপরিচারিকাই বলি যায় তাকে। তোমাদের

খাবার-দাবারের ওপর নজর রাখার পাশাপাশি বাড়িঘরও পরিষ্কার করবে সে। মিসেস উইলোরির কোমরে নাকি ব্যাথা, কয়েক সপ্তাহ কাজ করতে পারবেন না তিনি। আমার আর তোমার বাবার অনুপস্থিতিতে বাসায় বড় কেউ থাকলে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবো আমরা”।

“কিন্তু সেটার জন্যে তো পর্যাপ্ত টাকা নেই আমাদের,” বললাম আমি।
“তুমিই তো বলেছিলে”।

“সেজন্যেই তো অপটোমেট্রিস্টের চাকরিটা নিচ্ছি,” মা বললো। “তাছাড়া তোমাদের দেখাশোনা করার বদলে কেবল থাকার জায়গা পেলেই চলবে আরসালার। এখানে কয়েকদিন থাকতে হবে তার। আজ সকালে ফোন দিয়েছিলো। খোঁজ খবর নিয়ে খারাপ কিছু শুনিনি ওর সম্পর্কে”।

আশা করি নতুন যিনি আসবেন তিনি ভালো স্বভাবের হবেন। এর আগে যিনি ছিলেন আমাদের দেখভাল করার জন্যে, তার জ্বালায় কিছুদিনের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়ি আমি আর আমার বোন। আমাদের সারাদিন জ্বালাতন করতেন তিনি। শেষমেষ অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে আমি আর আমার বোন বাসার বাইরে দাঁড়িয়ে ‘গেরট্রুডা নিপাং যাক’, ‘গেরট্রুডার রান্না খাবার অযোগ্য’ এসব শেল্লাগান দিতে বাধ্য হই আর তার বিছানায় ব্যাঙ ছেড়ে দেই। তার কিছুদিন পর সুইডেন ফেরত চলে যান তিনি।

একটা বই নিয়ে বাগানে চলে আসলাম।

বসন্তের একটা স্নিগ্ধ রৌদ্রজ্জ্বল দিন। দড়ির মই বেয়ে বড় বিচ গাছটার সবচেয়ে নিচের ডালে উঠে পড়লাম। তারপর সেখানে পা ঝুলিয়ে বসে ডুব দিলাম বইয়ের জগতে। বই পড়ার সময়টুকুতে জাগতিক কোন ভয় স্পর্শ করে না আমাকে। প্রাচীন মিশরের দেবী হ্যাথরের সাথে সিংহী স্বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখন। যেখানেই যাচ্ছে মানুষ মারছে সে। এত মানুষ মেরেছে যে মরুর বালির রঙ লাল হয়ে উঠছে ক্রমশ। এরপর সেখানকার লোকজন বিয়ার, মধু এবং ঘুমের ঔষধের সাথে লাল রঙ মিশিয়ে খাইয়ে দেয় তাকে। রক্ত মনে করে সেটা পান করার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ে হ্যাথর। এরপর দেবতাদের অধিপতি ‘রা’ তাকে প্রেমের দেবীতে রূপান্তরিত করেন। এতে যাদের যাদের কষ্ট দিয়েছিলো সে, তাদের ক্ষতের জায়গা ভরে ওঠে ভালোবাসায়।

দেবতারা এমন কেন করলো সেটা মাথায় ঢুকলো না আমার। সুযোগ পাওয়া মাত্র তাকে মেরে ফেললেই হতো।

পুরাণের গল্প ভালো লাগে আমার। এগুলো বড়দের গল্পও না আবার ছোটদের গল্পও না। ওগুলো থেকে হাজার গুণ ভাল গল্প।

বড়দের গল্পের কোন আগামাথা নেই। ধীরে ধীরে সেখানে ঘটে সবকিছু। ওগুলো পড়লে আমার মনে হতো যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে জীবনে আফসোসের পরিমাণ বাড়তে থাকে, আর বাড়ে জটিলতা। বড়রা নার্নিয়ার গল্প পড়ে না কেন? কিংবা পরীদের বা কঙ্কাল দ্বীপের গল্প?

ক্ষুধা পেলো এ সময় আমার। গাছ থেকে নেমে বাসার পেছন দিকে চলে আসলাম। লন্ড্রি রুম পাশ কাটিয়ে (সাবানের গন্ধ সেখানে) কয়লা রাখার ছাউনি এবং বাইরের বাথরুমটা পেরিয়ে (যেটার ভেতরে মাকড়সারা জাল পেতে অপেক্ষা করছে) পেছনের দরজা দিয়ে রান্নঘরে প্রবেশ করলাম।

মাকে দেখলাম একজন অপরিচিত মহিলার সাথে কথা বলছে। মহিলাকে দেখার সাথে সাথে আমার হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠলো। রূপক অর্থে নয়, বাস্তবেই ব্যাখার একটা ঝলক বয়ে গেলো হৃৎপিণ্ডে। তবে সেটা খুবই কম সময়ের জন্যে।

আমার বোন রান্নঘরের টেবিলে বসে সিরিয়াল খাচ্ছে।

মহিলা দেখতে বেশ সুন্দরী। তার কাঁধ অবধি সোনালী চুল, উজ্জ্বল নীল চোখ আর হালকা লিপস্টিক দেয়া চিকন ঠোঁট নজর কাড়বে সবার। তবে একটু বেশিই লম্বা তিনি।

“বাবা, ইনিই আরসালা মঙ্কটন,” মা বললো আমাকে। জবাবে কিছু বললাম না। শুধু তাকিয়ে থাকলাম মহিলার দিকে। মা হাত দিয়ে একবার ঠেলা দিলো আমাকে।

“হ্যালো,” বললাম।

“একটু লাজুক ও,” বললেন আরসালা মঙ্কটন। “একবার আমার সাথে মিল হয়ে গেলেই দেখবেন কথার ফুলঝুরি ছোটাচ্ছে”। এরপর আমার বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বদলে ফোকলা দাঁতের একটা হাসি তাকে উপহার দিল সে।

“আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে আমার,” আমার বোন বললো। “খুশি হয়ে আরসালা মঙ্কটন হতে চাই আমি,” এই কথাটা আমার আর মার উদ্দেশ্যে বললো সে।

মা এবং আরসালা দু’জনেই হাসলেন কথাটা শুনে। “তুমিও খুব ভালো,” আরসালা বললেন। “আর আপনার কি খবর? আশ্চর্য্য কি বন্ধু হতে পারি?” আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ওনার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। তার ধূসর আর গোলাপী জামাটার দিকে। ভয় লাগছে আমার।

তার জামাটা অবশ্য জীর্ণ নয়। ইদানীং সবাই যে ধরণের জামা পরে সেরকমই। কিন্তু তার দিকে তাকালেই আমার মনে হচ্ছিল যে তার জামাটা ঝাপটাচ্ছে, এই বন্ধ রান্নাঘরে। কমলা আকাশের নিচে নির্জন সাগরে একাকী ভাসতে থাকা জাহাজের পালের মত ঝাপটাচ্ছে।

জবাবে কি বলেছিলাম মনে নেই, আদৌ জবাব দিয়েছিলাম কিনা সেটাও বলতে পারবো না। ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও রান্নাঘর থেকে কিছু না খেয়েই বের হয়ে গেলাম। এমনকি একটা আপেলও নিলাম না।

বই নিয়ে বাগানে চলে আসলাম। বারান্দার নিচে যে ফুলের কেয়ারী আছে সেটার পাশে বসে আবার ডুব দিলাম প্রাচীন মিশরের পৌরাণিক কাহিনীতে। যেখানে দেবতাদের দেহ মানুষের মত হলেও মাথাটা বিভিন্ন জীবজন্তুর আদলে গড়া। একে অপরের সাথে লড়াই করে মারা যাচ্ছে তারা। আবার পুনরুত্থিত হচ্ছে নতুন জীবনে।

এসময় বাগানে বেরিয়ে এলো আমার বোন।

“তাকে খুবই পছন্দ হয়েছে আমার,” আমাকে বললো সে। “আমাদের বন্ধুত্বও হয়ে গেছে। তিনি আমাকে কি দিয়েছেন দেখবে?” এই বলে একটা ছোট্ট ধূসর পার্স বের করলো ও। মা এরকম পার্স তার হ্যান্ডব্যাগে রাখেন খুচরো পয়সা রাখার জন্যে। পার্স খুলে দু আঙুল ভেতরে ঢুকিয়ে একটা আধ ক্রাউনের পয়সা বের করে আনলো আমার বোন।

“দেখো!” বললো সে, “কি পেয়েছি আমি!”

আমারও একটা আধ ক্রাউন চাই। না, আসলে আমি চাই আধ ক্রাউন দিয়ে যা কেনা যাবে সেগুলো। পস্লামস্টিকের খেলনা, বই, যাদু দেখানোর সরঞ্জামাদি - আরো কত কিছু।

“আমার পছন্দ হয়নি তাকে,” বললাম।

“কারণ তার সাথে আমার প্রথমে পরিচয় হয়েছে,” আমার বোন বললো, “আমার বন্ধু তিনি”।

আমার মনে হয় না আরসালা মঙ্কটন কারো বন্ধু হবার যোগ্য। লেটি হেম্পস্টককে তার ব্যাপারে সাবধান করে দিতে ইচ্ছে করছে কিন্তু কি বলবো? আমাদের নতুন গৃহপরিচারিকার জামার ধূসর আর গোলাপী? আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তিনি?

লেটির হাতটা সেদিন কিছুক্ষণের জন্যে না ছাড়লেই পারতাম। আরসালা মঞ্চটনের এখানে আসার কারণ একমাত্র আমি, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেঁচোটোর মত এত সহজে তার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবো বলে মনে হয় না। তার বিছানায় ব্যাঙ ছেড়ে দিলেও লাভ হবে না।

সে মুহূর্তেই পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল আমার। এক দৌড়ে গলির শেষ মাথায় হেমপস্টকদের খামারে চলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তেমনটা করলাম না। একটা ট্যাঙ্ক এসে মা'কে ডিকসন অপটিশিয়ানসে নিয়ে গেলো। সেখানে তিনি সবাইকে লেন্স বাছাই করে দেবেন, যাতে দেখতে সমস্যা না হয় তাদের। আরসালা মঞ্চটনের সাথে বাসায় রয়ে গেলাম আমরা।

এক পেন্সট স্যান্ডউইচ নিয়ে বাগানে এলেন তিনি।

“তোমার মা'র সাথে কথা হয়েছে আমার,” মিষ্টি স্বরে বললেন আরসালা মঞ্চটন। “আমি যতদিন এখানে থাকবো বাসা থেকে বেশি বের হবে না তুমি আর তোমার বোন। বাসাতেই খেলবে যত খুশি। আর বন্ধুদের সাথে দেখা করতে হলে আমি নিয়ে যাবো। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া কোথাও বের হবে না, ঠিক আছে?”

“ঠিক আছে,” সাথে সাথে জবাব দিলো আমার বোন।

আমি কিছু বললাম না।

একটা স্যান্ডউইচ খেলো আমার বোন।

আমারও ক্ষিধা পেয়েছে ভীষণ। কিন্তু এই স্যান্ডউইচগুলো নিরাপদ কিনা বুঝতে পারছি না। চিন্তা হচ্ছে যে এটা খাওয়ার পর পেটে গিয়ে কেঁচোতে না পরিণত হয়! এরপরে কি হবে ভাবতেই ভয় লাগছে।

বাসার পেছনে চলে গেলাম আমি। রান্নাঘরের দরজাটা ঠেলে খুললাম। আরসালা মঞ্চটন নেই এখানে। পকেট ভর্তি করে ফল তুলে নিলাম। আপেল, কলা আর কমলা। এরপর আমার ল্যাবরেটরির উদ্দেশ্যে ছুট দিলাম।

আমার ল্যাবরেটরি হচ্ছে বাসার পুরনো গ্যারেজের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাড়িয়ে থাকা সবুজ চালের একটা ছাউনি। ছাউনিটার পাশে একটা ঝিরাট গাছ, কিন্তু সেটার ফল কোনদিন খাওয়া হয়নি আমাদের। শুধু দেখেছি বিশাল পাতা আর সবুজ সবুজ ফলগুলো। আমি এটাকে ল্যাবরেটরি বলি কারণ আমার রাসায়নিক গবেষণার সেটটা এখানেই রাখা থাকে। ওটা জন্মদিনের উপহার হিসাবে পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু খাওয়ার কিছুদিন পরেই বাসার ভেতরে ওটা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বাবা। কারণ

একবার টেস্টিংউবে নানারকমের রাসায়নিক মেশানোর পরে বিস্ফোরিত হয়েছিল সেটা, পুরো বাসা ভরে গিয়েছিলো অ্যামোনিয়ার ঝাঁজালো গন্ধে। তখন বাবা বলেন যে আমার গবেষণাতে বাঁধা দেবেন না তিনি (যদিও কি নিয়ে গবেষণা করছিলাম সেটা নিয়ে আমার কিংবা বাবার কারোরই কোন ধারণা ছিল না, আর আমার মাকেও ছোটবেলায় একটা রাসায়নিক গবেষণার সেট উপহার দেয়া হয়েছিল, কিন্তু সেটা কোন প্রভাব ফেলেনি তার কর্মজীবনে)। কিন্তু সেই গবেষণা বাসার ভেতরে বা আশেপাশে করা যাবে না। এমন দূরত্বে গিয়ে করতে হবে যেখান থেকে বাসায় কোন প্রকার গন্ধ যাবে না।

একটা কলা আর আপেল খেয়ে বাকি ফলগুলো লুকিয়ে রাখলাম কাঠের টেবিলটার তলায়।

বড়দের কাজ হচ্ছে অনুসরণ করা, আর ছোটদের কাজ অভিযানে বের হওয়া। বড়রা একই রাস্তা দিয়ে হাজার বার একই ভাবে হেঁটে আসবে। কিন্তু কখনো তাদের মাথায় এটা আসবে না যে রাস্তার বাইরে দিয়েও যাওয়া যায়। রোডেনড্রন ঝোপগুলোর মধ্যে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে, বেড়ার ফাঁক গলে। তখন ছোট ছিলাম আমি। কিভাবে ড্রাইভওয়ে এড়িয়ে অন্য ভাবে গলিতে যাওয়া যায় তার এক ডজন পথ জানা ছিল আমার।

ঠিক করলাম যে ছাউনি থেকে লুকিয়ে বের হয়ে দেয়াল ধরে লনে পৌঁছে যাবো। সেখান থেকে অ্যাজালিয়া আর বে লরেলের ঝোপের কাছে চলে যাবো হামাগুড়ি দিয়ে। লরেল গাছগুলোর ওখান থেকে টিলা বেয়ে একটু নিচে নামলেই গলির বেড়া।

কারো নজর নেই এখন আমার দিকে। দৌড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে লরেল গাছগুলোর কাছে পৌঁছে গেলাম, সেখান থেকে টিলা বেয়ে নিচে নামতে লাগলাম ঝোপঝাড় পা দিয়ে সরাতে সরাতে। শেষবার যখন এখানে দিয়ে নিচে নেমেছিলাম এত ঝোপঝাড় চোখে পড়ে নি।

টিলার নিচে আরসালা মঙ্কটন অপেক্ষা করছিলো আমার জন্যে। মরিচা ধরা বেড়াটার ঠিক সামনে। আমার চোখ ফাঁকি দিয়ে কিভাবে এখানে আসলেন তিনি বুঝতে পারলাম না। হাত বুকের ওপর ঝাঁক করে আমার দিকে তাকালেন, তার ধূসর গোলাপী জামাটা উড়ছে বাতাসের তোড়ে।

“তোমাকে তো বলেছিলাম আমাকে না বলে বাসা থেকে না বের হতে”।

“কোথাও যাচ্ছি না আমি,” একটু রুদ্ধ স্বরে বললাম, যদিও জানি যে কোন কাজ হবেনা ওতে। “এখনও বাসার সীমানার মধ্যেই আছি। একটু ঘুরে ফিরে দেখছিলাম আশপাশটা”।

“পালাচ্ছিলে তুমি,” বললেন তিনি।

জবাব দিলাম না আমি।

“তোমার এখন বেডরুমে থাকা উচিত, যেখানে নজর রাখতে পারবো আমি। ঘুমোনের সময় হয়ে গেছে”।

দিনের এই সময়ে ঘুমোনের বয়স অনেক আগেই পার করে এসেছি আমি। কিন্তু মুখে মুখে তর্ক করার বয়স এখনও হয়নি।

“ঠিক আছে,” বললাম।

“‘ঠিক আছে’ না। বলো ‘আচ্ছা মিস মঙ্কটন’ কিংবা ‘আচ্ছা ম্যাম’ ” আমার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। নীল চোখজোড়া দেখে আবার ঐ অদ্ভুত বস্তুটার চোখের কথা মনে পড়ে গেলো। শুধু অন্ধকার সেখানে।

“আচ্ছা ম্যাম,” বললাম অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

একসাথে টিলা বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম আমরা।

“তোমার বাবা মা’র সামর্থ্য নেই খুব বেশিদিন এই বাড়িটা ধরে রাখার,” বললেন আরসালা মঙ্কটন। “খুব তাড়াতাড়িই তারা বুঝতে পারবে যে অর্থনৈতিক সমস্যা মেটাতে হলে বিক্রি করে দিতে হবে বাড়িটা, ডেভেলপারদের কাছে। তখন এখানে গড়ে উঠবে অনেকগুলো ছোট ছোট বাসা। ভাগ্য ভালো হলে ওগুলোর একটায় থাকতে পারবে তোমরা। আর খারাপ হলে বাইরে থেকে শুধু দেখবে ওখানে যারা থাকবে তাদেরকে। সেটা কি ভালো হবে?”

বাড়িটা খুব পছন্দ আমার। বিশেষ করে এটা বাগানটা। ওটার এলোমেলো পরিবেশ ভালো লাগে ভীষণ। আমার নিজের সস্তারই একটা অংশ হয়ে উঠেছে সেটা।

“আপনি কে?” জিজ্ঞেস করলাম।

“আরসালা মঙ্কটন। তোমাদের গৃহপরিচারিকা”।

“আপনার আসল পরিচয় কি? সবাইকে টাকা দিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন আপনি?”

“কারণ সবার টাকা দরকার,” একদম স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাটা বললেন তিনি। “এটাই খুশি রাখে তাদের। তুমি যদি চাও তাহলে তোমাকেও খুশি রাখবে টাকা পয়সা”। বাগানের সবুজ ঘাসের ওপর চলে আসলাম আমরা।

“এখন তোমার ঘরে যাও,” নির্দেশ দিলেন তিনি।

দৌড়ে তার কাছ থেকে দূরে সরে আসলাম আমরা, যতটা দ্রুত পারা যায়। বাগান, লন আর কয়লা রাখার ছাউনি পেরিয়ে টুঁকে গেলাম বাড়ির ভেতর। আরসালা মঞ্চটন ভেতরে অপেক্ষা করছিল আমাদের স্বাগত জানানোর জন্যে। আমার চোখ এড়িয়ে কোনভাবেই এত তাড়াতাড়ি এখানে পৌঁছানোর কথা নয় তার। একদম স্বাভাবিক লাগছে তাকে। চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো, নতুন করে আবার লিপস্টিক দিয়েছেন।

“তোমার ভেতরে ছিলাম আমি,” বললেন তিনি। “তাই আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি। কাউকে যদি এ ব্যাপারে কিছু বলো তুমি, তাহলে কেউই বিশ্বাস করবে না। আর যেহেতু তোমার ভেতরে ছিলাম আমি, তাই কিছুই অজানা থাকবে না আমার। দরকার হলে এমন ব্যবস্থা নিতে পারি যে আর কখনোই কাউকে কিছু বলতে পারবে না তুমি”।

সিঁড়ি বেয়ে আমার বেডরুমে গিয়ে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লাম। গোড়ালির কাছটাতে যেখানে কেঁচোটা ঢুকেছিল, সেখানে ব্যাথা করছে। বুকেও ব্যাথা হচ্ছে সেই সাথে। বইয়ের আশ্রয় নিলাম এই সময়। আমার মা’র পুরনো কতগুলো বই নিয়ে আসলাম তাক থেকে। ১৯৩০-৪০ দশকের স্কুল ছাত্রীদের অভিযান সম্পর্কে পড়তে লাগলাম। বেশিরভাগ গল্পেই চোরাচালানী আর চোর ধরার কাজে ব্যস্ত তারা। যে কোন পরিস্থিতি দলবেঁধে সাহসের সাথে মোকাবেলা করে। কিন্তু আমি সাহসী নই আর জানি না এই মুহূর্তে কি করতে হবে।

কখনও নিজেকে এতটা একা মনে হয়নি আগে।

ভাবতে লাগলাম যে হেম্পস্টকদের কোন ফোন আছে কিনা। সম্ভাবনা কম, কিন্তু একেবারে অসম্ভবও নয়। মিসেস হেম্পস্টকই হয়তো ফোন করে পুলিশ স্টেশনে মিনিভ্যানটার কথা জানিয়েছিলেন। ফোনবুকটা নিচতলায় রাখা, কিন্তু ইচ্ছে করলে গ্রাহক সেবার নম্বরে ফোন করে হেম্পস্টকদের নম্বর জানার চেষ্টা করতে পারি আমি। আমার বাবা মা’র রুমে একটা ফোন আছে।

বিছানা থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম। ওপরতলার হলওয়াতে কেউ নেই। যত দ্রুত সম্ভব, কোন শব্দ না করে আমার ঘরের উল্টোদিকে বাবা মা’র ঘরে চলে আসলাম। এই ঘরটাই দেয়াল গোলাপী। বিছানায় প্রিন্টের একটা চাদর বিছানো। একটা বালিশ আছে, বাগান দেখা যায় ওটা দিয়ে। বিছানার পাশে ছোট একটা টেবিলের ওপরে ফোনটা

রাখা। রিসিভার উঠিয়ে কানে দিয়ে গ্রাহক সেবার নম্বরে ডায়াল করলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন ওপাশ থেকে কেউ ধরবে আর তাকে হেম্পস্টকদের নম্বর জিজ্ঞেস করবো আমি। একটা পেন্সিল হাতে নিয়ে রেখেছি নম্বরটা টুকে রাখার জন্যে। কিন্তু কেবল ডায়াল টোনই ভেসে আসলো ওপাশ থেকে।

এসময় আরসালাহেম্পস্টকের গলার স্বর ভেসে এলো ফোনে, “ভদ্র ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই চুরি করে কোথাও ফোন করার চেষ্টা করে না, তাই না?”

কিছুই বললাম না জবাবে, যদিও আমি নিশ্চিত যে আমার নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সে। চুপচাপ রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আমার আর আমার বোনের বেডরুমটাতে চলে আসলাম।

বিছানায় বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকলাম বাইরে।

আমার বিছানাটা জানালার নিচে দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা। জানালা খুলে ঘুমোতে ভালো লাগে আমার। বিশেষ করে বর্ষাকালে। চোখ বন্ধ করে বৃষ্টির শব্দ উপভোগ করি আমি, মুখে এসে ঝাপটা দেয় ভেজা বাতাস। কল্পনায় তখন সাগরে নৌকায় চড়ে ভেসে বেড়াই। অবশ্য নিজেকে জলদস্যু বেশে চিন্তা করি না, শুধু ভেসে বেড়াই উদ্দেশ্যহীন ভাবে।

কিন্তু এখন বৃষ্টি পড়ছে না, আর এখন রাত নয়, দিন। জানালা দিয়ে শুধু বাইরে গাছপালা আর মেঘ চোখে পড়ছে।

জন্মদিনে যে ব্যাটম্যানটা পেয়েছিলাম ওটার নিচে জরুরী পরিস্থিতির জন্যে কিছু চকলেট রাখা থাকে সবসময়। সেগুলো খাওয়ার সময় ভাবতে লাগলাম সেদিন লেটি হেম্পস্টকের হাত ছেড়ে দেয়ার মুহূর্তটার কথা। ওই বলের মত জিনিসটা ধরার সাথে সাথে পায়ে পিনের খোঁচার মত ব্যাথা অনুভব করি কিছুক্ষণের জন্যে।

আমার দোষেই এখানে এসেছে সে - ভাবলাম। কথাটা শতভাগ সত্য। আরসালা মঙ্কটন বলে আসলে কেউ নেই। সেদিন কমলা আকাশের নিচে বাতাসে ক্যানভাস ঝাপটানো যে সত্ত্বাটাকে দেখেছিলাম আমরা সেটারই একটা প্রতিবিম্ব মাত্র। আমার পায়ের গর্তে লুকিয়ে থেকে এখানে এসেছে সে।

আবার বই পড়ায় ফিরে গেলাম। প্যানসি নামে ছোট এক মেয়ের অভিযানের কাহিনী পড়ছি। ভালো লাগছে। সবার পছন্দের মেয়ে প্যানসি, প্রচণ্ড বুদ্ধিমান। স্কুলের সবাই এক নামে চেনে। ডিটারের ছদ্মবেশে স্কুলে আসা

এক গুণ্ডাচরকে ধরিয়ে দেয় সে। প্যানসির কাহিনী পড়তে ভালো লাগলেও মনের মধ্যে সর্বক্ষণ একটা ভয় কাজ করছে আমার, এমনটা আগে কখনও হয়নি। বাবা মা'র বাসায় আসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তাদের সবকিছু খুলে বলবো আমি। আমার কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন তারা।

তখন বাবা এখান থেকে এক ঘন্টার দূরত্বের একটা অফিসে চাকরি করতো। কি চাকরি করতো সেটার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম না আমি। একজন সেক্রেটারি ছিল তার। একটা খুব সুন্দর পুডল জাতের কুকুর ছিল সেই সেক্রেটারি আন্টির। আমরা অফিসে যাবো এটা আগে থেকে জানলে কুকুরটা বাসা থেকে নিয়ে আসতেন তিনি। সেটার সাথে খেলতাম আমি আর আমার বোন। মাঝে মাঝে গাড়ি চালিয়ে কোন বিল্ডিংয়ের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বাবা বলতো, “ওটা আমাদের কাজ”। কিন্তু বিল্ডিংয়ের ব্যাপারে কোন আগ্রহ ছিল না আমার, তাই জিজ্ঞেস করতাম না যে ‘আমাদের’ বলতে কি বোঝাচ্ছেন তিনি।

বিছানায় শুয়ে একের পর এক বই পড়ে যাচ্ছি। দরজায় আরসালা মঙ্কটন উপস্থিত হলেন একসময়, “নিচে আসতে পারো এখন,” বললেন।

নিচতলায় টেলিভিশন রুমে বসে মনোযোগ দিয়ে টেলিভিশন দেখছে আমার বোন। সেখানে ‘কিভাবে?’ নামে একটা অনুষ্ঠান দেখাচ্ছে। অনুষ্ঠানটায় দেখানো হয় কিভাবে দৈনন্দিন জীবনের নানা রকম জিনিস কাজ করে।

আমি বিবিসি দেখতে চাইলে বিজয়ীর ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালো আমার বোন, বললো, “শুধু আমি যা দেখতে চাই সেটাই চলবে টেলিভিশনে, আরসালা মঙ্কটন অনুমতি দিয়েছেন”।

ওর সাথে এক মিনিট বসে থাকলাম আমি, একজন গোফওয়ালা বুড়ো লোক দেখাচ্ছে কিভাবে ছোট ছিপের সাথে টোপ বাধতে হয়।

“তার স্বভাব ভালো নয়,” বললাম।

“তাকে অনেক পছন্দ আমার। তিনি অনেক ভালো,” আগের মত একঘেয়ে স্বরে বললো আমার বোন।

পাঁচ মিনিট পর মা ফিরে আসলো কাজ থেকে। করিডর থেকে আমাদের একবার হ্যালো বলে রান্নাঘরে আরসালা মঙ্কটনের সাথে কথা বলতে চলে গেলো সে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো, “আমাদের বাবা ফেরার আগেই রাতের খাবার তৈরি হয়ে যাবে। হাত ধুয়ে ফেলো”।

আমার বোন ওপরতলায় হাত ধুতে চলে গেলো।

“আরসালা মঙ্কটনকে পছন্দ হয়নি আমার। তাকে চলে যেতে বলো,” মা’র উদ্দেশ্যে বললাম আমি।

“এবার আর গেরট্টুডার মত কোন কাহিনী করা চলবে না, বাবা,” দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো মা। “আরসালাখুব ভালো পরিবারের মেয়ে। তোমাদের দু’জনকে ভীষণ পছন্দ হয়েছে ওর”।

বাবা আসার পর রাতের খাবার দেয়া হলো। সবজির গাঢ় স্যুপ, মুরগীর রোস্ট আর মটরশুটি। সবগুলো খাবারই আমার পছন্দের, কিন্তু কিছু খেলাম না।

“ক্ষিধে নেই আমার,” বললাম।

“কে যেন রুমে বসে চকলেট খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেলেছে,” আরসালা মঙ্কটন বললেন। “তার হাতে আর মুখে চকলেট লেগে থাকতে দেখেছিলাম আমি”।

“এই ফালতু জিনিসগুলো না খেলেই পারো,” বললো বাবা।

“তোমার দাঁত আর ক্ষুধা নষ্ট করে দেবে ওগুলো,” মা গজগজ করে উঠলো। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে হয়তো আমাকে জোর করে খাওয়াবে তারা। কিন্তু সেরকমটা ঘটলো না। ক্ষুধা পেটে সেখানে বসে থাকলাম আমি। আরসালা মঙ্কটন হাসছেন আমার বাবার প্রতিটা কৌতুকে। আমার মনে হতে লাগলো যে তিনি আরসালায় জন্যেই হাসির কৌতুকগুলো বলছেন।

খাবার পর আমরা সবাই মিশন ইম্পসিবল দেখলাম। মিশন ইম্পসিবল সাধারণত ভালো লাগে আমার। কিন্তু এবার একটু অস্বস্তি লাগছে। কারণ ওখানে রাবারের মুখোশ পরে অভিনয় করেছে অনেকে। আমার মাথায় ঘুরতে লাগলো যে আরসালা মঙ্কটনের মুখোশের নিচে কি আছে।

ঘুমোনের সময় হয়ে গেলো। আজকে আমার বোনের ইচ্ছেয় হবে ঘরের সবকিছু। তাই বেডরুমের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। শুয়ে শুয়ে হলওয়ার আলোর কথা ভাবতে লাগলাম। আর শুনতে লাগলাম সারাদিন পরে এই পুরনো বাড়িটায় যেসব আওয়াজ হয়, সেগুলো। আরসালা মঙ্কটনকে যদি তাড়িয়ে দিতো মা বাবা, তাহলে ভালো হতো। তখন যদি হেম্পস্টক খামারে গিয়ে লেটিকে সবকিছু খুলে বলতাম আমি। তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো।

ঘুম আসছে না আমার। আমার বোন ঘুমিয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে। যেকোন অবস্থায়, যেকোন সময়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারে ও। এই গুণটার জন্যে ওকে হিংসে হয় আমার।

ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে আসলাম।

সিঁড়ির ওপরতলায় হাঁটাহাঁটি করলাম কিছুক্ষণ। নিচ থেকে টেলিভিশনের আওয়াজ ভেসে আসছে। খালি পায়ে সিঁড়ির নিচের অংশে চলে আসলাম সাবধানে। সেখানে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আরেকটু নিচে নামলেই যে টেলিভিশন দেখছে সে দেখে ফেলবে আমাকে।

টেলিভিশন থেকে হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। কিছুক্ষণ পর বড়দের কথা বলার আওয়াজ শুনলাম।

আরসালা মঞ্চটন বলছে, “আপনার স্ত্রী কি প্রতি সন্ধ্যাতেই বাইরে যায়?”

“না, শুধু আজকেই বেরিয়েছে, কালকের জন্যে গোছগাছ করতে। কিন্তু কালকে থেকে প্রতি সপ্তাহে বাইরে যাবে ও। আফ্রিকার প্রত্যন্ত গ্রামের জন্যে টাকা তুলছে। সেখানে কুয়া খনন করবে তারা। আর গর্ভনিরোধক পদ্ধতি সম্পর্কে সবাইকে জানানোর চেষ্টা করবে,” বাবার গলার আওয়াজ ভেসে আসল।

“এটা সম্পর্কে অবশ্য সব জানি আমি,” ইঙ্গিতপূর্ণভাবে হেসে বললেন আরসালা মঞ্চটন। হাসিটা মেকি বলে মনে হলো না।

পরমুহূর্তেই টেলিভিশন রুমের দরজা খুলে গেলো পুরোপুরিভাবে। সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে আছে আরসালা মঞ্চটন। আবার মুখে মেক-আপ দিয়েছে সে, লিপস্টিকও লাগিয়েছে ঠোঁটে।

“ঘরে যাও,” বললেন তিনি, “এখনই”।

“বাবার সাথে কথা বলতে চাই আমি,” বললাম আমি, জানি লাভ হবে না। জবাবে কিছু না বলে শুধু একবার হাসলেন তিনি। কোন অনুভূতি নেই সেই হাসিতে। হতাশ মনোরথে ঘরে ফিরে আসলাম আমি। অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে থাকলাম। আজ আর ঘুম আসবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এক সময় ঠিকই ঘুমে লেগে এলো চোখ, আর ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখলাম আমি।

অধ্যায় ৭

এর পরের দিনটা আরো খারাপ গেলো আমার।

ঘুম থেকে উঠে দেখি বাবা মা দু'জনই বের হয়ে গেছে কাজের জন্যে।

আজ আর আগের দিনের উষ্ণতা নেই পরিবেশে। আকাশটা গোমড়া হয়ে আছে। সেখানে ধূসর মেঘের আনাগোনা। বাবা মা'র ঘরের ঝুল বারান্দায় চলে আসলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করলাম যাতে আজকে আরসালা মঙ্কটনের চেহারা না দেখতে হয় আমাকে। এখান থেকে চলে গেছেন তিনি।

সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে দেখলাম সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে আরসালা মঙ্কটন।

“আজকেও কালকের মতনই একই নিয়ম, ডার্লিং,” বললেন তিনি। “বাসার সীমানার বাইরে যেতে পারবে না। আর যদি লুকিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো তাহলে ঘরে বন্দি করে রাখবো তোমাকে বাকি দিনের জন্যে, তোমার বাবা মা ফিরে আসলে বিচার দেবো যে খুব খারাপ একটা কাজ করেছে তুমি”।

“আপনার কথা বিশ্বাস করবে না তারা”।

মিষ্টি করে হাসলেন তিনি। “সে ব্যাপারে নিশ্চিত তুমি? আমি যদি বলি তুমি রান্নাঘরে তোমার রাসায়নিক গবেষণার সেটটা নিয়ে এসে নোংরা করেছে আর সেটাকে পরিষ্কার করতে হয়েছে আমার, খুব বেশি অবিশ্বাস্য শোনাবে সেটা? আমি এমন ভাবে বলবো যাতে বিশ্বাস করতে বাধ্য হন তারা”।

বাসা থেকে বের হয়ে আমার ল্যাবরেটরিতে চলে আসলাম। গতদিনের লুকিয়ে রাখা ফলগুলো খেলাম। ‘সবজান্তা স্যান্ডি’ নামে আরেকটা বই পড়লাম। এইটার কাহিনীও গত বইটার মতনই। স্যান্ডি একজন মেধাবী ছাত্রী, কিন্তু তাকে ভুল করে পাঠিয়ে দেয়া হয় উচ্চবিভূদের একটা স্কুলে। সেখানে সবাই জ্বালাতন করে তাকে, খোঁটা দেয় তার বেশভূষা নিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক রাশিয়ান গুপ্তচরকে ধরিয়ে দেয় সে। ভূগোল পড়ানোর নাম করে সেই স্কুলে কাজ নিয়েছিলো লোকটা। আর এই রহস্য উন্মোচিত হয় একদম শেষ দিকে। একদিন অ্যাসেম্বলিতে সে উপস্থিত হলে বলে “আমি জানি আমাকে ভুল করে পাঠানো হয়েছে এখানে। সবাই আমার নাম নিয়ে মজা করে। কিন্তু স্টেট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ আমাকে পাঠানোর জন্যে। নাহলে মিস স্ট্রিংব্লিং এর আসল পরিচয় জানা সম্ভব হতো না”।

শেষ পর্যন্ত স্কুলের সবার গর্বের পাড়ী হয়ে ওঠে সে।

আজ বাবা কাজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। গত কয়েকবছরে কখনোই তাকে এই সময়ে বাসাতে দেখিনি আমি।

তার সাথে কথা বলতে চাই আমি, কিন্তু তাকে একা পেলাম না।

আমার বিচ গাছের ডালে বসে তাদের ওপর নজর রাখতে লাগলাম।

প্রথমে আরসালা মঙ্কটনকে বাগান ঘুরিয়ে দেখালো সে। গোলাপ, চেরি এই গাছগুলো এমন ভঙ্গিতে দেখাতে লাগলো যেন ওগুলো সে নিজের হাতে লাগিয়েছে, মিস্টার উইলোরি নয়। গত পঞ্চাশ বছর ধরে গাছগুলোর দেখাশোনাও করে আসছেন বুড়ো মানুষটা।

আর আরসালা তার সব কথা শুনে হাসছেন। বাবা ঠিক কি বলছে তাকে সেটা শুনতে পারছি না, কিন্তু তার মুখেও হাসি দেখতে পাচ্ছি। কৌতুক বলার সময় এভাবে হাসেন তিনি।

বাবার একটু বেশি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে আরসালা মঙ্কটন। মাঝে মাঝে তার কাঁধে হাতও রাখছে বাবা, অবশ্য সেটা বন্ধুর মত। তাকে আরসালার এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চিন্তা হতে লাগলো আমার। সে জানে না আরসালার আসল পরিচয়। মানুষবেশী একটা দানব তিনি। আজ তার পরনে ধূসর রঙের পেন্সিল স্কার্ট আর গোলাপী ব্লাউজ।

অন্য কোনদিন যদি বাবাকে বাগানে হাঁটতে দেখতাম তাহলে ছুটে যেতাম আমি। কিন্তু আজকে না। আমার ভয় সে রেগে যাবে। হয়তো আরসালা মঙ্কটন এমন কিছু বলবে তাকে, যেটার কারণে আমার ওপর রাগ উঠবে তার।

বাবা রাগ করলে খুব ভয় লাগে আমার। তার চেহারা পুরো লাল হয়ে যায় তখন, আর এত জোরে চিৎকার করে সে যে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে আমার। সেই মুহূর্তে কিছু চিন্তাও করতে পারি না আমি।

(ছোট থাকতে আমার গায়ে কখনো হাত তোলেননি বাবা। মেরে কখনো কিছু আদায় করা যায় না এটাই ছিল তার মূলমন্ত্র। আমি বড় হবার পর একবার তিনি বলেছিলেন যে তার বাবা প্রায়ই মারতেন তাকে, তার মা ঝাড়ু হাতে তাড়া করে বেড়াতেন পুরো বাড়ি। তাই রেগে গেলে আমাদের উদ্দেশ্যে কেবল ওরকম বিকটভাবে চিৎকার করতেন তিনি, মারতেন না)।

আরসালা মঙ্কটনের সান্নিধ্যে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইছি না। নইলে বাবাকে আমার বিরুদ্ধে ফুঁসলিয়ে দেবেন তিনি। ভাবলাম যে এখন লুকিয়ে বাসার সীমানার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করবো কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই বাদ দিয়ে

দিলাম চিন্তাটা। দেখা যাবে এবার বাবাকে নিয়ে আমার জন্যে বেড়ার ধারে হাসিমুখে অপেক্ষা করছেন আরসালা মঙ্কটন।

তাই বিশাল ডালটায় বসে তাদের ওপর নজর রাখতে লাগলাম আমি। তারা যখন অ্যাজালিয়া ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো, গাছ থেকে দড়ির মই বেয়ে নেমে বাসার বারান্দায় চলে আসলাম। সেখান থেকে তাদের দেখতে লাগলাম। আজকের দিনটা ধূসর, কিন্তু সোনালী রঙের ড্যাফোডিল ফুটে আছে চারপাশে। আমার বাবা একটা নারসিসি ফুল ছিড়ে আরসালা মঙ্কটনের হাতে দিলো। কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে সেটা নিলেন তিনি। বাবাও হাসছে সমানে।

তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে আমার, একজন দানবীকে ফুল ছিড়ে দিচ্ছে সে। কিন্তু সেটা করলাম না। শুধু বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের কর্মকাণ্ড দেখতে লাগলাম, একবারের জন্যেও আমার দিকে তাকালো না তারা।

আমার গ্রিক পুরাণের বইয়ে লেখা যে নারসিসি ফুলের নাম এসেছে নারসিসাস নামের এক সুদর্শন যুবকের নাম থেকে। নিজের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলো সেই যুবক। একবার এক জলাধারে নিজের প্রতিবিম্ব দেখার পর সেখান থেকে আর নড়েনি সে। সেখানেই মৃত্যু হয়েছিল তার। মৃত্যুর পর তাকে ফুলে পরিণত করেন দেবতারা। যখন নারসিসাসের গল্পটা পড়েছিলাম, মনে মনে ভেবেছিলাম যে নারসিসি হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ফুল। কিন্তু পরে এটা জেনে হতাশ হতে হয় যে নারসিসি হচ্ছে ড্যাফোডিল ফুলের একটা ধরণ মাত্র। সাদা রঙের হয় সেটা।

আমার বোন বের হয়ে তাদের কাছে হেঁটে গেলো। তাকে কোলে তুলে নিলো বাবা। এরপর তিনজন একসাথে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আমার বোন বাবার কোলে আর আরসালা মঙ্কটনের হাত ভর্তি সাদা আর হলুদ ফুল। তাদের দেখতে লাগলাম আমি। দেখলাম যে বাবা তার বাম হাত পেঁচিয়ে রেখেছেন আরসালা মঙ্কটনের কোমরে।

(ঘটনাটা যদি বর্তমানে ঘটতো তাহলে নিশ্চয়ই অন্যরকম প্রতিক্রিয়া দেখাতাম আমি। কিন্তু সাত বছর বয়সে ওটাতে কিছু মনে করিনি আমি)।

আমার ঘরে এসে বিছানায় উঠে পড়লাম। জানালার পাশে বসে পড়তে শুরু করলাম আরেকটা বই। এটাও মা'র ছোটবেলার বই। এখানে একটা মেয়ের কাহিনী লেখা যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি বাহিনীর আদেশের বিরুদ্ধে চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জে রয়ে গিয়েছিল শুধুমাত্র তার ছোট্টা জন্যে।

পড়ার সময় মনে হতে লাগলো যে আরসালা মঙ্কটন কোনভাবেই আমাকে চিরকালের জন্যে বন্দি করে রাখতে পারবে না। কয়েকদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই বাবা মা'র সাথে শহরে কিংবা অন্য কোথাও যেতে হবে আমাকে। তখন সেখান থেকে হেম্পস্টক খামারে চলে যাবো আমি, লোটি হেম্পস্টককে সব খুলে বলবো।

কিন্তু আরসালা মঙ্কটনের কার্যসিদ্ধির জন্যে যদি কেবল কয়েকদিনেরই দরকার হয়? গলা শুকিয়ে আসলো আমার।

সন্ধ্যায় রাতের খাবারের জন্যে মিটলোফ বানালো আরসালা মঙ্কটন, কিন্তু সেটা খেলাম না আমি। তার বানানো কোন কিছু মুখে দেবো না এই পণ করেছি। বাবা রাগ করলো সেটা দেখে।

“ক্ষিধে নেই আমার,” তার উদ্দেশ্যে বললাম। “নাহলে অবশ্যই খেতাম”।
বুধবার হওয়াতে মা আফ্রিকার মানুষদের জন্যে টাকা তোলার মিটিংয়ে গেছে। কিছু পোস্টার বানিয়ে সেটা দেয়ালে দেয়ালে সাঁটা হয়েছে। সেখানে কুয়োর ছবি, তার পাশে হাসছে কিছু আফ্রিকান লোকজন। খাবার টেবিলে আমি, বাবা, আরসালা মঙ্কটন আর আমার বোন।

“এটা খেতে খুব ভালো হয়েছে,” বাবা বললো। “আর এই বাসায় খাবার নষ্ট করি না আমরা”।

“বললাম তো ক্ষিধে নেই”।

মিথ্যে বললাম, আসলে ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছিলো।

“তাহলে অল্প একটু খাও,” বললো বাবা। “এটা তো তোমার পছন্দের খাবার”।

রান্নাঘরে বাচ্চাদের জন্যে একটা আলাদা খাবার টেবিল আছে। বাসায় মেহমান আসলে বা দেরি করে খেলে সেখানে বসে খাই আমরা। কিন্তু আজকে বড়দের টেবিলেই বসে আছি আমরা। আমার কাছে ছোট টেবিলটাই ভালো লাগেনা। সেখানে আমার খাওয়ার দিকে নজর দেয় না কেউ। নিজেকে অদৃশ্য মনে হয়।

আরসালা মঙ্কটন বাবার পাশে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, তার মুখের কোণে খেলা করছে ক্রুর হাসি।

আমি জানি যে কিছু বলা উচিত হবে না, কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারলাম না। বাবাকে বলতেই হবে যে কেন খেতে চাই না আমি।

“ওনার রান্না করা কিছু খাবো না আমি,” বললাম তাকে। “ওনাকে একদমই পছন্দ নয় আমার”।

“খাবে তুমি,” বললো বাবা, “একবার মুখে দিয়ে তো দেখো। আর ক্ষমা চাও মিস মঙ্কটনের কাছে”।

“না”।

“ওসবের দরকার নেই, থাক,” মেকি সহানুভূতির স্বরে বললেন আরসালা মঙ্কটন। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে একটা বাঁকা হাসি দিলেন। আমি বাদে টেবিলের অন্য কারো চোখে পড়লো না সেই হাসি।

“আছে, দরকার আছে,” বললো বাবা। আগের বারের চেয়ে একটু জোরে, চেহারাও লাল হতে শুরু করেছে। “এভাবে তোমার সাথে কথা বলতে পারে না ও,” আরসালা মঙ্কটনের উদ্দেশ্যে বললো সে। “আমাকে একটা কারণ বলো, কেন আরসালার রান্না করা সুস্বাদু খাবারটা মুখে দেবে না তুমি”।

আমি ভালো মিথ্যে বলতে পারি না। তাই সত্য কথাই বললাম।

“কারণ তিনি মানুষ নন,” বললাম। “তিনি একটা দানবী। তিনি...” নানীমা হেম্পস্টক যেন কি বলে এসব জিনিসকে? “তিনি একটা উটকো ঝামেলা”। বাবার চেহারা টকটকে লাল হয়ে গেছে এখন। “বাইরে হলওয়াতে আসো এখনই,” গম্ভীর স্বরে বললো সে।

ভেতরে ভেতরে গুমরে উঠলাম। চেয়ার থেকে নেমে তার পিছু পিছু গেলাম করিডরে। হলওয়াে অন্ধকার হয়ে আছে এখন, একমাত্র রান্নাঘর থেকে কিছুটা আলো ভেসে আসছে এখানে। “রান্নাঘরে ফেরত যাবে তুমি। মিস মঙ্কটনের কাছে ক্ষমা চাইবে। এরপর চুপচাপ পেন্সটের খাবার পুরোটুকু শেষ করে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে”।

“না,” বললাম, “এসবের কিছুই করবো না আমি”।

এক দৌড়ে হলওয়াে থেকে সিঁড়ির ওপরের বাথরুমটায় চলে আসলাম। গোটা বাসার একমাত্র এখানেই ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে বসে থাকতে পারবো। বাবা আমার চাইতে অনেক জোরে দৌড়ায়, ইচ্ছে করলে আমাকে সহজেই ধরে ফেলতে পারতো, কিন্তু তেমনটা হলো না। আমাকে ধাক্কা দেওয়া করলো না সে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ঠিকই তার খাবার আওয়াজ শুনলাম দরজায়।

“দরজা খোল”।

কিছু বললাম না আমি। কমোডের ঢাকনা নামিয়ে সেটায় ওপরে বসিয়ে আছি আমি। আরসালাকে যে পরিমাণ ঘৃণা করি, এই মুহূর্তে বাবাকেও ঠিক সেই পরিমাণ ঘৃণা করি আমি।

আবার দরজায় সজোরে থাবা দিলেন বাবা, “তুমি যদি দরজা না খোল,” ইচ্ছে করে জোরে কথা বলছে যাতে পরিষ্কার শুনতে পারি আমি। “দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকবো আমি”।

সেটা কি আসলেও করবে সে? জানি না আমি। ছিটকানি দিয়ে আটকানো দরজাটা। আর আটকানো দরজা পেরিয়ে সাধারণত ভেতরে আসতে পারে না কেউ। বন্ধ দরজা মানে ভেতরে কেউ আছে। যদি সে চাইতোই যে ভেতরে কেউ ঢুকুক তাহলে তো দরজা খোলাই রাখবে। এটা বুঝতে পারছে না বাবা?

প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেলো দরজা। ছিটকানিটা ঝুলতে লাগলো চৌকাঠের সাথে, ভেঙে বাঁকা হয়ে গেছে ওটা। বাবা দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। তার চেহারা য় এরকম রাগ আগে কখনো দেখিনি আমি।

“বেশ”।

এটুকুই বললো সে। এরপর শব্দ করে ধরলো আমার বাম হাত, সেটা ছাড়িয়ে নেয়ার সাধ্য নেই আমার। এখন কি করবে বাবা ভাবতে লাগলাম। অবশেষে আমার গায়ে হাত তুলবে নাকি ঘরে পাঠিয়ে দেবে। নাকি এত জোরে চিৎকার করবে যে সেটা শোনার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো মনে হবে আমার?

কিন্তু সেগুলোর কিছুই করলো না সে।

আমাকে বাথটাবের কাছে নিয়ে গেলো। এরপর রাবার পম্পা দিয়ে সেটার পানি বের হয়ে যাবার পথটা বন্ধ করে দিলো ঝুঁকে। কল ছেড়ে দিলে ঠাণ্ডা পানি বের হতে লাগলো। ধীরে ধীরে ভরে উঠতে লাগলো বাথটাবটা।

খোলার দরজার দিকে তাকালো বাবা এ সময়। “ব্যাপারটা সামলে নেবো আমি,” আরসালা মঙ্কটনের উদ্দেশ্যে বললো।

আমার বোনের হাত ধরে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তার চেহারা দেখে উদ্ভিগ্ন মনে হলেও চোখে বিজয়ের ছাপ স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

“দরজাটা চাপিয়ে দিয়ে যাও,” বললো বাবা। আমার বোন ফুঁপিয়ে উঠলো এসময়। বাবার নির্দেশ পালন করে দরজা চাপিয়ে দিলো আরসালা মঙ্কটন। কিন্তু পুরোপুরি চাপানো গেলো না, কারণ দরজার একটা কান্ডো ভেঙে বেরিয়ে এসে।

এখন বাথরুমে শুধু আমি আর বাবা। তার চেহারা লাল থেকে ফ্যাকাসে সাদা রঙ ধারণ করেছে। সে কি করবে তা বুঝতে পারছিলাম না আমি, কেন বাথটাব পানি ভর্তি করেছে তাও জানি না। কিন্তু খুব ভয় হচ্ছে আমার।

“ক্ষমা চাইবো আমি,” তাকে বললাম। “বলবো যে আমি দুঃখিত। রেগে গিয়ে উল্টাপাল্টা বলেছিলাম তখন। তাকে ভুল...”

কিন্তু জবাবে কিছু বললো না সে। বাথটাব ভর্তি হয়ে গেছে ঠাণ্ডা পানিতে। কল বন্ধ করে দিলো বাবা। এরপর হঠাৎ করে আমাকে মাটি থেকে উপরে উঠিয়ে ফেললো দুই বগলের নিচে হাত দিয়ে। তার গায়ে যেন অসুরের শক্তি ভর করেছে।

তার দিকে তাকলাম, চেহারা একদম গম্ভীর হয়ে আছে। ভয়ঙ্কর কিছু একটা করার অভিপ্রায় সেখানে। উপরে আসার আগে জ্যাকেটটা খুলে এসেছে বাবা। এখন একটা নীল শার্ট আর বাদামি টাই পরনে তার। ঘড়িটাও নেই হাতে।

ঠিক তখনই বুঝতে পারলাম যে কি করতে চলেছে সে। মোচড়া মোচড়ি শুরু করলাম, পা নাড়াতে লাগলাম জোরে জোরে কিন্তু লাভ হলো না কিছুতেই। আমাকে ঠাণ্ডা পানির নিচে চেপে ধরলো সে।

আতঙ্ক চেপে বসলো আমার মনে। শুরুর দিকে আতঙ্কটা ছিল স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে কোন কিছু ঘটানোর আতঙ্ক। এখনও জামা কাপড় পরে আছি আমি বাথটাবে নামলে সেটা থাকে না সাধারণত। পায়ে স্যান্ডেল আমার এটাও থাকে না। প্রথম দিকে এই চিন্তাগুলোই ঘুরছিলো আমার মাথায়। কিন্তু তখন আমাকে বাথটাবের আরও গভীরে চেপে ধরলো বাবা। এবার সমস্ত আতঙ্ক রূপান্তরিত হলো মৃত্যুভয়ে।

বাঁচার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠলো আমার।

আবার হাত পা ছোঁড়াছুড়ি শুরু করলাম। কিছু একটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুই নেই ধরার মত, বাথটাবটার পিচ্ছিল ধার ছাড়া। এখানেই গত দু'বছর গোসল করেছি আমি। বাথটাবে শুয়ে শুয়ে বইও পড়েছি। আর আজ এখানেই মৃত্যু হবে আমার।

পানির ভেতরেই চোখ খুললাম আমি, মুখের সামনে ঝুলতে দেখলাম জিনিসটাকে। আমার প্রাণ বাঁচানোর একমাত্র উপায়। সেটাকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরলাম বাবার টাই।

শক্ত করে সেটা ধরে আছি সেটা যাতে চাইলেও আমাকে পানির নিচে চেপে ধরে রাখতে না পারে সে। নাহলে তার নিজের মাথাও পানির নিচে চলে আসবে।

আমার মাথা এখন পানির বাইরে। দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়ে ধরলাম টাই, একদম গিটটার নিচে।

দু'জনেই হাঁপাচ্ছি। আমার পুরো শরীর ভিজে গেছে পানিতে। বাবার শার্টও পানিয়ে ভিজে একাকার হয়ে গেছে দেখে কিছুটা সন্তুষ্ট হলাম।

আবার আমাকে পানির ভেতরে চেপে ধরার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু শক্ত করে দাঁত দিয়ে চেপে রেখেছি তার টাই, হাত দিয়ে আঁকড়ে আছি শার্টের কলার। না আঘাত করে আমাকে সেখান থেকে ছাড়াতে পারবে না সে।

বাবা আমার গায়ে হাত তুললো না।

সোজা হয়ে দাঁড়ালে আমিও উঠে গেলাম তার সাথে। আবিষ্কার করলাম ভয় পেয়ে কাঁদছি সমানে। তার টাই ছেড়ে দিলাম দাঁতের ফাঁক থেকে। কিন্তু হাত দিয়ে ধরে আছি এখনও।

“ছেড়ে দাও,” বললো বাবা, “টাইটা নষ্টই করে ফেলেছো”। টাইয়ের গিটটা একদম ছোট হয়ে গেছে। ছিড়ে গেছে তার নিচের অংশ। “তোমার মা দিয়েছিলো আমাকে এটা। সে থাকলে এখন তোমার বারোটা বাজাতো”।

তাকে ছেড়ে দিলাম আমি। বাথরুমের ভেজা কার্পেটের ওপর পড়ে গেলাম। সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে পেছাতে শুরু করলাম। “চুপচাপ তোমার ঘরে যাও। আজ আর আমার সামনে আসবে না”।

আমার ঘরে চলে আসলাম।

থরথর করে কাঁপছিলাম আমি, ঠাণ্ডা লাগছিলো ভীষণ। মনে হচ্ছিল যেন কেউ আমার দেহ থেকে সব উষ্ণতা চুরি করে নিয়ে গেছে। ভেজা কাপড়গুলো একদম সঁটে আছে চামড়ার সাথে। সেগুলো থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে মেঝের ওপর। হাঁটার সময় স্যান্ডেল থেকেও অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। জামাকাপড় সব খুলে ফেলে ফায়ারপেন্সসের সামনের টাইলসের ওপর জড়ো করে রাখলাম। ওপরের তাক থেকে ম্যাচ বের করে গ্যাসের লাইন চালু করে আগুন জ্বাললাম।

(এ মুহূর্তে একটা পুকুরের দিকে তাকিয়ে এমন সব স্মৃতি মনে করছি যেগুলো অবিশ্বাস্য ঠেকবে অন্য সবার কাছে। কিন্তু এটা বিশ্বাস করতে আমার নিজেরই কষ্ট হচ্ছে যে সাত বছরের একটা ছেলে আর পাঁচ বছরের একটা মেয়ের বেডরুমে গ্যাসের লাইন দেয়া ছিল।)

ঘরে কোন তোয়ালে না থাকায় সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম কিভাবে সারা শরীরে লেগে থাকা পানি শুকোনো যায়। বিছানার চাদর তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে মুছলাম শরীর। এরপর পায়জামা আর একটা ফুলহাতা গেঞ্জি পড়ে নিলাম। লাল নাইলনের তৈরি গেঞ্জিটা, চকচকে আর ডোরাকাটা। বাম হাতায় একটা পোড়া দাগ। একবার গ্যাসের আগুনের বেশি কাছে দাঁড়ানোয় আগুন ধরে গেছিলো সেখানে। তবে সৌভাগ্যবশত আমার হাত পোড়েনি।

ঘরের দরজার পেছনের হুকে একটা ড্রেসিং গাউন ঝুলছে। ওটা কখনোই ব্যবহার করি না আমি। গাউনটার একমাত্র কাজ মৃদু আলোয় দেয়ালের গায়ে ভূতুড়ে ছায়ার সৃষ্টি করা। আজ প্রথমবারের মত ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চাপলাম।

দরজা খুলে গেলো এ সময়। আমার বোন বিছানার নিচ থেকে নাইটড্রেসটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছে। “আজকে তুমি এত বেশি দুষ্টুমি করেছো যে এখানে ঘুমোতেও পারবো না আমি। অবশ্য তার বদলে মা বাবার সাথে ঘুমাবো। আর বাবা বলেছে আমাকে টেলিভিশন দেখতে দেবে” বললো সে।

মা বাবার ঘরে কেবিনেটের ওপর একটা পুরনো আমলের টেলিভিশন রাখা আছে। ওটা অবশ্য চালুই করা হয় না তেমন একটা সাদা কালো টিভিটায় ছবি ভালোভাবে আসে না। দেখা যায় কারো পা দেখা গেলে মাথা আসছে না। কিংবা ছবি উল্টে গেছে।

“আমার কিছু যায় আসে না এতে,” ওকে বললাম।

“বাবা বলেছে তুমি নাকি তার টাই নষ্ট করে দিয়েছো। ভিজিয়েও দিয়েছো তার শার্ট,” সম্ভ্রষ্ট গলায় বললো আমার বোন।

ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন আরসালা মঙ্কটন। “এই দুটু ছেলেটার সাথে কথা বলা নিষেধ আমাদের,” আমার বোনকে বললেন তিনি। “যতক্ষণ না পর্যন্ত আবার পরিবারের একজন বলে মেনে নেয়া হবে তাকে”।

আমার বোন বের হয়ে গেলো ঘর থেকে। “আপনি আমার পরিবারের কেউ নন,” আরসালা মঙ্কটনের উদ্দেশ্যে বললাম। “মা আসলে তাকে বলে দেবো আমি যে বাবা কি করেছে”।

“তার আসতে আরও প্রায় দু’ঘন্টা,” আরসালা মঙ্কটন বললেন। “আর তাকে বলেও বা কি লাভ হবে। সব কিছুতেই তোমার বাবার সাথে সায় দেন তিনি, তাই না?”

এটা সত্য কথা। সবসময় একই যুক্তিতে বিশ্বাসী বাবা আর মা।

“আমাকে আর ঘাটাবে না তুমি,” আরসালা মঙ্কটন বললেন। “এখানে নির্দিষ্ট একটা কাজে এসেছি আমি আর তুমি সেটাতে বাঁধার সৃষ্টি করছো। এর পরের বার কিন্তু আরো খারাপ কিছু ঘটবে। চিলেকোঠায় আটকে রাখবো তোমাকে”।

“আপনাকে ভয় পাই না আমি,” মিথ্যে বললাম। যেকোন কিছুর চেয়ে এ মুহূর্তে তাকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পাই আমি।

“বেশ গরম এখানে,” হেসে আমার উদ্দেশ্যে বললেন তিনি। গ্যাস আগুনের কাছে গিয়ে নিচু হয়ে সেটার নব ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিলেন। এরপর তাক থেকে ম্যাচগুলোও সরিয়ে ফেললেন।

“আপনি একটা উটকো ঝামেলা,” বললাম।

হাসি মুছে গেলো তার। দরজার চৌকাঠের সাথে ঝোলানো চাবিটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তালা দেয়ার শব্দ কানে আঁপলো। পাশের ঘর থেকে টেলিভিশনের আওয়াজ ভেসে আসছে। হলুদে ঘরের দরজা আটকানোর শব্দ শুনতে পেলাম। এই পাশের দু’টো ঘর এখন পুরো বাড়িটা থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয়ই নিচে যাবেন আরসালা মঙ্কটন। বইয়ে পড়েছিলাম যে একটা চোখা পেন্সিল চাবির ফুটোয় ঢুকিয়ে সেটা দিয়ে চাবিটাকে ধাক্কা দিয়ে একটা কাগজের ওপর ফেলে ভেতরে নিয়ে আসা যায়। সেভাবে মুক্তি পেতে পারতাম আমি... কিন্তু চাবি নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

চোখ দিয়ে অঝোরে পানি পড়তে শুরু করলো আমার। কাঁদতে শুরু করলাম ঘরের ভেতরে। সেই কান্নার সাথে মিশে আছে যন্ত্রনা আর রাগ। নিশ্চিন্তে কাঁদতে পারছি আমি, কারণ কেউ নেই ভেতরে সেটা নিয়ে আমাকে খেপানোর জন্যে। স্কুলে ভুলেও যদি কোন ছেলে চোখের পানি ফেলে তাহলে তার আর রক্ষা নেই।

এ সময় বৃষ্টির মৃদু শব্দ ভেসে এলো বাইরে থেকে। কিন্তু আজ এই শব্দটাও শান্ত করতে পারলো না আমাকে।

চোখের পানি না শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কাঁদলাম আমি। বড় করে শ্বাস নিলাম কয়েক বার। আরসালা মঙ্কটন (উটকো ঝামেলা, কেঁচো) আমাকে ধরবে বাসা থেকে বাইরে বেরুবার চেষ্টা করলে।

আমাকে তালা দিয়ে রেখেছে সে। ঠিক এই মুহূর্তে যদি পালানোর চেষ্টা করি তাহলে হয়তো বুঝতে পারবেন না তিনি। অথবা যদি ভাগ্য ভালো হইয়ে থাকে আমার, হয়তো অন্য কোন কাজে এখন ব্যস্ত সে।

বিছানার পাশের জানালাটা খুললাম, কান পাতলাম অন্ধকারের শব্দ শোনার জন্যে। মাটিতে বৃষ্টির ফোটা পড়ার টিপটিপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে আর আমার শরীর আগে থেকেই ভেজা। আমার বোন পাশের ঘরটাতে গুয়ে গুয়ে টেলিভিশন দেখছে। এখন কোন শব্দ কানে যাবে না তার।

দরজার কাছে গিয়ে বাতি নিভিয়ে দিলাম।

অন্ধকারেই হেঁটে হেঁটে বিছানার কাছে এসে উপরে উঠে পড়লাম।

বিছানায় গুয়ে আছি আমি- ভাবলাম। গুয়ে গুয়ে আজকের ঘটনার কথা ভাবছি। খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বো। আমি জানি জিতে গেছেন তিনি। যদি আবার এই ঘরে উঁকি দেন তিনি তাহলে বিছানার ওপর ঘুমন্ত অবস্থায় দেখবেন আমাকে।

বিছানায় গুয়ে আছি, ঘুমিয়ে পড়ার সময় হয়ে গেছে... চোখ খোলা রাখতে পারছি না। ঘুমিয়ে পড়েছি আমি। বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছি।

বিছানায় দাঁড়িয়ে জানালা বেয়ে বাইরে বের হয়ে আসলাম। কিছুক্ষণ স্কুলে থেকে সাবধানে নেমে পড়লাম বারান্দায়। এটা ছিল সহজ অংশ।

(শৈশব আর কৈশোরে বই পড়েই অনেক কিছু শিখেছি। লোকজন কোন পরিস্থিতিতে কি করে সেটা জানতে পেরেছি। বইই আমার শিক্ষক আর উপদেষ্টা। বইয়ের ছেলেদের দেখতাম গাছে চড়ছে, তাই আমিও গাছে চড়তাম। মাঝে মাঝে অনেক উঁচুতে উঠে যেতাম, ভয় লাগা সত্ত্বেও। বইয়ে

পড়েছিলাম যে অনেক সময় লোকে ড্রেইনপাইপ বেয়ে ওঠা নামা করে, তাই আমিও ড্রেইনপাইপ বেয়ে উপরে উঠতাম আর নামতাম। তখনকার দিনে লোহার শক্ত পাইপ থাকতো, আজকালকার মত স্বস্তা পল্যাস্টিকের পাইপ না)।

তবে এর আগে কখনোই অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে ড্রেইনপাইপ বেয়ে নামিনি। কিন্তু আমি জানি কোথায় পা দিতে হবে। সবচেয়ে কষ্টকর কাজ হচ্ছে পিচ্ছিল পাইপটা ধরে রাখা। একটু অমনোযোগী হলেই পড়ে যাবো। পাইপটা নিচের টেলিভিশন রুমের পাশ দিয়ে নেমে গেছে। সেখানে নিশ্চয়ই টিভি দেখায় ব্যস্ত বাবা আর আরসালা মঞ্চটন।

ব্যাপারটা নিয়ে না ভাবার চেষ্টা করলাম।

বারান্দা টপকে পাশের ড্রেইনপাইপটা হাত বাড়িয়ে ধরলাম। যেমনটা ভেবেছিলাম, বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে ওটা, ভীষণ ঠাণ্ডা। ওটার ক্ল্যাম্পের ওপরে সাবধানে খালি পা জোড়া আটকে বুলে পড়লাম।

আস্তু আস্তু নিচে নামতে লাগলাম, নিজেকে ব্যাটম্যানের জায়গায় কল্পনা করছি, প্রেমের গল্পের নায়ক নায়িকাদের জায়গায় কল্পনা করছি। এরপর ভাবলাম যে আমি এই পাইপের গায়ের একটা বৃষ্টির ফোটা, পিছলে নিচে পড়ছি।

আমি বিছানায় শুয়ে আছি টেলিভিশন রুমের ঠিক ওপরে এসে ভাবলাম মনে মনে। এই রুমের পর্দা ফাঁক করা এখনও, সেখান থেকে আলো এসে পড়ছে বৃষ্টির ফোটার ওপর।

আমাকে দেখবে না- ভাবলাম। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাবে না এখন।

এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে নিচে নামতে লাগলাম। অন্য সময় হলে লাফিয়ে টেলিভিশন রুমের জানালার বাইরে অংশে নেমে পড়তাম। কিন্তু আজকে সম্ভব না সেটা। রুমটার পাশ দিয়ে সাবধানে নিচে নামার সময় একবার তাকানোর লোভ সামলাতে পারলাম না। ভেবেছিলাম যে বাবা আর আরসালা মঞ্চটন হয়তো একদম আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। কিন্তু ঘরটা খালি।

আলো জ্বলছে, টেলিভিশনও চালু আছে, কিন্তু সোফায় কেউ নেই। আর নিচের হলওয়েতে যাবার দরজাটা খোলা।

লাফিয়ে জানালার বাড়ানো অংশে নেমে পড়লাম আমি। তারা কেউ যে ফেরত আসতে পারে যে কোন মুহূর্তে সেটা মাথাতেই নেই আমার। সেখান

থেকে ফুলের কেয়ারীর ওপর লাফিয়ে নামলাম। ভেজা মাটির স্পর্শ পেলাম
পায়ে।

দৌড়ানো শুরু করবো ভাবছি এসময় চোখে পড়লো যে ড্রয়িং রুমের বাতি
জ্বালানো। ওখানে বাচ্চাদের যাওয়া মানা। বাসার সবচেয়ে সুন্দর এই রুমটা
বরাদ্দ অতিথি আর বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্যে।

সবুজ ভেলভেটের পর্দাগুলো অবশ্য নামানো। কয়েক জায়গায় সাদা সাদা
ছোপ ওগুলোর, সেখান দিয়েই আলো বাইরে আসছে।

হেঁটে জানালার বাইরে চলে আসলাম। এক জায়গায় পর্দা ঠিকভাবে
ভেড়ানো হয়নি। ভেতরটা দেখা যাচ্ছে, সেখান দিয়ে উঁকি দিলাম।

ভেতরে ঠিক কি চলছে সেটা বোধগম্য হলো না আমার। বাবা আর আরসালা
মঙ্কটন দু'জনের পিঠই আমার দিকে। ফায়ারপেন্সসের পাশের দেয়ালে হাত
দিয়ে সামনে ঝুঁকে আছেন আরসালা মঙ্কটন। তার স্কাট কোমর অবধি
ওঠানো। বাবা পেছন দিক দিয়ে জড়িয়ে আছে তাকে।

বুঝতে পারলাম না যে কি করছে তারা আর সেটা জানার কোন আগ্রহও
নেই। সেই মুহূর্তে শুধু এটা জানার দরকার ছিল যে আরসালা মঙ্কটনের
মনোযোগ আমি বাদে অন্য কোন দিকে আছে কিনা। দৃশ্যটা দেখা মাত্র
উল্টোদিকে ঘুরে দৌড় দিলাম। খালি পায়ে অন্ধকারের মধ্যে।

তবে একদম ঘুটঘুটে অন্ধকার নয়। আশেপাশের বাড়ি আর ল্যাম্পপোস্ট
থেকে আলো ভেসে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকার সয়ে আসলো
আমার চোখে। বাগানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে, গোবরের স্তুপের পাশ দিয়ে
টিলা বেয়ে নিচে নামতে লাগলাম। পায়ে স্যান্ডেল না থাকায় ছোট ছোট
কাটা বিধছে সেখানে, কিন্তু পাত্তা দিলাম না।

গলির বেড়ার কাছে পৌঁছে গেলাম। বাসার সীমানার বাইরে চলে আসলাম
কিছুক্ষণের মধ্যে। বুকের ওপর চেপে থাকা একটা পাথর যেন সরে গেলো।

“লেটি? লেটি হেম্পস্টক?” ফিসফিসিয়ে বললাম আমি। আর মনে মনে
ভাবলাম, এত পরিষ্কার স্বপ্ন দেখছি আমি! বিছানায় ঘুমে মগ্ন এখন। কিন্তু
আমার মনে হয় না আরসালা মঙ্কটন এখন আমাকে নিয়ে জড়িয়ে।

দৌড়াতে দৌড়াতে বাবার কথা ভাবতে লাগলাম। জড়িয়ে ধরে আছে
আমাদের নকল গৃহপরিচারিকাকে, চুমু দিচ্ছে তার কপালে। এরপরই আমাকে
পানির নিচে চেপে ধরে থাকার সময় তার মুখভঙ্গির কথা মনে পড়লো।
বাথরুমে যা ঘটেছে সেটা নিয়ে আর ভীত নই আমি, এখন আমি ভীত

বাবাকে নিয়ে। আরসালা মঙ্কটনের কাঁধে চুমু দিচ্ছিলো সে, আর হাত দিয়ে উঠিয়ে রেখেছিল তার স্কার্ট এর অর্থ কি?

আমার মা আর বাবার সম্পর্কটা কি ঝুঁকির মধ্যে? আমার নিজের ভবিষ্যৎ হঠাৎ করেই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যে কোন কিছু হতে পারে। আর সব কিছু ঠিক করার দায়িত্ব আমার।

পায়ে ব্যাথা লাগলেও দৌড়ানো থামালাম না। খুব শীঘ্রই নিশ্চয়ই বাবার সাথে কাজ শেষ হয়ে যাবে আরসালা মঙ্কটনের। তারা আমাকে দেখার জন্যে হয়তো একসাথেই ওপরে যাবেন। সেখানে গিয়ে আমাকে না পেয়ে খুঁজতে বের হবে।

যদি আমাকে খুঁজতে বের হয় তারা, তাহলে নিশ্চয়ই গাড়ী নিয়ে বেরুবে ভাবলাম। গলির দুপাশে কোন ঝোপ আছে কিনা খুঁজতে লাগলাম। এসময় এক জায়গায় ভাঙা বেড়া চোখে পড়লে সেটা গলে বাইরে রাস্তার বাইরে চলে আসলাম। মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়াতে লাগলাম। পাথরের রাস্তার চেয়ে এখান দিয়ে দৌড়ানোই সহজ মনে হচ্ছে। আমার পায়জামা আর ড্রেসিং গাউন হাটুর নিচ থেকে পুরোপুরি ভিজে একাকার।

এসময় মেঘের গর্জনের শব্দ কানে আসলো, কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাতে দেখিনি আমি। একটা বেড়া টপকে সদ্য চষা ক্ষেতে পা দিলাম। ওটার ওপর দিয়ে দৌড়ানোর সময় হোঁচট খেলাম বার কয়েক, কিন্তু গতি কমালাম না। আরেকটা বেড়া টপকে পরের ক্ষেতে চলে আসলাম। এটার মাটি সমান্তরাল হওয়াতে দৌড়াতে সমস্যা হচ্ছে না। ইচ্ছে করে ঝোপঝাড়ের কাছ দিয়ে দৌড়াচ্ছি আমি, যাতে কারো চোখে না পড়ে।

এসময় একটা গাড়ির শব্দ ভেসে এলো গলি থেকে। চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি। কিন্তু থামলো না ওটা। চোখ খুলে গাড়িটার পেছনের লাল লাইট দেখতে পেলাম। অ্যাভার্সদের গাড়ি ওটা।

এখন গলিটাকে আরো বেশি অনিরাপদ মনে হচ্ছে। এবার ক্ষেতের ভেতর দিয়ে আড়াআড়ি দৌড়াতে লাগলাম। পরের ক্ষেতটার কাছে পৌঁছে গেলাম দ্রুত। এটায় আগের গুলোর মত কাটাতারের বেড়া নেই শুধু তার দিয়ে আলাদা করা। খুব সহজেই হামাগুড়ি দিয়ে পার হয়ে যাওয়া যাবে। একটা তার উপরে ওঠানোর জন্যে হাত রাখলাম, আর-মনে হলো যেন কেউ যেন ব্যাট দিয়ে বাড়ি দিয়েছে। হাতের যে জায়গা দিয়ে ছুঁয়েছিলাম তারটা সেখানটা পুড়ে গেছে, জ্বালাপোড়া করছে ভীষণ।

বৈদ্যুতিক বেড়াটা থেকে দূরে সরে আসলাম আমি। এটা টপকানো সম্ভব না। বেড়ার পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। একসময় পৌঁছে গেলাম কাঠের দরজাটার কাছে। সেটা বেয়ে অন্য পাশে চলে আসলাম। এদিকটায় ঘন হয়ে জন্মে আছে গাছপালা। সেখান দিয়েই এগোতে লাগলাম।

ভাবতে লাগলাম যে কোন দিকে যাব এবার। যেন আমার প্রশ্নের জবাব হিসেবেই বিদ্যুৎ চমকালো এই সময়। আরেকটা মাঠের বেড়া চোখে পড়লো আমার। বৈদ্যুতিক বেড়া না, সাধারণ বেড়া। ওটা টপকে ক্ষেতের ভেতর টুকে পড়লাম। সেটার ভেতর দিয়ে দৌড়াতে লাগলাম আবার, পায়ে ব্যাথা করা সত্ত্বেও। আশা করছি যে ঠিক পথেই যাচ্ছি আমি। সেটা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কিন্তু হঠাৎই বুঝতে পারলাম যে এ মুহূর্তে কোথায় আছি সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই আমার। গলির কোন অংশে আছি সেটাও জানি না। অন্ধকার যেন আরো গাঢ় হয়ে এসেছে, বৃষ্টি পড়ছে ঝিরিঝিরি। হারিয়ে গেছি আমি, এই অন্ধকারের সমুদ্রে। মনে হচ্ছে যেন অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে আছে ভয়ানক সব জিনিস। ভূত আর নেকড়ে। আর সেই নেকড়ে আর ভূতের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আরসালা মঙ্কটন। আমাকে শাসাচ্ছে যে এর পরের বার যদি তার অবাধ্য হই তাহলে আরো খারাপ অবস্থা হবে। চিলেকোঠায় বন্দ করে রাখবে আমাকে। এগুলো কল্পনা করতে চাইনা আমি, কিন্তু থামাতে পারলাম না।

আমি সাহসী নই মোটেও। বাসা থেকে পালিয়েছি এই অন্ধকার, শীতল রাতে। হারিয়ে গেছি ক্ষেতের গোলকধাঁধায়।

“লেটি? লেটি হেম্পস্টক!” চিৎকার করে উঠলাম যত জোরে সম্ভব। কিন্তু কোন জবাব আসলো না। আসবে, সেটা আশাও করিনি।

মেঘের গর্জন বাড়ছে ধীরে ধীরে, যেন একটা বাঘ ক্রমশ রাগান্বিত হয়ে উঠছে। এত ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকচ্ছে যে মনে হচ্ছে একটা নষ্ট টিউবলাইট বার বার জ্বলছে আর নিভছে। সেই আলোর ঝলকানিতে আশেপাশের এলাকাতে একবার চোখ বুলালাম। আমার দুই পাশেই ঝোপের সারি, ওগুলোর মধ্যে দিয়ে যাবার উপায় নেই। কোন গেট চোখে পড়লো না, একমাত্র যদিকের বেড়া টপকে এপাশে এসেছি সেদিক ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব না।

আকাশের দিকে তাকলাম। টেলিভিশনে অনেকবার বজ্রপাত হতে দেখেছি, বিদ্যুৎ চমকাতোও দেখেছি অনেক সিনেমায়। সব আলোর রেখা ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত যতবার নিজ চোখে বিদ্যুৎ চমকাতো দেখেছি

প্রতিবারই আমার মনে হয়েছে কেউ যেন আকাশ থেকে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বালছে। সেই আলোতে কিছুক্ষণের জন্যে দৃশ্যমান হচ্ছে আশপাশ। কিন্তু এবার আকাশে সেরকম কিছু দেখলাম না।

বরং আমার কাছে মনে হলো নীলচে সাদা একটা চাদর কেউ ঝুলিয়ে দিয়েছে অন্ধকার আকাশের গায়ে। আর সেটা কিছুক্ষণ পর পর জ্বলছে আর নিভছে। আবার আশেপাশে তাকলাম। বৃষ্টির তেজ এখন আগের চাইতে অনেক বেশি। আমার মুখে বড় বড় ফোটা ঝাপটা দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ড্রেসিং গাউন পুরোপুরি ভিজে গেলো। ঠিক সেই সময় আলোর ঝলকানিতে আমার ডানদিকে ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেলাম বলে মনে হলো। ওদিকে হাঁটতে লাগলাম, এখন আর দৌড়াতে পারছি না। আশা করছি যে ভুল দেখিনি। আমার ভেজা গাউন প্রবল বাতাসের তোড়ে ঝাপটাচ্ছে আর শব্দ করছে। ভয় আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে শব্দটা।

আকাশের দিকে কিংবা পেছনে না তাকিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

কিন্তু এই সময় আকাশ আবার আলোকিত হয়ে ওঠায় কিছুক্ষণের জন্যে পরিষ্কার হল সামনের দৃশ্য। ভুল দেখিনি আমি। আসলেও একটা ফাঁকা জায়গা আছে ঝোপের মাঝে। সেখানে পৌঁছে গেছি প্রায় এমন সময় একটা গলার আওয়াজ বলে উঠলো

“তোমাকে তো তোমার ঘরে থাকতে বলেছিলাম। এভাবে ক্ষেতে খামারে ভদ্র ছেলেরা দৌড়ায় কখনো?”

ঘুরে পিছনের দিকে তাকলাম, কিন্তু কিছু চোখে পড়লো না। কেউ নেই সেখানে।

উপরের দিকে তাকলাম।

আরসালা মঙ্কটন নামের জিনিসটা ভেসে আছে আমার থেকে বিশ ফিট উঁচুতে। এই আবহাওয়া তার ওপর কোন প্রতিক্রিয়া ফেলছে বলে মনে হচ্ছে না। সে কিন্তু উড়ছে না, কেবল ভাসছে, বেলুনের মত।

প্রবল বেগে বাতাস আছড়ে পড়ছে আমার মুখে, শৌ শৌ শব্দ হচ্ছে। বজ্রপাতের শব্দ ভেসে আসছে চারপাশ থেকে। এর মধ্যেই আস্তে আস্তে কথা বলে উঠলেন তিনি। কিন্তু প্রতিটা শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলাম, যেন কেউ আমার কানের কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলছে কথাগুলো।

“অনেক বড় বিপদে পড়তে যাচ্ছো তুমি”।

হাসছিলো সে। এরকম অমানুষিক হাসি কখনো কারো চেহারায় দেখবো সেটা ভাবিনি আগে। কিন্তু কোন প্রাণ নেই সেই হাসিতে।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে প্রায় আধাঘন্টা দৌড়াচ্ছি আমি। নাকি এক ঘন্টা? ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে না দৌড়ে গলির ভেতর দিয়ে দৌড়ালেই ভালো হতো। তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই পৌঁছে যেতাম হেম্পস্টকদের খামারে। এরকম অসহায় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না।

আরসালা মঙ্কটন আরো নিচে নেমে আসলো। তার গোলাপী ব্লাউজের বোতাম সবগুলো খোলা। ভেতরে একটা সাদা ব্রা পরে আছেন তিনি। স্কার্ট ঝাপটাচ্ছে বাতাসের তোড়ে, হাঁটু অবধি দেখা যাচ্ছে। এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও এক ফোটা পানি নেই তার শরীরে। তার চেহারা, কাপড় চোপড় সব শুকনো।

একদম আমার মাথার চলে এসেছেন এখন। হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

তার দেহের প্রতিটা ছন্দের সাথে তাল মেলাচ্ছে প্রকৃতি। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর বাতাসের বেগ কমছে বাড়ছে তার ইশারায়। তার বাড়িয়ে দেয়া হাতের আঙুলগুলো খুলে গেলো ফুল ফোটার ভঙ্গিতে। তিনি কি চাচ্ছেন বুঝতে পারলাম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেটাই করলাম আমি, ঘুরে দৌড় লাগলাম।

বিড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলা করে তেমনি আমাকে নিয়ে খেলা করছে আরসালা মঙ্কটন। প্রতিবারই ইঁদুরকে ধরে ফেলে বিড়াল। তবুও দৌড়িয়ে পালানোর আশা ছাড়ে না ইঁদুরটা। আমিও দৌড়াতে লাগলাম, অন্য কোন উপায়ও নেই এটা ছাড়া।

ঝোপের মাঝের ফাঁকা জায়গাটার উদ্দেশ্যে দৌড়াতে লাগলাম প্রাণপণে। এর মাঝেই তার গলার স্বর বাজতে লাগলো আমার কানে।

“তোমাকে বলেছিলাম না চিলেকোঠায় আটকে রাখবো? সেটাই হবে এখন। তোমার বাবা পছন্দ করে আমাকে। আমি যা বলি সেটাই করবে সে। এখন থেকে প্রতি রাতে তোমাকে চিলেকোঠা থেকে নামিয়ে একবার করে বাথটাবের ঠাণ্ডা পানিতে চেপে ধরবে তোমার মুখ। প্রতিদিন তাকে দিয়ে এটা করাবো আমি, যতদিন না একঘেয়ে লাগে। একবার একদিন তাকে বলবো একটু বেশি সময় তোমাকে পানির নিচে ধরে রাখতে, যাতে ধীরে ধীরে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে আসে তোমার। চিরন্তন বন্ধ হয়ে যাবে তোমার দুষ্টমি। আর সেটার বদলে প্রতি রাতে তাকে আদর করবো আমি...”।

ঝোপের মাঝের ফাঁকা অংশ দিয়ে বাইরে বের হয়ে এসেছি। নরম ঘাসের ওপর দিয়ে দৌড়াচ্ছি এখন।

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়লো এ সময়। অদ্ভুত একটা ধাতব গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। রাতের অন্ধকারের জায়গা দখল করেছে নীলাভ সাদা আলো। উজ্জ্বলতা ক্রমশ বাড়ছে সেটার।

“অবশ্য বাথটাতে শেষবারের মত গোসলের পরে খুশিই হবে তুমি,” ফিসফিসিয়ে বললো আরসালা মঙ্কটন। এবার মনে হল যেন আমার কানে তার ঠোঁটের স্পর্শ অনুভব করতে পারছি। “কারণ তার আগের দিনগুলোতে চিলেকোঠায় ভুগতে হবে তোমাকে। সেখানে অন্ধকারের মধ্যে তোমার সাথে সময় কাটানোর জন্যে আমার কিছু বন্ধুকে নিয়ে আসবো। ছোট ছোট ছেলেদের একদমই পছন্দ না তাদের। বড় বড় কুকুরের সমান মাকড়সা, অশরীরি প্রেতাত্মা। প্রতিটা ক্ষণ তোমাকে শাস্তি দেবে ওরা। চিলেকোঠায় থাকবে না কোন বই। কোন গল্পও পড়তে পারবে না আর কখনো”।

এই সময় বুঝতে পারলাম যে কল্পনা নয় বাস্তবেই আমার কানে তার স্পর্শ পেয়েছি আমি। আমা পাশ দিয়েই উড়ছে সে। তার দিকে তাকাতেই আবার সেই আগের মত মেকি হাসি দিলেন। আর দৌড়ানো সম্ভব না আমার পক্ষে। নড়াচড়াই করতে পারছি না। হাপরের মত শ্বাস নিচ্ছি, সেটাতেও কষ্ট হচ্ছে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে বাধ্য হলাম, এবার আর উঠে দাঁড়াতে পারছি না। আরসালা মঙ্কটন ওপর থেকে দেখেছে আমাকে, ত্রুর দৃষ্টিতে।

শিকার পর্ব শেষ।

মাটি থেকে বড়জোর তিন ফিট ওপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। আর তার একটু দূরে ভেজা মাটিতে ঘাসের ওপর শুয়ে আছি আমি এখন। ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করলেন আরসালা মঙ্কটন।

এসময় নরম কিছু একটা স্পর্শ করলো আমার বাম হাত। ওদিকে তাকালাম, ভয় পাচ্ছি যে কুকুরের সমান মাকড়সা দেখতে হবে হয়তো। কিন্তু বিদ্যুৎ বলকানির আলোতে আমার হাতের পাশে কালো রঙের কিছু একটা চোখে পড়লো। ওটার কানের কাছে একটা সাদা দাগ। বিড়াল ছানাটাকে আমার বুকের ওপর টেনে নিলাম। আদর করতে লাগলাম ওটাকে।

“আপনার সাথে যাবো না আমি। কিছুতেই এখান থেকে আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন না,” উঠে বসে বললাম। ভয় কিছুটা কমেছে এখন।

“একদম ছেলেমানুষ,” বললেন আরসালা মঙ্কটন। মাটিতে নেমে আসলেন তিনি। বুঝতে পারলাম যে তার শরীর থেকেই আলোর ঝলকানি সৃষ্টি হচ্ছিল এতক্ষণ। তাকে নীল আর সাদা রঙে আঁকা কোন নারীর প্রতিমূর্তি মনে হচ্ছে এখন। “তুমি একদম ছেলেমানুষ। আর আমার বয়স অনেক বেশি। তোমার এই পৃথিবী যখন গরম লাভার একটা গোলা ছিল মাত্র, তখনও ছিলাম আমি। তোমাকে দিয়ে যা খুশি করাতে পারি আমি। উঠে দাঁড়াও এখন। আমার সাথে বাসায় যাবে”।

বিড়াল ছানাটা আমার বুকের কাছ থেকে হিসিয়ে উঠলো এই সময়। আরসালা মঙ্কটনের দিক থেকে ঘুরে আমার পেছনের দিকে তাকালাম।

লাল রেইনকোট পরে আমাদের দিকে হেঁটে আসছে একটা মেয়ে। পায়ে অনেক বড় একটা ওয়েলিংটন বুট। আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে অঙ্ককারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসলো সে। সরাসরি আরসালা মঙ্কটনের দিকে তাকালো।

“আমার এলাকার জমিন স্পর্শ করবে না,” বললো লেটি হেম্পস্টক।

এক পা পিছিয়ে গিয়ে মাটি থেকে ওপরে উঠতে শুরু করলো আরসালা মঙ্কটন। দেখতে দেখতে আমাদের মাথার ওপরে উঠে গেলো। আমার দিকে না তাকিয়ে আমার উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিল লেটি। ওর বাম হাতের আঙুল চেপে ধরলো আমার ডান হাতের আঙুলগুলো।

“তোমাদের জমিন স্পর্শ করছি না আমি,” বললেন আরসালা মঙ্কটন। “চলে যাও মেয়ে”।

“তুমি আমার এলাকায় কি করছো?”

আরসালা মঙ্কটন হাসলেন জবাবে। এখনও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তার শরীরে। আলোর ঝলকানি দেখা যাচ্ছে আশেপাশে। যেন শক্তির একটা উৎস। তিনিই আজকের এই ঝড়ের জন্যে দায়ী। দায়ী বজ্রপাতের জন্যে। রহস্যে আগাগোড়া মোড়ানো আরসালা মঙ্কটন। ঠিক যেন বড়দের জীবনের মত, যেটা ভর্তি রহস্য আর নির্মম উপহাসে। আমার উদ্দেশ্যে একবার চোখ টিপ দিলেন তিনি।

আমার বয়স মাত্র সাত বছর। কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত ভেজা মাটিতে অসহায় ভঙ্গিতে পড়েছিলাম আমি। এমন একটা সত্ত্বার মুখোমুখি হয়েছি যে আমার নিজ বাবাকে দিয়ে আমাকে খুন করাতে পারে। আর সেই জিনিসটা আমাদের থেকে কয়েক ফুট দূরে ভাসছে এখন।

লেটির সাহচর্যে আবার সাহস ফিরে পেয়েছি আমি। কিন্তু লেটির নিজের বয়সও বেশি না। যদিও অনেক দিন ধরে একারোতেই থেমে আছে ওর

বয়স। আরসালা মঙ্কটনের বয়স তার চাইতে অনেক বেশি। আর বড়রা যখন ছোটদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, তখন ছোটরা কখনোই পেরে ওঠে না।

“যেখান থেকে এসেছো সেখানেই ফিরে যাও তুমি। এখানকার কোন কিছুই তোমার জন্যে ভালো পরিণাম ডেকে আনবে না। নিজের ভালোর জন্যে হলেও ফিরে যাও”।

একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে আসলো এ সময়। এতটাই তীক্ষ্ণ যে আমার সারা শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেলো। কোলের বিড়াল ছানাটাও ভয় পেয়ে আমার বুকে মুখ গুজলো। আরসালা মঙ্কটনের দিকে তাকালাম। কিসের শব্দ শুনেছি সেটা পরিষ্কার হয়ে গেলো।

হাসছে আরসালা মঙ্কটন।

“ফিরে যাবো? তোমরা যখন সময়ের মধ্যে দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করেছিলে, তখনই সেই সুযোগটা কাজে লাগাই আমি। ইচ্ছে করলে অনেকগুলো জগতে রাজত্ব করতে পারতাম আমি, কিন্তু সেটা করিনি। পিঁছু নেই তোমাদের, জানতাম একদিন সুযোগ আসবেই, বন্ধন দুর্বল হয়ে যাবে। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকি। এই সত্যিকারের পৃথিবীতে সূর্যের আলোর নিচে হেঁটে বেড়ানোর ইচ্ছে ছিল আমার,” এখন আর হাসছে না সে। “এখানকার সবকিছু দুর্বল। সবার চাহিদা কি অল্প! আমার যা যা দরকার সেগুলো এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবো আমি। বাচ্চারা যেভাবে হাত ভর্তি করে ফল নিয়ে যায়, সেভাবে”।

এবার আর লেটির হাত ছাড়লাম না। বিড়াল ছানাটা এখন আমার কাঁধে উঠে গেছে, সেটার গায়ে হাত বোলাতে লাগলাম। ওটার নখের আঁচড় টের পাচ্ছি সেখানে। ভয়ে আঁচড় কাটছে এটা বুঝতে পারলাম।

ঝড়ের প্রকোপ বেড়ে গেলো এ সময় হঠাৎ, গর্জে উঠলো বাতাস। আর সেই সাথে আরসালা মঙ্কটনের স্বর ভেসে আসলো চারদিক থেকে। “এখান থেকে অনেক দিন দূরে রেখেছো তোমরা আমাকে। কিন্তু সেদিন একটা দরজা নিয়ে হাজির হয়েছিলে। এই ছেলেটার মধ্যে দিয়ে এই জগতে পালিয়ে যেতে পারি আমি। আর একবার যখন মুক্ত হয়ে গেছি তখন আমাকে ফেরাবার সাধ্য কার?”

কথাটা শুনে তৎক্ষণাৎ রেগে গেলো না লেটি। বরং ভাবতে লাগলো কি জবাব দেবে। কিছুক্ষণ পরে বললো, “তোমাকে নতুন একটা দরজা বানিয়ে

দিতে পারি আমি। অথবা তোমাকে নানীমা ইচ্ছে করলে সাগরের ওপাশে পাঠিয়ে দিতে পারে, যেখানে উৎপত্তি হয়েছিল তোমার”।

আরসালা মঙ্কটন থুতু ফেললো ঘাসের ওপর। আগুন জ্বলে উঠলো যেখানে থুতুটা পড়লো।

“আমাকে ছেলেটাকে দিয়ে দাও,” বললো সে। “ও আমার। ওর মধ্যে দিয়েই এখানে এসেছি আমি”।

“কিছুই তোমার না,” এবার রাগতস্বরে বললো লেটি হেম্পস্টক, “বিশেষ করে ছেলেটা”। আমার আরো কাছে সরে আসলো সে। হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো কাঁধ। আমার আমার আরেক কাঁধে বসে আছে বিড়াল ছানাটা।

“কি করবে তুমি? ওকে তোমার সাথে নিয়ে যাবে? এই জগতে অনেক নিয়ম কানুন আছে। ছেলেটাকে ওর বাবা মা’র সাথেই থাকতে হবে। ওকে তোমাদের ওখানে নিয়ে গেলে ওর বাবা মা গিয়ে হাজির হবে নিয়ে আসার জন্যে। আর ওর বাবা-মা এখন আমার ইচ্ছের গোলাম,” আরসালা মঙ্কটন বললেন।

“বিরক্ত লাগছে এখন আমার,” লেটি হেম্পস্টক বললো। “তোমাকে সুযোগ দিয়েছি বেশ কয়েকবার। আমার এলাকায় এসেছো তুমি। চলে যাও”।

ও কথাটা বলার সাথে সাথে আবার শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো আমার শরীরে। শীতকালে বেলুন সোয়েটারে ঘষে মুখের কাছে ধরলে যেরকম অনুভূতি হয় সেরকম। আমার মাথার পেছনের ভেজা চুলগুলোও দাঁড়িয়ে গেলো।

লেটি শক্ত করে ধরে আছে আমাকে। “চিন্তা করো না,” ফিসফিসিয়ে বললো ও। কেন চিন্তা করবো না? কি নিয়ে চিন্তা করবো না? এটা জিজ্ঞেস করতে যাবো এমন সময় দেখলাম আমরা যে মাঠে দাঁড়িয়ে আছি সেটায় ছড়িয়ে পড়ছে একটা সোনালী রঙের আভা।

প্রতিটা ঘাস জ্বলজ্বল করছে সেই আভায়। প্রতিটা গাছের পাতা সোনালী বর্ণ ধারণ করেছে। আলোটা উষ্ণ, আন্তরিক। আমার কাছে মনে হতে লাগলো যে প্রতিটা ঘাস যেন রূপান্তরিত হয়েছে ছোট ছোট আলোর উৎসে। আরসালা মঙ্কটনের নীলাভ সাদা আলো ফিকে হয়ে গেছে সেগুলোর সামনে।

উপরে উঠতে লাগলো আরসালা মঙ্কটন। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন তার আশেপাশের ঠাণ্ডা বাতাস হঠাৎ গরম বাতাসে রূপান্তরিত হয়েছে। ভেসেও থাকতে পারছে না ঠিকমতো। এসময় লেটি আবার সেই পুরনো

ভাষায় মন্ত্র জপতে শুরু করলো। চারপাশের সোনালী আভার উজ্জ্বলতা বেড়ে গেলো বহুগুণে। দেখলাম আরসালা মঙ্কটন দূরে ভেসে যাচ্ছে আলোর তোড়ে। কিন্তু কোন বাতাস নেই আশেপাশে। তাহলে কিভাবে ওভাবে ভেসে যাচ্ছে সে? তাকে একদম ছোট একটা বিন্দুতে পরিণত হতে দেখলাম। এরপরই উধাও হয়ে গেলো আরসালা মঙ্কটন আর তার নীলাভ সাদা আলো।

“আসো,” লেটি হেম্পস্টক বললো। “তোমাকে আগুনের সামনে বসে থাকতে হবে এখন। গোসল করতে হবে গরম পানি দিয়ে। নাহলে ঠাণ্ডা লেগে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে,” আমার হাত ছেড়ে দিল সে, পেছনে সরে গেলো। আশপাশের সোনালী আভা কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। একদম নিভে গেলো এক পর্যায়ে। শুধু এখানে সেখানে দু এক ফোটা সোনালী আলোর ঝলকানি চোখে পড়ছে হঠাৎ, আতশবাজির নিভে যাওয়ার পর যেমনটা হয়। “আরসালা মঙ্কটন মারা গেছেন?” জিজ্ঞেস করলাম।

“না”।

“তাহলে আবার ফিরে আসবেন তিনি। তখন বিপদে পড়বে তুমি”।

“সেটা হতে পারে,” বললো লেটি। “তোমার কি ক্ষুধা পেয়েছে?”

হঠাৎ টের পেলাম যে প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে আমার। এতক্ষণ এসব ঘটনার কারণে ভুলে ছিলাম।

“তোমার জামা কাপড়ও সব ভিজে গেছে,” আমার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললো, “তোমাকে নতুন কিছু দিতে হবে পরার জন্যে। সবুজ বেডরুমটার ড্রয়ারে খুঁজে দেখবো আমি। আমার এক খালাতো ভাই যুদ্ধে আবার আগে তার সব জামা কাপড় সেখানে রেখে গেছে। তোমার মতনই বয়স ছিল ওর”।

বিড়াল ছানাটা আমার আঙুল চাটছে ওর ছোট্ট জিহবাটা দিয়ে।

“একটা বিড়াল ছানা পেয়েছি আমি,” বললাম।

“সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। ওকে তুমি সেদিন লোজ ধরে টেনে বের করার পর থেকেই নিশ্চয়ই তোমাকে অনুসরণ করছে?”

“এটা কি সেই বিড়ালছানাটাই!”

“হ্যাঁ। তোমাকে ওর নাম বলেছে?”

“না। সেটা করে নাকি ওরা?”

“মাঝে মাঝে। যদি শোনার চেষ্টা করো তুমি”।

আমাদের সামনে হেম্পস্টক খামারবাড়ির আলো জ্বলতে দেখলাম এ সময়। যদিও এটা বুঝতে পারলাম না যে এত তাড়াতাড়ি কিভাবে খামারের সীমানায় পৌঁছে গেলাম আমরা।

“তোমার ভাগ্য ভালো,” লেটি বললো। “আর পনেরো ফিট পেছনে গেলেই কলিন অ্যাভার্সদের সীমানায় ঢুকে যেতে”।

“ওখানেও আমাকে বাঁচাতে আসতে তুমি,” বললাম আমি।

আমার হাতে আলতো করে চাপ দিলো লেটি কিন্তু কিছু বললো না।

“লেটি, আমি বাসায় যেতে চাই না,” বললাম। আসলে কথাটা সত্য নয়। বাসায় যেতে খুব ইচ্ছে করছে আমার। কিন্তু আজ রাতে যেখান থেকে পালিয়েছি সেখানে না। আমি ফেরত যেতে চাই হতচ্ছাড়া ওপাল মাইনারটা আমাদের মিনিভ্যানে আত্মহত্যা করার আগের সময়ে। কিংবা ট্যাক্সিটা আমার বেড়াল ছানাকে মেরে ফেলার আগের সময়ের।

কালো লোমশ বিড়াল ছানাটা আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে আছে এখনও। এটা যদি আমার বিড়াল হতো, তাহলে বেশ হতো। কিন্তু আমি জানি ও আমার নয়।

বৃষ্টি একদম কমে এসেছে এখন, টিপটিপ করে পড়ছে।

পানি জমে আছে এখানে সেখানে। তার ওপর দিয়েই হেঁটে যেতে লাগলাম আমরা। আমি খালি পায়ে আর লেটি ওয়েলিংটন বুট পায়ে। খামারের উঠানে পৌঁছানোর সাথে সাথে গোবরের গন্ধ এসে নাকে লাগলো। এরপরেই পাশের একটা দরজা দিয়ে খামারবাড়ির বিশাল রান্নাঘরটার প্রবেশ করলাম আমরা।

অধ্যায় ৯

লেটির মা ফায়ারপেম্পসের জ্বলন্ত লাকড়িগুলো একটা বড় লোহার আংটা দিয়ে নাড়ছিলেন।

নানীমা হেম্পস্টকে দেখলাম চুলার ওপর থাকা একটা পাতিলের সামনে কাঠের চামচ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চামচটা মুখের কাছে নিয়ে ফুঁ দিয়ে সেটায় থাকা তরল পদার্থটা চেখে দেখলেন। এরপর পাশের বাটিতে রাখা নাম না জানা একটা উপকরণ দুই আঙুল দিয়ে নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন পাতিলের ভেতর। কিছুক্ষণ পর চুলোর জাল নিভিয়ে দিয়ে অবশেষে আমার দিকে নজর দিলেন তিনি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখলেন একবার। এতক্ষণ একটানা পানিতে ভেজার কারণে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে আমার সারা শরীর। ভেজা জামাকাপড় থেকে টপটপ করে পানি পড়ে মেঝেতে রীতিমত একটা ছোট পুকুরের সৃষ্টি হয়েছে।

“গরম পানি দিয়ে গোসল করতে হবে,” বললেন তিনি। “নাহলে ঠাণ্ডা লেগে মারা যাবে ও”।

“সেটা আমিও বলেছি,” লেটি বললো।

লেটির মা ইতিমধ্যে রান্নাঘরের টেবিলটার নিচ থেকে একটা বিশাল টিন বাথ (টিনের তৈরি বহনযোগ্য গোসল করার গামলা) বের করে সেটায় গরম পানি ঢালতে শুরু করেছেন। এরপর গরম পানির সাথে ঠাণ্ডা পানি মিশিয়ে তিনি বললেন যে গোসল করার জন্যে একদম ঠিক তাপমাত্রায় আছে পানি, আমি যাতে এখনই বসে পড়ি সেখানে।

“যাও যাও,” বললেন নানীমা হেম্পস্টক। “দেরি করো না”।

বিশ্রান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। আমাকে কি লেটিদের সামনেই কাপড় খুলতে হবে?

“আমরা তোমার জামাকাপড় ধুয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করবো,” বললেন লেটির মা। এরপর তিনি আমার কাছে এসে আমার ড্রেসিং গাউনটা এবং আমার হাত থেকে বিড়াল ছানাটাকে নিয়ে নিলেন। ওটা যে এখনও আমার হাতেই ছিল সেটা ভুলেই গেছিলাম।

যত দ্রুত সম্ভব আমি পাজামা আর গেঞ্জিটা খুলে ফেছিলাম। পাজামার নিচের অংশ ভিজে ছিড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। সেটাকে ঠিক করা যাবে বলে মনে হয় না। পানিতে আঙুল দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করে দেখে বসে পড়লাম টিন বাথে, ফায়ারপেম্পসের আগুনের ঠিক সামনে। এতক্ষণ অসাড়

হয়ে থাকা পায়ে অনুভূতি ফিরতে শুরু করলো গরম পানির ছোয়ায়। আমি জানি যে এভাবে অপরিচিত কারো সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বসে থাকাটা অভদ্রতা, কিন্তু হেম্পস্টকদের কোন ভ্রমক্ষেপই নেই সে ব্যাপারে। লেটি আমার গোল্টি, পায়জামা আর ড্রেসিং গাউন নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। মিসেস হেম্পস্টক টেবিল সাজাচ্ছেন। ছুরি, কাঁটাচামচ, মগ এসব বের করে রাখছেন পাশাপাশি।

নানীমা হেম্পস্টক আমার দিকে স্যুপ ভর্তি একটা মগ এগিয়ে দিলেন। “এটা খেয়ে নাও বাবু। ভেতরটাও উষ্ণ হয়ে উঠবে তাহলে”।

স্যুপটা অনেক ঘন আর সুস্বাদু মনে হলো আমার কাছে। বেশি গরমও না আবার ঠাণ্ডাও না। খাওয়া শেষ করে তার দিকে মগটা এগিয়ে দিলাম আমি। তার বদলে একটা সাবান আর ফ্রানেলের তৈরি মুখ ঘষার কাপড় এগিয়ে দিলেন আমার দিকে, বললেন, “পরিষ্কার হয়ে নাও। তাহলে উষ্ণতা আর প্রাণ ফিরে পাবে তোমার ছোট্ট শরীরটা”।

রকিং চেয়ারে বসে দুলতে লাগলেন তিনি, আমার দিকে চোখ দিচ্ছেন না।

এখন খুব নিরাপদ মনে হচ্ছে নিজেকে। নানীমা হেম্পস্টকের সাহচর্যে আরসালা মঙ্কটনকে মোটেও ভয় হচ্ছে না এখন আর। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে আছি আমি। যেখানে আমাকে ছুঁতেও পারবে না কোন বিপদ।

মিসেস হেম্পস্টক ওভেনের দরজা খুলে একটা পাই বের করে আনলেন। দেখে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড সুস্বাদু হবে ওটা। জানালার পাশে ঠাণ্ডা হবার জন্যে রেখে দিলেন পাইটা।

ওদের দেয়া একটা তোয়ালে দিয়ে গা মুছলাম, অবশ্য ফায়ারপেন্সের আগুনের উষ্ণতায় আরো আগেই শুকিয়ে গেছে পানি। এসময় লেটি ফিরে আসলো সাদা রঙের বিশাল একটা পোশাক নিয়ে। অনেকটা মেয়েদের নাইটড্রেসের মতন, কিন্তু সাদা তুলার তৈরি। হাতাগুলোও অনেক বড়। ওটা পড়বো কিনা এটা নিয়ে দ্বিধায় ভুগছি এই সময় চিনতে পারলাম পোশাকটা একটা নাইট গাউন। আমার কাছে বাচ্চাদের ছড়ার যে বইটা আছে সেখানে এটার ছবি দেখেছি। উই উইলি উইঙ্কি প্রতি রাতে শহরে এই পোশাক পড়েই দৌড়ে বেড়ায়।

ওটা গায়ে দিলাম আমি। একটু ঢোলা হয়েছে কিন্তু আরও লাগছে ভীষণ।

রাতের খাবারে যা খেলাম সেটার কথা কোনদিনই ভুলবো না। গরুর স্টেক, রোস্ট করা আলু (বাইরে দিয়ে মচমচে সোনালী, ভেতরে নরম আর

সাদা), এক ধরনের নাম না জানা সবজি আর সেদ্ধ গাজর (আমার কোন ধারণাই ছিল না গাজর এতটা সুস্বাদু হতে পারে, এরপর থেকে জীবনে আর কখনো সেদ্ধ গাজর পরিতৃপ্তি নিয়ে খেতে পারিনি)। ডেজার্ট হিসেবে খেলাম আপেল পাই (ভেতরে আপেলের পুর আর কাস্টার্ড ঠাসা)। যেমনটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও অনেক বেশি সুস্বাদু লাগলো ওটা।

বেড়াল ছানাটা আগুনের পাশে একটা কুশনের ওপর ঘুমোলো আমাদের খাবার শেষ হওয়া পর্যন্ত। এরপর ঘুম থেকে উঠে ওর চেয়ে চারগুণ বড় আরেকটা বেড়ালের সাথে মিলেমিশে উচ্ছিষ্ট খাবার খাওয়া শুরু করলো।

খাবার সময়টুকুতে আজকে আমার সাথে কি কি ঘটেছে এ সংক্রান্ত কোন কথা হলো না। তার বদলে হেম্পস্টকরা খামারের কাজ নিয়ে কথা বলতে লাগলো গোয়ালের দরজাটা ঠিক করতে হবে, রিয়ানন নামের একটা গরুর বাম পায়ের ব্যাথার যত্ন নিতে হবে, দুধ যেখানে রাখা হয় সেখানে হেঁটে যাবার পথটা পরিষ্কার করতে হবে।

“এখানে কি শুধুই আপনারা তিনজন?” জিজ্ঞেস করলাম। “কোন পুরুষ মানুষ নেই?”

“পুরুষ!” টিটকারির স্বরে বললেন নানীমা হেম্পস্টক, “কোন পুরুষ এখানে থাকলে কি লাভ হতো বলো দেখি? তারা এখানে যে কাজ করতো তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি কাজ আমি একাই করতে পারি”।

“এখানে পুরুষরাও আসে মাঝে মাঝে, আবার চলেও যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে শুধু আমরা তিনজনই,” বললো লেটি।

মিসেস হেম্পস্টকও সায় জানালেন, “পুরুষ হেম্পস্টকরা তাদের ভাগ্য অন্বেষণে বের হয়ে গেছে। ডাক আসলে তাদের থামানোর আর কোন উপায় থাকে না। একটা বিভ্রান্ত দৃষ্টি ভর করে চোখে। সুযোগ পাওয়া মাত্র অন্য শহর বা অন্য দেশে পাড়ি জমায়। কালেভদ্রে হঠাৎ হঠাৎ দু একটা পোস্টকার্ড এসে উপস্থিত হয়, মাঝে মাঝে সেটাও না”।

“ওর বাবা মা আসছে এখানে, গাড়িতে করে। পিয়ার্সনদের ডালিম গাছটা পার করেছে এইমাত্র। বেজিগুলো দেখেছে তাদের”।

“তিনি কি আছে তাদের সাথে?” জিজ্ঞেস করলাম। “আরসালা মস্টন?”

“তিনি?” নানীমা হেম্পস্টককে দেখে মনে হলো মজা পেয়েছেন আমার কথা শুনে। “বলো জিনিসটা। না, নেই সে তাদের সাথে এখন”।

কিছুক্ষণ ভেবে বললাম, “আমাকে জোর করে বাসায় নিয়ে যাবে ওরা। তখন জিনিসটা আমাকে চিলেকোঠায় বন্ধ করে রাখবে। এরপরে বাবা আমাকে

একসময় মেরে ফেলবে, যখন আরসালা মস্কটনের আমাকে একঘেয়ে লাগা শুরু হবে। এমনটাই বলেছিল আমাকে”।

“ওসব ছাইপাঁশ বলাই ওদের স্বভাব,” বললেন লেটির মা। “কিন্তু তোমার সাথে ওরকম কিছুই করতে পারবে না ও, নইলে আমার নাম জিনি হেম্পস্টক না”।

জিনি নামটা পছন্দ হলো আমার, কিন্তু তার কথা শুনে আশ্বস্ত হতে পারলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যে বাবা নিশ্চয়ই এখানেই আমার সাথে চিৎকার করা শুরু করবে। এরপর জোর করে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেখানেও চিৎকার করবে কিছুক্ষণ। আর একবার বাসায় পৌঁছানোর পর তো সবই শেষ হয়ে যাবে।

“কি করা যায়?” বললেন জিনি হেম্পস্টক। “তারা এখানে আসার আগেই উধাও হয়ে যেতে পারি আমরা। তারা এখানে এসে গত মঙ্গলবারের মত খালি পাবে সবকিছু”।

“প্রশ্নই ওঠে না,” নানীমা হেম্পস্টক বললেন। “শুধু শুধু জটিল হবে পরিস্থিতি। সময় নিয়ে খেলাটা কখনোই উচিৎ নয়, নেহায়েত বিপদে না পড়লে। আমরা ছেলেটাকে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করতে পারি যাতে ওকে খুঁজে না পায় ওরা”

অবাক হয়ে গেলাম আমি। এটা কি আদৌ সম্ভব? অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হবার বুদ্ধিটা খারাপ লাগছে না। বেড়াল ছানাটা খাওয়া শেষ করে আমার কোলে এসে উঠলো এ সময় (ওর চেয়ে চারগুণ বড় বেড়ালটার তুলনায় অনেক বেশি খেয়েছে ও)।

জিনি হেম্পস্টক উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন ভাবতে লাগলাম।

“ওকে কোন কিছুতে রূপান্তরিত করাটা উচিৎ হবে না,” বললো লেটি। “ওর বাবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে তখন আর সেটাতে ঐ ফালতু জিনিসটারই লাভ হবে। তাদের সেই মানসিক অবস্থার সুযোগ নেবে সে। তখন দেখা যাবে পুলিশ নিয়ে এসেছে ওর বাবা মা। তল্লাশি চালানোর নামে এখানে এসে সবকিছু তছনছ করবে তারা। এমনকি সাগরটারও ক্ষতি করতে পারে”।

বেড়াল ছানাটা আবার কুশনে উঠে গুটিগুটি মেরে গুয়ে ওর সাগরের মত চোখ নীল চোখজোড়া বুজলো। এখন ওটাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা কালো বল। ঘুমিয়ে পড়লো কিছুক্ষণের মধ্যে।

“তাহলে?” বললেন নানীমা হেম্পস্টক, “তুমি কি করতে চাচ্ছে?”

লেটি গম্বীর ভঙ্গিতে ভাবলো কিছুক্ষণ। “সুই সুতো দিয়ে কাজ করলে কেমন হয়?” জিজ্ঞেস করলো।

একবার নাক টানলেন নানীমা হেম্পস্টক, “তুমি অনেক ভালো একটা মেয়ে, কাজও ভালো শিখেছো,” বললেন তিনি। “কিন্তু সুই সুতোর কারবার... অতটা দক্ষ হওনি এখনও। একবার কাটার পর সেলাইয়ের দাগটা নিখুঁত ভাবে মুছে ফেলতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে আমার। আর কাটার পর ভেতর থেকে কিই বা বের করবে? জিনিসটা তো ওদের ভেতরে নেই। বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রন করছে”।

জিনি হেম্পস্টক ফিরে আসলেন এ সময়। আমার ড্রেসিং গাউনটা তার হাতে। “এটাকে ইস্ত্রি করেছি আমি,” বললেন তিনি। “তবুও কোণার দিক দিয়ে একটু ভেজা ভেজা আছে। সেলাই করার সময়ে ভেজা না থাকলেই ভালো হতো”।

ড্রেসিং গাউনটা টেবিলের ওপর রাখলেন তিনি, নানীমা হেম্পস্টকের সামনে। এরপর অ্যাপ্রনের সামনের পকেট থেকে একটা কালো পুরনো কেঁচি, একটা সুই আর এক একটা লাল সুতোর বাউল বের করলেন।

“রোয়ানবেরি আর তার লাল সুই-সুতোর ফোড়, কুৎসিত ডাইনি দেয় দৌড়,” একটা ছড়ার পঙক্তি আওড়ালাম। কোন বইয়ে যেন পড়েছিলাম। “সেটা অন্য সময় কাজ করতো,” বললো লেটি। “যদি সত্যিই কোন ডাইনি জড়িত থাকতো ব্যাপারটার সাথে”।

নানীমা হেম্পস্টক পরীক্ষা করে দেখছেন আমার ড্রেসিং গাউন। ফ্যাকাসে বাদামী হয়ে গেছে ওটা। কয়েক বছর আগে জন্মদিনে আমার দাদা দাদীর পক্ষ থেকে উপহার পেয়েছিলাম এটা। হাস্যকরভাবে বড় হয়েছিল আমার গায়ে। “হতে পারে...” আপনমনেই বললেন তিনি, “তোমার বাবা তোমাকে এখানে থাকতে দিলে রাজি হলেই সবচেয়ে ভালো হতো। কিন্তু সেটার জন্যে তোমার ওপর থেকে রাগ কমাতে হবে তার, চিন্তাও...”

কালো কেঁচিটা ইতিমধ্যে হাতে উঠে গেছে তার, কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এই সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ ভেসে এলো। জিনি হেম্পস্টক উঠে গেলেন দরজা খুলতে।

“তাদের সাথে যেতে চাই না আমি,” লেটির উদ্দেশ্যে বললাম।

“শশশশ,” ঠোঁটে হাত দিয়ে বললো ও। “নানীমা আর আমি কাজ করছি এখন। তুমি ঘুমানোর কথা ভাবো মনে মনে”।

এই মুহূর্তে শান্ত থাকা আর ঘুম - দু'টোর কোনটাই সম্ভব নয় আমার পক্ষে।
লেটি টেবিলের অন্যপাশ থেকে ঝুঁকে আমার হাত ধরলো, “চিন্তা করো না”।
ঠিক তখনই দরজা খুলে হুড়মুড় করে রান্নাঘরে প্রবেশ করলো বাবা আর মা।
“আমার ছেলের খোঁজ করছি আমরা,” বলছিলো বাবা। “আর আমাদের
ধারণা সে এখানেই আছে...”।

সে কথাটা শেষ করার আগেই বলে উঠলো মস। “এই তো ও! তুমি তো
আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে বাবা!”

“তোমার কপালে আজ খারাবি আছে,” বাবা বললো।

কালো কেঁচিটা দিয়ে শব্দ করে কেটেই চলেছেন নানীমা হেম্পস্টক, ছেড়া
কাপড়ের টুকরোগুলো টেবিল থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে।

এই সময় হঠাৎ জমে গেলো মা বাবা। কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল ওদের,
নড়াচড়াও। বাবার মুখ হা হয়ে আছে, মা দাঁড়িয়ে আছে এক পায়ে,
দোকানের ম্যানেকুইনগুলোর মত।

“কি... কি করেছো ওদেরকে?” লেটিকে জিজ্ঞেস করলাম। ব্যাপারটাতে
দুঃখ পাবো নাকি হাসবো সেটা নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি।

“কিছুই হয়নি তাদের, ঠিকই আছে,” জিনি হেম্পস্টক জবাব দিলেন, “শুধু
একটু কাটা-ছেড়া আর সেলাইয়ের কাজ চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক
হয়ে যাবে সবকিছু”। এরপর ড্রেসিং গাউন থেকে কাটা ছোট ছোট দু'টো
কাপড়ের টুকরোর দিকে দেখিয়ে বললেন, “ওটা হচ্ছে হলওয়ায়েতে তুমি আর
তোমার বাবা। আর এটা হচ্ছে বাথটাবটা। এগুলো তোমার বাবার ভেতর
থেকে বের করে আনা হয়েছে। এখন আর তোমার ওপর রাগ করে থাকার
কোন কারণ খুঁজে পাবেন না তিনি”।

তাদেরকে আমি বাথটাবের ঘটনার ব্যাপারে কিছুই বলিনি। তিনি কিভাবে
সেটা জানলেন বুঝতে পারলাম না, অবশ্য খুব একটা অবাকও হলাম না।

নানীমা হেম্পস্টকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সুইয়ের ফুটোয় লাল সুতোটা
টোকাচ্ছেন তিনি। একবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, “আগের মত পরিষ্কার
দেখি না আজকাল”। এরপর সুতোর ডগাটা একবার ছোট্ট নিয়ে তেমন
কোন ঝামেলা ছাড়াই ঢুকিয়ে দিলেন সুইয়ের ফুটোর মধ্যে।

“লেটি, আমাদের জানা দরকার ওর টুথব্রাশটা কি রঙের,” নানীমা হেম্পস্টক
বললেন। এখন ড্রেসিং গাউনটা সাবধানে সেলাই করতে ব্যস্ত তিনি।

“তোমার টুথব্রাশটা কি রঙের?” জিজ্ঞেস করলো লেটি। “তাড়াতাড়ি
বলো”।

“সবুজ,” বললাম, “হালকা সবুজ। অনেকটা কাঁচা আপেলের মত। আমার মতনই ছোট সবুজ ব্রাশটা,” বর্ণনাটা যে খুব ভালো হলো না তা জানা আছে আমার। সেটার চেহারা মনে করার চেষ্টা করলাম। এমন কিছু কি আছে যেটা অন্য ব্রাশ থেকে আলাদা করে আমারটাকে? কিছু পেলাম না। সিন্ধের ওপর রাখা লাল-সাদা হোল্ডারের অন্য ব্রাশগুলোর থেকে আকারেই যা একটু ছোট ওটা।

“বুঝতে পেরেছি!” লেটি বললো। “ধন্যবাদ”।

“কাজ শেষ প্রায়,” বললেন নানীমা হেম্পস্টক।

বড় করে একটা হাসি দিলেন জিনি হেম্পস্টক। তার গোলগাল মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। নানীমা হেম্পস্টক শেষবারের মত কেঁচিটা হাতে নিয়ে লাল সুতোর বেরিয়ে থাকা অংশটুকু কেটে দিলেন।

আমার মা’র উঁচু হয়ে থাকা পা মাটিতে নেমে আসলো। আচমকা যেন থেমে গেলো সে।

বাবা বললো, “তাহলে... কি যেন বলছিলাম”।

“... আর আমার মেয়ে লেটির সাথে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে আপনার ছেলের। আজ রাতটা এখানেই থেকে যেতে পারে ও, আমরা খুবই খুশী হবো তাহলে,” জিনি হেম্পস্টক বললেন। “যদিও আমাদের বাসাটা একটু পুরনো ধাঁচের”।

“একটু পুরনো ধাঁচের বাসাই ভালো লাগে আমার,” বললেন নানীমা হেম্পস্টক। “থেকে আরাম”।

“রাতের খাবারও ভালোই খেয়েছে ও,” আমার দিকে তাকিয়ে বললেন লেটির মা। “তাই না?”

“ডেজার্ট হিসেবে আপেলের পাই খেয়েছি আমরা,” বাবা মা’কে বললাম।

ভ্রম কুঁচকে গেলো বাবার। দেখে বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে তাকে। এরপর তার কোটের পকেটে হাত দিয়ে একটা লম্বা সবুজ রঙের টুথব্রাশ বের করে আনলো, “তোমার ব্রাশটা বাসাতেই ফেলে এসেছিলে”।

“এখনও সময় আছে, সিদ্ধান্ত নাও আসলেও থাকবে কিনা,” মা বললো আমাকে। এরপর জিনি হেম্পস্টকের দিকে তাকিয়ে বললো, “একবার কোভাকদের বাসায় রাতে থাকতে গেছিলো। মাঝরাতে আমাদের গিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে পরে”।

ক্রিস্টোফার কোভাক আমাদের চেয়ে দুই বছরের বড়। সে আর তার মা আমাদের গলিতে ঢোকার মুখে যে বাড়িটা পড়ে সেটায় থাকে, সবুজ পানির

ট্যাক্সিটার পাশে। ওর মা খুব মজার মানুষ, একটা ভণ্ডওয়ান গাড়ি আছে তার। স্বামীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে কয়েক বেশ আগে। ক্রিস্টোফার পুফিন ক্লাবের সদস্য, ওর কাছে এমন অনেক বই আছে যেগুলো পড়া নেই আমার। কিন্তু পুফিনের বইগুলো কখনো ধার দেয় না ও, পড়তে হলে ওদের বাসায় গিয়ে পড়তে হবে।

একমাত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও একটা দোতলা খাট আছে ক্রিস্টোফারের বেডরুমে। যে রাতে ওদের বাসায় থাকার কথা ছিল, আমাকে নিচের খাটে শুতে বলেছিল ও। ওর মা আমাদের দু'জনকে শুভরাত্রি বলে চলে যাবার কিছুক্ষণ পর একটা পানির পিস্তল বের করে আমাকে ভিজিয়ে দিতে শুরু করে ও। একদম হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম আমি, ওকে ভদ্র বলেই জানতাম। “এবার ক্রিস্টোফারদের বাসার মত কিছু হবে না,” মা’কে বললাম। “এখানে থাকতে ভালো লাগে আমার”।

“তুমি কি পরে আছো এটা?” মা আমার নাইট গাউনটার দিকে তাকিয়ে বললো।

“পানিতে পড়ে গেছিলো বেচারি,” জিনি হেম্পস্টক বললেন। “ওর পায়জামা আর গেঞ্জি শুকাতে দিয়েছি”।

“ওহ!,” মা বললো। “বেশ তাহলে, শুভরাত্রি বাবা। নতুন বন্ধুর সাথে মজা করো। বেশি জ্বালাতন করো না আবার”। এরপর লেটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “তোমার নাম কি মা?”

“লেটি,” জবাব দিলো ও।

“এটা কি লেটিটিয়া সংক্ষিপ্ত রূপ?” জিজ্ঞেস করলো মা। “ইউনিভার্সিটিতে লেটিটিয়া নামের আমার এক বান্ধবী ছিল। সবাই অবশ্য ‘লেটুস’ বলে ডাকতো ওকে”।

কিছু না বলে শুধু হাসলো লেটি।

বাবা সবুজ টুথব্রাশটা আমার সামনে টেবিলের ওপর রেখে দিলো। একদম আমার সবুজ ব্রাশটার মতই দেখাচ্ছে এটাকে। কোটের নিচে একটা শাট পরে আছে বাবা, টাইটা নেই।

“ধন্যবাদ, বাবা,” বললাম।

“তাহলে,” মা বললো। “কাল সকালে কখন নিতে আসবে তোমাকে?”

জিনি হেম্পস্টকের আগের চেয়ে বড় একটা হাসি দিলেন। এবার, “সে নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। সকালবেলাটা এখানেই খেলুক নাহয়। লেটি গিয়ে পরে দিয়ে আসবে ওকে। একটু দাঁড়ান, এটুকু বলে রান্নাঘরের

তাকটার সামনে গিয়ে কিছু বিস্কুট একটা কাগজের প্যাকেটে ভরলেন তিনি। “বিকেলেই বিস্কুট বানিয়েছিলাম আমি,” মা’র দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললেন।

হাসিমুখে সেটা হাতে নিলেন মা। এরপর জিনি হেম্পস্টক তাদের বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলেন। গাড়ির শব্দ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত শ্বাস ধরে রাখলাম।

“তাদের সাথে কি করেছিলেন আপনারা?” জিজ্ঞেস করলাম। “এটা কি আসলেও আমার ব্রাশ?”

“সুঁই সুতোর খুব ভালো একটা কাজ এটা,” আমার ড্রেসিং গাউনটা দু’হাত দিয়ে তুলে ধরে সম্ভ্রষ্ট গলায় বললেন নানীমা হেম্পস্টক। আমি দেখতে পেলাম না যে কোথা থেকে কাপড় কেটে আবার জোড়া লাগানো হয়েছে। সেলাইয়ের কোন দাগ দেখা যাচ্ছে না। কাপড়ের একটা টুকরো টেবিলের ওপর দিয়ে আমার দিকে ঠেলে দিলেন তিনি। বললেন, “এটা হচ্ছে তোমার আজকের বিকেল। ইচ্ছে করলে রাখতে পারো। তবে আমি হলে পুড়িয়ে দিতাম”।

জানালায় কাঁচে বৃষ্টির ফোটা পড়ার শব্দ কানে এলো। বাতাসে কাঁপছে জানালাগুলো।

কাপড়ের টুকরোটা তুলে নিলাম। এখনও ভেজা ওটা। উঠে দাঁড়িয়ে ফায়ারপেপারের কাছে হেঁটে গেলাম। বিড়াল ছানাটার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। ছায়ার মধ্যে কোথায় যেন পালালো সে।

“আমি যদি এটা পুড়িয়ে ফেলি,” জিজ্ঞেস করলাম তাদের, “তাহলে কি আজ বিকালে যা ঘটেছিল সব আমার আর বাবার স্মৃতি থেকে চলে যাবে?” এখন আর হাসছেন না জিনি হেম্পস্টক, বরং চিন্তিত মনে হচ্ছে তাকে, “তুমি কি চাও?” জিজ্ঞেস করলেন।

“আমি মনে রাখতে চাই,” জবাব দিলাম। “কারণ ঘটনাটা আসলেই ঘটেছে আমার সাথে। কিন্তু সেটার কোন প্রভাব পড়বে না আমার জীবনে, পড়তে দেবো না আমি”। কাপড়ের টুকরোটা আগুনে ফেলে দিলাম।

সাথে সাথে ধোঁয়া উঠতে শুরু করলো।

পানির নিচে আমি। শব্দ করে কামড়ে ধরে আমি বাবার টাই। আমি ভাবছিলাম যে আমাকে হয়তো মেরেই ফেলবেন তিনি...

চিৎকার করে উঠলাম।

হেম্পস্টকদের রান্নাঘরের মেঝেতে শুয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম। পা জ্বলছে ভীষণ, মনে হচ্ছে যেন জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে হেঁটেছি কেবলই। অসহ্য যন্ত্রনা হচ্ছে। আরেক জায়গায় ব্যাথা করছে ভীষণ। বুকের বামপাশে, তবে অতটা তীব্র না ওটা।

আমার পাশে এসে বসলেন জিনি হেম্পস্টক, “কি হয়েছে?”

“আমার পা। মনে হচ্ছে যেন আগুন ধরে গেছে”।

ওটা পরীক্ষা করলেন তিনি। এরপর গোড়ালির যে গর্ত থেকে কেঁচোটা বের করেছিলাম দু’দিন আগে, সেটা ছুঁলেন। ‘হিসস’ করে একটা আওয়াজ হলো। ব্যাথা কমতে শুরু করলো সাথে সাথে।

“এরকম কিছু তো দেখিনি আগে,” বললেন তিনি। “কিভাবে হলো এটা?”

“একটা কেঁচো ঢুকে গেছিলো গর্তটায়,” তাকে বললাম। “কমলা আকাশের নিচের জায়গাটা থেকে এভাবেই আমাদের এখানে এসেছে ঐ জঘন্য জিনিসটা। আমার পায়ের মধ্যে দিয়ে”। লেটির দিকে তাকালাম। আমার পাশে বসে ডানহাতটা ধরে আছে ও এখন, “আমি দুঃখিত। আমার কারণেই ওটা এসেছে এখানে”।

এসময় নানীমা হেম্পস্টক এসে বসলেন আমার পায়ের কাছে। আমার গোড়ালিটা আলোয় নিয়ে দেখতে লাগলেন। “জঘন্য,” বললেন, “আর ভীষণ চালাক। গর্তটা রেখে দিয়েছে তোমার পায়ের। যাতে পরবর্তীতে ব্যবহার করতে পারে। তোমার ভেতরে লুকিয়ে থাকতে পারবে জিনিসটা। এজন্যেই তোমাকে চিলেকোঠায় বন্দি করে রাখতে চেয়েছিলো। সময় থাকতে থাকতে এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের,” গর্তটা আঙুল দিয়ে নাড়তে লাগলেন তিনি। এখনও ব্যাথা করছে, তবে আগের মত না। মাথা ব্যাথা হলে যেমন দপদপ করে, আমার পায়ের ভেতরেও তেমনটাও অনুভূত হচ্ছে এখন।

কিছু একটা নড়ে উঠলো আমার বুকে, প্রজাপতির পাখার মত। এরপর স্থির হয়ে গেলো।

“সাহস আছে তো তোমার?” জিজ্ঞেস করলেন নানীমা হেম্পস্টক। সেটা জানা নেই আমার। মনে হয় না আছে। আজকে সকাল থেকে শুরু করে কেবলই পালিয়ে বেড়িয়েছি আমি।

যে সুইচটা দিয়ে আমার ড্রেসিং গাউনটা সেলাই করেছিলেন সেটা তুলে নিলেন নানীমা হেম্পস্টক। কিন্তু এবার মুঠো করে ধরেছেন ওটা, যেন খোঁচা দেবেন আমাকে।

পা সরিয়ে নিলাম, “কি করবেন আপনি?”

লেটি আমার হাতে আলতো করে চাপ দিয়ে বললো, “গর্তটা তোমার পা থেকে সরিয়ে ফেলবে নানীমা। তোমার দেখার দরকার নেই ওদিকে”।

“ব্যথা লাগবে,” বললাম।

“মোটোও না,” বললেন নানীমা হেম্পস্টক। আমার পা তার কোলে উঠিয়ে নিলেন। এরপর সুই বসিয়ে দিলেন গোড়ালিতে। কিন্তু কিছু অনুভব করলাম না। গর্তটার ভেতরে ঢুকে গেছে সুই।

ব্যথা করছে না একটুও।

সুইটা মোচড়ালেন গর্তের ভেতর, এরপর বের করে আনলেন। অবাক হয়ে সেটার মাথায় কিছু একটা লেগে থাকতে দেখলাম। প্রথমে মনে হলো কালো, এরপর ধূসর, শেষে পারদের মত চকচকে।

টের পেলাম যে আমার পায়ের ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে জিনিসটা। তবে পায়ের মধ্যে দিয়ে অনেক গভীরে পৌঁছে গেছিলো কেঁচোটা। গোড়ালি থেকে হাটু হয়ে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত। স্বস্তির সাথে অনুভব করলাম যে বের হয়ে যাচ্ছে ওটা। ব্যথা কমে আসলো, সেই সাথে ভয়টাও।

নানীমা হেম্পস্টককে দেখলাম জিনিসটা পেঁচিয়ে বের করে আনছেন, কিন্তু কি ঘটছে সেটা বোধগম্য হচ্ছে না মোটেও। ওটাকে দেখে মনে হচ্ছে দু’ফুট লম্বা একটা স্বচ্ছ খোলস। কেঁচোটা থেকে বেশ চিকন।

কিছুক্ষণ পর পেঁচানো বন্ধ করলেন তিনি, বললেন, “বের হতে চাইছে না। আঁকড়ে ধরে আছে”।

শীতল একটা অনুভূতি হল আমার হৃৎপিণ্ডের আশেপাশে। যেন কেউ একটা বরফের টুকরো চেপে ধরেছে। এই সময় দক্ষ হাতে নাড়া দিয়ে ভেতর থেকে পুরো জিনিসটা বের করে আনলেন নানীমা হেম্পস্টক।

আমার গোড়ালিটা ছেড়ে দিলেন তিনি। গর্তটা উধাও হয়ে গেছে সেখান থেকে, যেন কখনোই অস্তিত্ব ছিল না সেটার।

“নিজেকে খুব চালাক মনে করে,” হেসে বললেন নানীমা হেম্পস্টক। “ছেলেটার পায়ের ভেতরে বাসা বেধেছিল”।

কোথেকে যেন একটা খালি জ্যামের বয়াম উদ্‌য় হলো জিনি হেম্পস্টকের হাতে। নানীমা হেম্পস্টক সুইয়ের মাথা থেকে বুলন্ত জিনিসটা ওটার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে দিলেন।

“এবার মজা বুঝবে!” বললেন তিনি।

“আমি দেখতে পারি?” লেটি জিজ্ঞেস করলো। জ্যামের বয়ামটা হাতে নিয়ে আলোর সামনে ধরলো। ভেতরে প্যাঁচ খুলে শিথিল হতে শুরু করেছে জিনিসটা। ওটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ভাসছে পানির ভেতরে। একেক সময় একেক রঙ খেলা করেছে ওটার গায়ে। একবার কালো আবার পরমুহূর্তেই রূপালী।

একটা বইয়ে পড়েছিলাম যে ডিমের গায়ে মোমের কালি মেখে সেটাকে একটা স্বচ্ছ পাত্রের ভেতরে লোনা পানির মধ্যে ছেড়ে দিলে ভেসে থাকবে ওটা। আর সেটার রঙ দেখাবে রূপালী। তবে সেই রূপালী রঙটা হবে কৃত্রিম। আলোর একটা খেলা মাত্র। এই জিনিসটাকেও সেরকমই লাগছে। লেটির চেহারা দেখে মনে হল প্রচণ্ড অবাক হয়েছে। “ঠিক বলেছো তুমি, নানীমা। ওর ভেতরে বাসা বানিয়ে রেখেছিল জিনিসটা। এজন্যেই আটকে রাখতে চেয়েছিল বাসার ভেতরে। দরকার পড়লে এটা দিয়েই আবার ফিরে যেতো যেখান থেকে এসেছিলো”।

“আমি দুগ্ধখিত যে সেদিন তোমার হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম,” লেটিকে বললাম।

“আহ! চুপ করো তো,” লেটি বললো। “এতবার ‘দুগ্ধখিত’ শব্দটা শুনতে ভালো লাগছে না আমার। পরের বার আমার হাত ধরে রাখবে শক্ত করে, ছাড়বে না মোটেও। জিনিসটা আমাদের সাথে যা-ই করুক না কেন”। মাথা নাড়লাম। বুকের ভেতর বরফটা গলতে শুরু করেছে যেন। আবার নিরাপদ মনে হচ্ছে নিজেকে।

“তাহলে,” বললেন জিনি হেম্পস্টক। “ওটার ফিরে যাবার পথটা এখন আমাদের কাছে। আর ছেলেটাও নিরাপদে আছে। একদিনের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে”।

“কিন্তু ওর বাবা মা আর বোন তো এখনও জিনিসটার কজায়,” নানীমা হেম্পস্টক বললেন। “জিনিসটাকে ওভাবে পাখির মত মুক্ত অবস্থায় থাকতে দেয়া যাবে না। গতবার কি হয়েছিল মনে আছে? এসব উটকো ঝামেলার পেছন পেছন আরো বড় ঝামেলা এসে হাজির হয়”।

“সে ব্যাপারে কালকে ব্যবস্থা নিলেও চলবে,” বললেন লেটির মা। “লেটি, ওকে একটা ঘরে নিয়ে গুইয়ে দাও এখন। সারাদিন অনেক ধকল গেছে বেচারার ওপর দিয়ে”।

কালো বেড়ালছানাটাকে রকিং চেয়ারের ওপর গুইয়ে থাকতে দেখলাম।

“ওকে কি সাথে নিতে পারি আমি?” জিজ্ঞেস করলাম।

“না নিলে,” লেটি বললো, “কিছুক্ষণ পর নিজেই এসে হাজির হবে”।

দু’টো লম্বা লম্বা মোমবাতি বের করলেন জিনি হেম্পস্টক। দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে জ্বাললেন প্রথম মোমবাতিটা, এরপর ওটা দিয়ে দ্বিতীয়টা। লেটির হাতে একটা আর আমার হাতে আরেকটা মোম দিলেন তিনি।

“এখানে কি বিদ্যুৎ নেই?” জিজ্ঞেস করলাম। রান্নাঘরে বিদ্যুৎ আছে, বাল্ব জ্বলতে দেখেছি আমি, পুরনো আমলের ঢাউস একটা বাল্ব। ভেতরে টাংস্টেনের ফিলামেন্ট।

“বাড়ির এই অংশে নেই,” লেটি বললো। “রান্নাঘরটা তুলনামূলক নতুন। এক হাত মোমের আগুনের সামনে ধরে রাখো। নাহলে নিভে যাবে হাঁটতে হাঁটতে”।

নিজের হাতের মোমটার আগুনের সামনে হাত দিয়ে রেখেছে ও। আমিও তাই করলাম দেখাদেখি। পেছন পেছন হাঁটতে লাগলাম ওর। কালো বেড়ালছানাটা আসছে আমাদের পিছু পিছু। ধীরে ধীরে খামার বাড়িটার গভীরে যেতে লাগলাম আমরা।

ভেতরটা একদম অন্ধকার। আমাদের হাতের মোমের আলোয় বিশাল বিশাল ছায়া সৃষ্টি হচ্ছে দেয়ালে। মনে হচ্ছে যেন সবকিছু চলছে আমাদের সাথে। একটা বিশাল ঘড়ি পাশ কাটিয়ে আসলাম আমরা। আমার চেয়েও লম্বা ঘড়িটা। ওটার পাশের দেয়ালে সারি সারি পশুপাখির মাথা। আগেকার আমলে শিকার করা পশুপাখির মাথা এভাবে সাজিয়ে রাখা হতো। (আমার মনের ভুল? নাকি হরিণটার মাথা নড়ে উঠলো আমরা পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়?)। টেবিল আর চেয়ারগুলোও নড়ছে বলে মনে হলো। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম আমরা। একটা জানালা পার করে আসলাম উঠতে উঠতে।

সেখান থেকে চাঁদের আলো এসে পড়ছে সিঁড়িতে, আমাদের মোমের আলোর চেয়ে ঔজ্জ্বল্য অনেক বেশি সে আলোর। জানালার ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ চোখে পড়লো আমার। আকাশ একদম পরিষ্কার, তারাগুলো জ্বলছে মিটিমিটি করে।

“চাঁদ,” বললাম আমি।

“নানীমার এরকম চাঁদই পছন্দ,”।

“কিন্তু কালকেই তো একদম ছোট বাঁকা চাঁদ দেখেছিলাম। আর আজকেই পূর্ণিমা এসে গেছে! বৃষ্টিও তো হচ্ছিল! রান্নাঘরে বৃষ্টির শব্দ শুনেছি আমি”।

“বাড়ির এপাশটাতে পূর্ণিমা দেখতে ভালো লাগে নানীমার। তাহলে নাকি শান্ত হয় তার মন, ছোটবেলার কথা মনে পড়ে,” লেটি বললো। “আর চাঁদের আলোয় সিঁড়িতে হোঁচটও খাবে না”।

বেড়াল ছানাটা ছোট্ট ছোট্ট পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, দেখে মজা লাগলো আমার।

বাসার একদম ওপরতলায় লেটির ঘর। সেটার পাশের ঘরটাতে প্রবেশ করলাম আমরা। আগুন জ্বলছে ঘরটার ফায়ারপেপ্সে। সেটার কমলা আভা ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। ভেতরটা একদম উষ্ণ হয়ে আছে। মাঝের বিছানাটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাকে। এরকম উঁচু বিছানা শুধু সিনেমা আর কার্টুনেই দেখেছি আমি।

“সকালে যা গায়ে দেবে সেটা তৈরিই আছে,” লেটি বললো। “আমি পাশের ঘরেই ঘুমোবো। কিছু দরকার হলে শুধু ডাক দেবে। নানীমা বলে দিয়েছে তোমাকে ভেতরের বাথরুমটা ব্যবহার করতে, কিন্তু সেটা অনেক দূরে, রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে পারো তুমি। যদি দরকার পড়ে সে জন্যে বিছানার নিচে একটা টয়লেট পট রাখা আছে”।

ফুঁ দিয়ে হাতের মোমটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় উঠে পড়লাম। ঘরটা উষ্ণ হলেও চাদরটা ঠাণ্ডা। বিছানাটা মৃদু ঝাঁকি খেয়ে উঠলো এ সময়। পরক্ষণেই একটা লোমশ পায়ের উপস্থিতি টের পেলাম আমার পেটের ওপর। সেখান থেকে আমার বালিশের পাশে এসে ঘুমিয়ে পড়লো বেড়াল ছানাটা।

এখনও আমার বাসা থেকে দূর হয়নি দানবটা। আজ সন্ধ্যায় আমার বাবা আমাকে পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে, যদিও সেই স্মৃতিটুকু বের করে নেয়া হয়েছে তার ভেতর থেকে। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে মাইলের পর মাইল দৌড়েছি আমি। বাবাকে দেখেছি আরসাল মস্কটন নামের জিনিসটাকে চুমু খেতে। ভয় এখনও পুরোপুরি দূর হয়নি আমার ভেতর থেকে।

এই মুহূর্তে একটা বেড়াল ছানা শুয়ে ঘুমিয়েছে আমার বালিশের পাশে। ছোট্ট দেহটা কাঁপছে নিঃশ্বাসের তালে তালে। আমার চোখেও নেমে আসলো রাজ্যের ঘুম।

সে রাতে অদ্ভুত কিছু স্বপ্ন দেখলাম হেম্পস্টকদের খামারে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে দেখি চারদিক অন্ধকার। স্বপ্নে এতটাই ভয়াবহ কিছু দেখেছি যে জেগে উঠতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু শত চেষ্টা করেও মনে করতে পারলাম না কি নিয়ে ছিল স্বপ্নটা। কিন্তু এখনও আমার স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে স্বপ্নটা।

বাবা মা'র কথা মনে পড়ছে খুব, সেই সাথে আমার বেডরুমটার কথা। মাত্র এক মাইল দূরেই আছে ওগুলো। আমার জীবন থেকে যদি গতকালটা মুছে ফেলা যেতো! এর আগ পর্যন্ত তো সব ঠিকই ছিল।

আবার মনে করার চেষ্টা করলাম স্বপ্নটার কথা, কিন্তু লাভ হলো না। বিশ্বাসঘাতকতা ছিল স্বপ্নটাতে, আর ছিল অপূরণীয় ক্ষতি, এটুকু অনুভব করতে পারছি। স্বপ্নটা এতই ভীত করে তুলেছে আমাকে যে আবার ঘুমোতে ভয় পাচ্ছি। ফায়ারপেন্সসের আগুন নিভে এসেছে প্রায়, শুধু কিছু নিভু নিভু কয়লা লাল আভা ছড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ আগেও যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিল সেটার প্রমাণ এই আভা।

বিছানা থেকে নেমে নিচ থেকে চিনামাটির তৈরি টয়লেট পটটা বের করে হালকা হয়ে নিলাম। এরপর জানালার কাছে গিয়ে নজর দিলাম বাইরে। পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যাচ্ছে আকাশে, তবে এখন ওটা আরো নিচে নেমে এসেছে। চাঁদটাকে কমলা দেখাচ্ছে, যেমনটা দেখায় শরৎকালে, ফসল ঘরে তোলার সময়। কিন্তু এখন তো বসন্তকাল!

সেই কমলা চাঁদের আলোয় একজন বয়স্ক মহিলাকে দেখলাম আমি মোটামুটি নিশ্চিত ওটা নানীমা হেম্পস্টক, কিন্তু চেহারা দেখা যাচ্ছে না পরিষ্কার ভাবে। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে পায়চারি করছেন। তাকে দেখে প্যারেডের সৈন্যদের কথা মনে হলো আমার। একবার লন্ডন ভ্রমণে গিয়ে বাকিংহাম প্যালেসে সৈন্যদের প্যারেড দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তারাও ঠিক একই ভাবে পায়চারি করেছিলো, শুধু লাঠির জায়গায় বন্দুক ছিল তাদের হাতে।

তাকে দেখে কিছুটা শান্ত হল আমার মন।

অন্ধকারেই বিছানায় ফিরে গিয়ে বালিশে মাথা রাখলাম আবার। ভেবেছিলাম আর ঘুম আসবে না, কিন্তু জোর করে একবার চোখ বন্ধ করতেই সকাল হয়ে গেলো।

বিছানার পাশে চেয়ারে জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখা আছে। এগুলো কখনো আগে দেখিনি আমি। দুই জগ পানিও রাখা আছে। একটা গরম, একটা ঠাণ্ডা। আর সেগুলোর পাশে একটা কাঠের টেবিলে ছোট একটা বেসিন। বেড়াল ছানাটা আমার পায়ের কাছে ঘুমিয়ে ছিল। নাড়াচাড়ায় ঘুম ভেঙে গেলো ওর। নীলাভ-সবুজ চোখজোড়া দিয়ে বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। জোরে একবার ‘মিয়াও’ বলে ডাক দিলো, যেন ‘শুভ সকাল’ জানাচ্ছে। ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে গেলাম।

গরম পানি আর ঠাণ্ডা পানি মিশিয়ে বেসিনে হাত মুখ ধুলাম। ঠাণ্ডা পানি দিয়েই কুলি করলাম কয়েকবার। কোন টুথপেস্ট চোখে পড়লো না, কিন্তু একটা ছোট গোল কৌটো দেখলাম। সেটার গায়ে লেখা ‘মার্ক মেল্টন’স টুথ পাউডার’, অনেকটা পুরনো দিনে যেভাবে লেখা হতো, সেভাবে। ওখান থেকে পাউডার নিয়েই দাঁত ব্রাশ করলাম আমার সবুজ টুথব্রাশটা দিয়ে।

জামাকাপড়গুলোর দিকে নজর দিলাম এবার। এরকম কিছু আগে গায়ে দেখিনি আমি। একটা সাদা শার্ট (সেটা আবার পেছন দিকে লেজের মত লম্বা হয়ে নেমে গেছে), খয়েরী রঙের একটা হাঁটু অবধি ট্রাউজার, একজোড়া সাদা লম্বা মোজা আর বাদামী একটা জ্যাকেট (চডুই পাখির লেজের আকৃতিতে পেছনের দিকটা কাটা)। যতটা সাবধানে সম্ভব, গায়ে চাপালাম ওগুলো। বোতাম আর ফিতের বদলে চেইন থাকলে ভালো হতো।

মেঝেতে যে জুতোজোড়া রাখা সেটার সামনে রূপালী রঙের ক্ল্যাম্প লাগানো দেখলাম। কিন্তু আমার পায়ে হলো না ওগুলো। তাই সাদা মোজা পরেই বের হয়ে আসলাম ঘর থেকে, বেড়ালছানাটা আসতে লাগলো আমার পিছু পিছু।

গত রাতে এই ঘরটাতে আসার সময় সিঁড়ির ওপরে পৌঁছে বামে মোড় নিয়েছিলাম। এবার ডান দিকে ঘুরে লেটির ঘরটা পার হয়ে আসলাম (দরজা খোলা, ভেতরে কেউ নেই)। সিঁড়িটা খুঁজছি আমি, কিন্তু পেলাম না। করিডোরের শেষ মাথায় একটা সাদা দেয়াল। সেখানকার জানালা দিয়ে বাইরে মাঠ আর গাছপালা দেখা যাচ্ছে।

নীলাভ-সবুজ চোখের কালো বেড়ালছানাটা আবার ডেকে উঠলো এই সময়, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে। এরপরে উঠে ঘুরে লেজ উঁচিয়ে হাঁটতে লাগলো। আমাকে হলওয়ার শেষপ্রান্তে একটা করিডোরে নিয়ে আসলো, যেটা আগে চোখে পড়েনি আমার। এখান থেকে নিচে নেমে গেছে একটা

সিঁড়ি। গুটি গুটি পায়ে নিচে নামতে লাগলো ও, টেনিস বলের মত পুরো শরীর দুলে উঠছে প্রতিটা ধাপ নামার পরপর।

সিঁড়ির নিচে জিনি হেম্পস্টক অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্যে। “বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুমালে দেখছি,” বললেন তিনি। “দুখ দোয়ানো হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তোমার নাস্তা টেবিলে সাজানো আছে আর তোমার ছোট্ট বন্ধুটার খাবার ফায়ারপেন্সসের পাশে সসপ্যানে রেখে দিয়েছি”।

“লেটি কোথায় মিসেস হেম্পস্টক?”

“একটু বাইরে গেছে, কিছু দরকারী জিনিস আনতে। তোমাদের বাসায় যে জিনিসটা আস্তানা গেড়েছে সেটাকে ফেরত পাঠাতেই হবে, নাহলে সামনে বিপদ আরও বাড়বে। লেটি একবার ওটাকে আটকানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু ছাড়া পেয়ে গেছে জিনিসটা। তাই এবার ওকে জিনিসটাকে ফেরত পাঠাতেই হবে”।

“আমি চাই যে আরসালা মঙ্কটন আমাদের জীবন থেকে চলে যাক,” বললাম। “তাকে মোটেও পছন্দ না আমার”।

আমার জ্যাকেটে একবার হাত বোলালেন জিনি হেম্পস্টক, বললেন, “এখন আর এরকম পোশাক পরে না কেউ। কিন্তু মা এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যাতে তুমি এটা বাইরে বের হলে কেউ কিছু সন্দেহ না করে। জুতো পরোনি?”

“বড় হয়েছে ওগুলো”।

“আমি তাহলে পেছনের দরজার সামনে তোমার পায়ের মাপের কিছু একটা রেখে দেবো”।

“ধন্যবাদ”।

“জিনিসটাকে যে আমি ঠিক ঘৃণা করি তা নয়। ওটার স্বভাবই অমন। এতদিন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল, কিন্তু কেউ জাগিয়ে দিয়েছে। এখন সবাইকে তাদের চাহিদার জিনিস দিতে চাচ্ছে সে”।

খেয়াল করলাম যে জিনিসটাকে ‘সে’ বলে উল্লেখ করলেন জিনি হেম্পস্টক। বললাম, “আমাকে এখনও কিছু দেয়নি ওটা, বরং চিরকোঠায় বন্দি করে রাখতে চেয়েছে”।

“কারণ তোমার মাধ্যমেই এখানে এসেছে ওটা। এরকম একটা জিনিসের আগমনী দ্বার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়াটা খুবই বিপজ্জনক,” আঙ্গুল দিয়ে আমার বুকের ওপর হালকা একটা টোকা দিয়ে বললেন তিনি। “আগের আবাসস্থলেই ভালো ছিল জিনিসটা। এর আগে অনেক বার এরকম অনেক

জিনিসকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি আমরা। কিন্তু এবারেরটা বেশি শক্তিশালী। দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত। তোমার নাস্তা দেয়া আছে টেবিলে, কিছু লাগলে আমাকে বলো। বাইরে মাঠেই থাকবো আমি”।

তার কথাগুলো অনেকটা হেঁয়ালির মত মনে হলো আমার কাছে।

রান্নাঘরের টেবিলে একটা বাটিতে পরিজ আর ওটার পাশে সসারে সোনালী রঙের হানিকম্ব দেখতে পেলাম। দুধের ক্রিম ভর্তি একটা জগ রাখা পাশে।

টোস্টও দেখতে পেলাম। আমার বাবা যেভাবে ঘিলের সাহায্যে রুটি টোস্ট করে, সেভাবেই টোস্ট করা ওগুলো। সাথে বাসায় বানানো বুবেরি জ্যাম।

জীবনের সেরা চাটা এদিনই খেলাম। ফায়ারপেন্সসের পাশে বসে সসপ্যান থেকে দুধ খাচ্ছে আর খুশিতে মুখ দিয়ে আওয়াজ করছে বেড়ালছানাটা।

সেটা ঘরের এপাশ থেকেও শুনতে পাচ্ছি আমি।

আমিও ওটার মত ওরকম আওয়াজ করতে পারলে ভালো হতো!

একটা বাজারের ব্যাগ নিয়ে ভেতরে ঢুকলো লেটি। এরকম ব্যাগ পুরনো আমলে বয়স্ক মহিলারা ব্যবহার করতেন। দেখতে অনেকটা বুড়ির মত,

ওপরে কাপড় বাঁধা, দড়ির হ্যাভেল। ব্যাগটা প্রায় ভর্তি হয়ে আছে। ওর গালে আচড়ের দাগ দেখতে পেলাম, শুকনো রক্ত লেগে আছে সেখানে।

“কি খবর?” জিজ্ঞেস করলাম।

“দাঁড়াও,” বললো লেটি, “কাহিনী শোনাচ্ছি তোমাকে। তোমার যদি ধারণা থাকে যে এগুলো সংগ্রহ করা খুব সহজ, তাহলে সেটা ভুল। ম্যানড্রেকগুলো যখন মাটি থেকে ওঠানো হয়, তখন এত জোরে চিৎকার করে যে না শুনলে

বিশ্বাস করতে পারবে না। তার ওপর কানে কিছু জড়িয়ে নেইনি আমি। একটা পুরনো আমলের বোতলে ভরে এনেছি, আগে থেকেই ছায়া আর

ভিনেগার মেশানো ছিল ওটাতে...” একটা টোস্টে মাখন লাগাতে লাগাতে একদম স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাগুলো বললো ও। “আর সেটা করতে হয়েছে

শুধুমাত্র বাজারে ঢোকার জন্যে, যেটার এখনও খোলার সময় হয়নি। কিন্তু আমার যা যা দরকার মোটামুটি সবই জোগাড় করেছি”।

“আমি দেখতে পারি?”

“তোমার ইচ্ছা”।

ব্যাগটার ভেতরে উঁকি দিলাম। ভাঙা খেলনা ভর্তি ওটার ভেতরে পুতুলের হাত আর মাথা, চাকা বিহীন গাড়ি, ফাটা মার্বেল, ত্রুটি থকে জ্যামের

বয়ামটা নামিয়ে নিলো লেটি। ওটার ভেতরে কেঁচোটির খোলসটা ভাসছে, মোচড়াচ্ছে, ঘুরছে। বোতলটাকেও ব্যাগের ভেতরে অন্য জিনিসগুলোর

সাথে ভরে রাখলো লেটি। বেড়ালছানাটা ঘুমোচ্ছে, আমাদের দিকে কোন নজর নেই ওর।

“এবার আমার সাথে আসতে হবে না তোমার। জিনিসটার সাথে আমি একা গিয়ে কথা বললেও হবে,” বললো লেটি।

“কিন্তু তোমার সাথে গেলেই নিজেকে বেশি নিরাপদ মনে হবে আমার,” কিছুক্ষণ ভেবে বললাম আমি।

খুব বেশি খুশি মনে হলো না ওকে দেখে। “সাগরটার ওখানে যাই চলো,” বললো লেটি। আমরা বের হওয়ার সময় আলসে ভঙ্গিতে চোখ খুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো বেড়ালছানাটা, পেছন পেছন আসা প্রয়োজন মনে করলো না।

আমার জন্যে একটা কালো চামড়ার বুট রাখা ছিল পেছনের দরজার বাইরে। দেখে পুরনো মনে হলেও সেটার যে নিয়মিত যত্ন নেয়া হয় সেটা বোঝা যাচ্ছে। আর একদম আমার পায়ের মাপের। ওগুলো পায়ে দিলাম, অবশ্য স্যান্ডেল পরতেই বেশি ভালো লাগে আমার। লেটির সাথে ওর সাগরের দিকে হাঁটা দিলাম (আসলে একটা পুকুর ওটা)।

পুরনো বেঞ্চটাতে বসে পুকুরের শান্ত পানির দিকে তাকিয়ে থাকলাম দু’জনই। পদ্মপাতাগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে মৃদু বাতাসে।

“তোমরা আসলে মানুষ নও,” বললাম।

“মানুষই”।

মাথা ঝাকালাম জোরে জোরে। “তোমাদের আসল চেহারা নিশ্চয়ই অন্যরকম”।

একবার কাঁধ ঝাঁকালো লেটি। “প্রত্যেকেরই বাইরের চেহারা আর ভেতরের চেহারার মধ্যে পার্থক্য আছে। তোমার, আমার, সবার। প্রকৃতি এতটা সহজ নয়”।

“তুমিও কি আরসালা মঙ্কটনের মতই একটা দানো?” খারাপ লাগলেও জিজ্ঞেস করলাম কথাটা।

একটা নুড়ি পাথর পুকুরে ঢিল মারলো লেটি, এরপরে বললো, “মনে হয় না। অনেক ধরণের দানব আছে। কতগুলোর চেহারা দেখলেই ভয় পাবে সবাই। আবার কতগুলো দানবকে আগে ভয় পেতো মানুষ এখন আর পায় না। আর মানুষরূপী কিছু দানব আছে, যাদের দেখে কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না”।

“আরসালা মঙ্কটনকে সবারই ভয় পাওয়ার কথা” বললাম।

“হয়তো। আরসালা মঙ্কটনের কাকে ভয় পাওয়ার কথা? তোমার কি মনে হয়?”

“জানি না। তবে তার মত দেখতে কোনকিছুর অন্য কাউকে ভয় পাওয়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না। আর তার বয়সও তো অনেক, তাই না? দানবরা আর বড়রা কোনকিছুকেই ভয় পায় না”।

“দানবরাও ভয় পায়,” বললো লেটি। “আর বড়দের ব্যাপারে যতদূর জানি...” কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলো ও, এরপর বললো, “তোমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি আজকে, ভালোমতো শোন। বাইরে থেকে বড়দের যেমনটা দেখা যায়, ভেতরটা কিন্তু আসলে ওরকম না। প্রথম দর্শনে তোমার হয়তো মনে হবে যে কোন কিছুর পরোয়া করে না তারা, নিজের মজি মারফিক চলা ফেরা করে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আসলে তেমন কোন পরিবর্তন হয়না, সেই ছোটটিই রয়ে যায় সবাই। ঠিক তোমার এখন যেমন বয়স, সেরকম। সত্যি কথা বলতে এ পৃথিবীতে বড় মানুষ বলে কিছু নেই,” এটুকু বলে হাসলো ও, “একমাত্র নানীমা ছাড়া”।

চুপচাপ বেঞ্চে পাশাপাশি বসে থাকলাম আমরা। বড়দের নিয়ে ভাবছি আমি। ভাবছি লেটি যা বললো সেটা সত্যি কিনা। আসলেও কি সব বড়দের খোলসের আড়ালে লুকিয়ে থাকে একটা নিষ্পাপ বাচ্চা? যেমনটা লাইব্রেরিতে বড়দের বইয়ের ভিড়ে লুকিয়ে থাকে বাচ্চাদের বই।

“আমার সাগরটাকে অনেক ভালোবাসি আমি,” লেটি বললো শেষে।

“তুমি শুধু শুধু ভান করছো যে এটা একটা সাগর,” কথাটা বলার পর মনে হলো যেন সমগ্র শৈশবকালকে অপমান করছি আমি, কিন্তু এটাই সত্য।

“এটা একটা পুকুর মাত্র। সাগর তো সমুদ্রের চেয়েও বড় হয়। আর এটার আকারও একটা সাধারণ পুকুরের মত”।

“যতটুকু বড় হওয়া দরকার ঠিক ততটুকু বড় এটা,” আহত স্বরে বললো লেটি। একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসলো ওর মুখ চিহ্নে। “চলো, আরসালা মঙ্কটনকে তার আগের ঠিকানায় ফেরত পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু করি আমরা”। আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। “আমি জানি সে কি ভয় পায়। ওগুলোকে আসলে আমিও ভয় পাই”।

রান্নাঘরে ফিরে বেড়ালছানাটাকে কোথাও চোখে পড়লো না। খামারের বিশাল বেড়ালটা অবশ্য বসে আছে জানালার ধারে, বাইরের প্রকৃতি দেখায় ব্যস্ত সে। নাস্তার থালাবাসন সব ধুয়ে মুছে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। আমার পায়জামা

আর গেলিটা সুন্দরমত ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রাখা, একটা বাদামী কাগজের প্যাকেটে। পাশে আমার সবুজ টুথব্রাশটা।

“তুমি পাশে থাকলে আরসালা মঙ্কটন তো আমাকে ছুঁতে পারবে না, তাই না?” বললাম। “তুমি ছুঁতে দেবে না”।

মাথা নেড়ে আমার কথার সাথে সম্মতি জানালো ও। এরপর গলিটা ধরে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম আমরা, আমার বাসার উদ্দেশ্যে। যেখানে অপেক্ষা করছে আরসালা মঙ্কটন নামের জিনিসটা। আমার হাতে বাদামী রঙের কাগজের প্যাকেটটা, যেটার ভেতরে আমার রাতে ঘুমোনের কাপড়। আর লেটির হাতে বড় বাজারের ব্যাগটা, যেটা ভর্তি ভাঙা খেলনায়। খেলনাগুলো ভিনেগার আর ছায়ায় ডোবানো ম্যানড্রেকের বিনিময়ে বাজার থেকে পেয়েছে ও।

যেমনটা বলেছিলাম, বাচ্চারা বড়দের থেকে আলাদা রাস্তা ব্যবহার করে কোথাও যাওয়ার জন্যে। আমরাও মূল রাস্তা ছেড়ে লেটির পরিচিত সংক্ষিপ্ত একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম, মাঠের মধ্যে দিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার গলিতে এসে উঠলাম, একটা ভাঙা বাড়ির পাশ দিয়ে। এখান দিয়েই বেড়া পার হয়েছিলাম আমি আগের দিন।

আশেপাশে কিসের যেন গন্ধ শুকলো লেটি, এরপর বললো, “নাহ, এখনও অন্য কোন ঝামেলা এসে উপস্থিত হয়নি। ওগুলো আরো জঘন্য”।

“কি ওগুলো?”

“সেটা দেখলেই চিনতে পারবে। আর আমি আশা করি কোনদিনই ওরকম কিছু দেখতে হবে না তোমাকে”।

“আমরা কি লুকিয়ে ঢুকবো বাসাতে?” জিজ্ঞেস করলাম।

“সেটা কেন করতে যাবো? ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকবো”।

ড্রাইভওয়েতে পৌঁছে জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি কি জাদুমন্ত্র দিয়ে দ্বার করে দেবে জিনিসটাকে?”

“আমরা কোন জাদুটোনা করি না,” বললো লেটি। গলির স্বর শুনে মনে হচ্ছে সেটাতে খানিকটা হতাশা ও। “অবশ্য মাঝে মাঝে কিছু রেসিপি ব্যবহার করি। কিন্তু কখনো কুহক বা অন্য কিছুর দরকার পড়ে না। নানীমার পছন্দ না ওসব। তার মতে ওগুলো বেশিই সাধারণ”।

“তাহলে তোমার ব্যাগের জিনিসগুলো কি কাজে ব্যবহার করবে?”

“এগুলো দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করে দেয়া যায়। এর বাইরে যেতে পারেনা তখন জিনিসগুলো”।

এই স্নিগ্ধ সকালে আমাদের বাড়িটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাকে। লাল ইটের দেয়াল আর লাল টালির ছাদ ওটার। লেটি ব্যাগ থেকে একটা মার্বেল বের করে ভেজা মাটিতে ফেলে দিল। এরপরে বাসার ভেতরে না যেয়ে বামে মোড় নিলো, বাড়ির সীমানা ধরে হাঁটছে। মিস্টার উইলোরির সবজি বাগানের কাছে পৌঁছে ব্যাগ থেকে আরেকটা জিনিস বের করলো ও একটা পা, মাথাবিহীন পুতুলে শরীর। হাতগুলোতে কামড়ানোর দাগ। ওটা মটরশুটি গাছগুলোর পাশে মাটিতে পুঁতে দিলো ও।

কিছু মটরশুটি গাছ থেকে ছিড়ে ভেতরের দানাগুলো খেলাম আমরা। মটরশুটি খেতে ভালো লাগে আমার। আমি বুঝি না যে বড়রা কেন এরকম একটা জিনিসকে রান্না করে কিংবা মশলা দিয়ে খায়। কাঁচা খেতেই তো বেশি ভালো লাগে।

কয়লা রাখার ছাউনির পাশে একটা ভাঙা পল্লাস্টিকের খেলনা নেকড়ে রেখে দিল লেটি। এখানে কেমন যেন একটা ভ্যাপসা পুরনো গন্ধ থাকে সবসময়। “এগুলোর কারণে কি চলে যেতে বাধ্য হবে জিনিসটা?”

“না”।

“তাহলে এসবের কাজ কি?”

“ওটা যাতে চলে যেতে না পারে সে জন্যে এই ব্যবস্থা”।

“কিন্তু আমরা তো চাই যে জিনিসটা চলে যাক”।

“না। আমরা চাই আবার আগের জায়গায় ফিরে যাক ওটা”।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম, ওর খাটো করে ছাটা বাদামি চুলের দিকে, বোঁচা নাকটার দিকে। ওর বয়স হয়তো তিন হাজার বা চার হাজার বছর। এর চেয়েও বেশি হতে পারে। অভিজ্ঞতাও আমার চেনা জানা অন্য যে কারো চেয়ে বেশি (নানীমা হেম্পস্টক আর জিনি হেম্পস্টকের চেয়ে অবশ্য কম)। ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি আমি, তবুও.....

“আরেকটু ব্যাখ্যা করলে ভালো হতো আমার জন্যে,” বললাম। “তুমি সবসময় রহস্য করে কথা বলো আমার সাথে”।

আমি অবশ্য ভয় পাচ্ছি না এখন। কেন ভয় পাচ্ছি না সেটা বলতে পারবো না আপনাদের। লেটির ওপর ভরসা আছে আমার। মেদিনী কমলা আকাশের নিচে ঝাঁপটাতে থাকা ঐ জিনিসটার খোঁজে আমার সময়ও ভরসা করেছিলাম। ওর সাথে থাকাকালীন সময়ে কখনো ক্ষতি হবে না আমার, সেটা

দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি আমি। যেমনটা বিশ্বাস করি যে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, ঘাসের রঙ হয় সবুজ আর চকলেটের স্বাদ মিষ্টি।

সামনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলাম আমরা। তালা দেয়া ছিল না ওটাতে। অবশ্য আমরা ছুটিতে কোথাও না গেলে কখনো তালা দেয়াও হয়না।

লিভিং রুমে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছে আমার বোন। আমাদের পায়ের আওয়াজ শুনে বাজানো থামিয়ে ঘুরে তাকালো।

কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখতে লাগলো ও। “কাল রাতে কি হয়েছিল?” জিজ্ঞেস করলো কিছুক্ষণ পর। “আমি তো ভেবেছিলাম বিপদে পড়েছো। কিন্তু বাবা মা বাসায় এসে বললো যে তুমি নাকি তোমার এক বন্ধুর সাথে থাকবে রাতে। এটা কেন বললো তারা? তোমার তো কোন বন্ধু নেই”। এতক্ষণে লেটিকে চোখে পড়লো ওর। “এটা কে?” জিজ্ঞেস করলো।

“আমার বন্ধু,” জবাব দিলাম। “ঐ ফালতু জিনিসটা কোথায়?”

“এই নামে ডাকবে না তাকে,” বললো আমার বোন। “তিনি খুবই ভালো। একটু শুয়ে আছেন এখন”।

আমার জামা কাপড়ের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করলো না আমার বোন।

একটা ভাঙা পিয়ানো বের করে লিভিংরুমের খেলনার বাজের মধ্যে রেখে দিল লেটি।

“ব্যস, অনেক হয়েছে,” বললো ও, “এখন চলো দেখা করা যাক জিনিসটার সাথে”।

হালকা ভয় লাগতে শুরু করলো। “মানে তার ঘরটাতে যাওয়ার কথা বলছো?”

“হ্যাঁ”।

“ওখানে কি করছে সে?”

“টাকা পয়সা দিয়ে বেড়াচ্ছে,” বললো লেটি। “এখন পর্যন্ত অবশ্য কেবল স্থানীয় মানুষজনকেই দিয়েছে। তাদের কি কি দরকার সেটা খুঁজে বের করে সেগুলো দিচ্ছে। এরকম করলে এখানে খুশি মনে থাকতে পারবে সে। এ ধরনের পরিবেশেই অভ্যস্ত জিনিসটা। অবশ্য এখন আর টাকা পয়সা দেয়াতেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং কিভাবে অন্যদের কষ্ট দেয়া যায় সেটাও ভাবছে”।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় প্রতিটা সিঁড়িতে একটা করে ভাঙা খেলনার টুকরো রেখে দিলো লেটি। পুতুলের চোখ, ভাঙা খেলনা ঘোড়া, চুম্বক, খেলনা গাড়ি, পলিস্টিকের তৈরি বন্দুক বিহীন সৈন্য এসব।

সিঁড়ির একদম ওপরে পৌঁছে গেলাম আমরা। বেডরুমের দরজাটা বন্ধ। “তোমাকে চিলেকোঠায় বন্দি করতে পারবে না সে,” এটুকু বলে কড়া না নেড়েই দরজা খুলে ফেললো ও। আমার আগের রুমটাতে ঢুকে পড়লো, আমিও গেলাম পিছু পিছু।

চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে আছে আরসালা মঙ্কটন। এই প্রথম কোন প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দেখলাম আমি, কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু তার চেয়ে আমার পুরনো ঘরটার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহ আমার।

এটা আমার পুরনো ঘরটাই। কিন্তু কি যেন একটা ভিন্ন মনে হচ্ছে এখন। বাবা যে হলুদ রঙের বেসিনটা লাগিয়ে দিয়েছিলো সেটাও আছে এক কোণায়। কিন্তু এখন সিলিং থেকে ব্যাণ্ডেজের মত দেখতে ধূসর পুরনো মলিন কাপড় ঝুলছে সারা ঘরে। কতগুলো একফুট লম্বা, আবার অনেকগুলো সিলিং থেকে মেঝে অবধি ছড়ানো। জানালা দিয়ে বাতাস ভেতরে ঢোকায় নড়ছে ওগুলো। সেই সাথে মনে হচ্ছে যেন ঘরটাও দুলছে, জাহাজ বা তাবুর মত।

“তোমাকে যেতে হবে এখন,” বললো লেটি।

আরসালা মঙ্কটন উঠে বসলেন বিছানায়, এরপর চোখ খুললেন। ওগুলো ঝুলন্ত কাপড়গুলোর মতনই ধূসর রঙের। আধো ঘুম ঘুম স্বরে বললেন, “আমি ভাবছিলাম যে তোমাদের দু’জনকে এখানে নিয়ে আসতে কি করতে হবে আমাকে। ভালো হয়েছে যে একাই এসেছো, যেতে হয়নি আমার”।

“আমাদের এখানে আসার পেছনে তোমার কোন হাত নেই,” লেটি বললো।

“নিজ ইচ্ছাতেই এখানে এসেছি আমরা। তোমাকে শেষবারের মত একটা সুযোগ দিতে চাই আমি”।

“এখন কোথাও যাবো না আমি,” জেদি বাচ্চাদের মত স্বরে বললেন আরসালা মঙ্কটন। “কেবলই তো আসলাম, কিছু পোষ্যও পেয়ে গেছি ইতিমধ্যে। ওর বাবা খুবই চমৎকার একটা মানুষ। সবাইকে খুশি করছি আমি। আমার মত আর কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না এই পৃথিবীতে। তোমরা আসার আগে সেটাই দেখছিলাম আমি। এখানে আমিই সর্বসর্বা। এরা

নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না। রক্ষা করার উপায় জানা নেই ওদের।

তাই আমার জন্যে এটার সবচেয়ে ভালো জায়গা”।

আমাদের দু’জনের দিকে তাকিয়ে বড় একটা হাসি দিলো সে। আসলেও সুন্দর চেহারা তার, কিন্তু সাত বছরের একটা বাচ্চার কাছে বাহ্যিক সৌন্দর্য ঠিক অপরিহার্য কোন বিষয় নয়, অনেক বয়স্কদের কাছে অবশ্যে সেটা ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমার বাবা হয়তো তার এই সুন্দর হাসিটার জন্যে অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু আমার তেমন কোন অনুভূতিই হল না।

“তোমার ধারণা এই জগতটা এমনই,” লেটি বললো। “সবকিছু খুব সহজ। কিন্তু তোমার ধারণা ভুল”।

“অবশ্যই সহজ। কি আবোল তাবোল বলছো এসব? তোমার কি ধারণা যে তুমি আর তোমার পরিবার মিলে পুরো পৃথিবীকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে? একমাত্র তুমিই তোমাদের খামারের সীমানার বাইরে বের হও। আর তুমিই আমার নাম না জেনে আমাকে আটকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলে। তোমার মা থাকলে ওরকম বোকার মত কাজটা করতো না। তোমাকে ভয় পাই না আমি মেয়ে”।

লেটি ওর ব্যাগটা থেকে জ্যামের বোতলটা বের করলো। ভেতরে ভাসছে খোলসটা।

“এটা তোমার ফিরে যাবার রাস্তা,” বললো ও। “তোমার সাথে কিন্তু খুব ভদ্র আর ভালোভাবে কথা বলছি আমি। এটা নাও আর ফিরে যাও। কমলা আকাশের নিচে আগের সেই জায়গাটাতে গেলেও আপাতত চলবে। সেখানকার আগে যেখানে থাকতে ওখানে অবশ্য ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা যাবে না। নানীমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেই জায়গাটার কোন অস্তিত্ব নেই এখন আর। আমরা পরে তোমাকে ভালো একটা জায়গা খুঁজে দেবো। যেখানে নিরাপদে থাকবে তুমি”।

বিছানা থেকে নেমে পড়লেন আরসালা মঙ্কটন। উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। এখন আর তার শরীরে বিজলী চমকাচ্ছে না, কিন্তু এই ঘরে নগ্ন অবস্থায় তাকে গতকালকের চেয়ে বেশি ভয়ংকর মনে হচ্ছে। তিনি একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা। না, তার চেয়েও বেশি কিছু। তিনি প্রাচীন এক সত্ত্বা (নাকি দানবী?)। নিজেকে কখনো এতটা ছোট মনে হয়নি আমার (অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে)।

“এখানে অনেক খুশি আছি আমি,” বললেন তিনি। “অনেক, অনেক খুশি”। এরপরে অনেকটা আফসোসের সুরে বললেন, “কিন্তু তোমরা মোটেও খুশি নও”।

এ সময় একটা শব্দ কানে আসলো আমার। কাপড়ের সাথে কাপড়ের ঘষা লাগার শব্দ। ধূসর কাপড়ের টুকরোগুলো একে একে সিলিং থেকে খুলে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু সোজাসুজিভাবে নিচে পড়ছে না সেগুলো। ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে, যেন চুম্বক লাগানো আছে আমাদের শরীরে। প্রথম ধূসর কাপড়টা নেমে এসে আমার বাম হাতের পেছনে লাগলো। ডান হাত দিয়ে সেটা ধরে টান দিলাম আমি; তেমন বাঁধা ছাড়াই খুলে আসলো ওটা। কিন্তু অদ্ভুত একটা আওয়াজ হলো (কোন কিছু চুম্বলে যেরকম আওয়াজ হয়, সেরকম)। যেখানে লেগেছিল কাপড়টা সেখানটা একদম টকটকে লাল হয়ে গেছে, যেন দীর্ঘ সময় ধরে সেখানটা চুষেছি আমি। অজস্র সুঁইয়ের খোঁচার মত জ্বলছে লাল জায়গাটা। এরপরে একটা কাপড় এসে আমার পা জড়িয়ে ধরলো। পেছনে সরে গেলাম আমি, কিন্তু লাভ হলো না। একটা কাপড় এসে মুখ পেঁচিয়ে ফেলায় কিছু দেখা সম্ভব হচ্ছে না আমার। ওটা ধরে টান দিতে গেলাম কিন্তু আরেকটা ব্যাভেজের মত কাপড় এসে আমার কজিদুটো শরীরের সাথে বেঁধে ফেললো। হোঁচট খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেলাম আমি।

কাপড়গুলো টানাটানির চেষ্টা করা মাত্র জ্বালাপোড়া করছে।

চোখের সামনে শুধুই ধূসরতা এখন। হাল ছেড়ে দিয়ে মেঝেতেই শুয়ে থাকলাম। নড়াচড়ার চেষ্টাও করলাম না। শুধু সাবধানে নিঃশ্বাস নিয়ে যাচ্ছি, নাকের ওপর কোন কাপড় নেই এখন পর্যন্ত। কাপড়গুলোকে জীবন্ত মনে হচ্ছে।

শুয়ে শুয়ে শোনার চেষ্টা করতে লাগলাম, আর কিছু করারও নেই অবশ্য।

“ছেলেটাকে নিরাপদ রাখতে হবে, আমার নিজের ভালোর জন্যেই। ওকে বলেছিলাম যে চিলেকোঠায় আটকে রাখবো। সেটাই হবে। কিন্তু তোমাকে নিয়ে কি করবো, মেয়ে? তোমার জন্যে উপযুক্ত এমন কিছু ভারত হবে আমাকে। তোমাকে ভেতর থেকে উল্টে দেই? এরপর এই ধরনেরই বেঁধে রেখে দেবো। সারাজীবন নিজের ভেতরের অন্ধকার দেখেই কেটে যাবে তোমার। সেটা করতে পারবো আমি”।

“না,” লেটি বললো। ওর গলাটা ভারি মনে হচ্ছে এখন। “আসলে সেটা করতে পারবে না তুমি। তোমাকে কিন্তু সুযোগ দিয়েছিলাম আমি”।

“আমাকে হুমকি দিয়েছো তুমি। ফাঁকা হুমকি।”

“হুমকি দেই না আমি,” বললো লেটি। “তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম”। কিছুক্ষণের নীরবতার পরে আবার বলে উঠলো ও, “তুমি তো তোমার মত পুরনো সত্ত্বার খোঁজ করছিলে এই ঘরে শুয়ে শুয়ে। একটু অবাধ হওনি যখন কিছু খুঁজে পাওনি? না, সেসব তো তোমার চিন্তাতেই আসে না। এই পৃথিবীতে তোমার মত আর কিছু নেই দেখে খুব খুশি হয়েছিলে নিশ্চয়ই? তোমাদেরকে সবসময়ই ‘উটকো ঝামেলা’ বলে ডাকে নানীমা। কিসের সাথে তুলনা করে জানো? ছারপোকা। তার কাছে বোধহয় তোমাদের ছারপোকার সাথে তুলনা করতে মজা লাগে। তোমাদের উপস্থিতি ভাবায় না তাকে। তোমরা নাকি তেমন কোন ক্ষতি করো না, শুধু বুদ্ধিগুদ্ধি একটু কম। কিন্তু তোমাদের গন্ধ শুঁকে শিকার করতে হাজির হয় হিংস্র কিছু সত্ত্বা। ওগুলোকে আরো বড় ঝামেলা মনে হয় নানীমার কাছে। ওদের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াও নাকি কঠিন কাজ। আর ওগুলো সবসময়ই ক্ষুধার্ত”।

“আমি এসব ভয় পাই না,” আরসালা মঞ্চটন বললেন ঠিকই, কিন্তু তার কণ্ঠ শুনে ভীতই মনে হলো। “আমার নামও জানো না তুমি”।

“অন্ধকারের কুহকিনী। এই নামেই তো নিজের পরিচয় দাও, তাই না?”

“আমার নাম জানলে কিভাবে?”

“সকালে সেটার খোঁজে বের হয়েছিলাম আমি। আরো কিছু দরকারি জিনিস খুঁজতেও গেছিলাম। সীমানা বেঁধে দেয়া যায়, এমন কিছু জিনিস। যাতে বেশি দূর পালাতে না পারো তুমি, আরো ঝামেলা না করতে পারো। এখন এই বোতলটার ঢাকনা খুলে খোলসটার ভেতর দিয়ে ফিরে যাও যেখান থেকে এসেছো”।

আরসালা মঞ্চটনের জবাবের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু কিছুই বললেন না তিনি। এসময় আমার মনে হলো যে লেটির নানীমা ‘তিনি’ বলতে বারণ করেছেন আমাকে। ‘জিনিসটা’ বললেই নাকি যথেষ্ট। আর এরকম কিছুকে সম্মান দেখানোরও কোন মানে হয় না।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ কানে আসলো, এরপর সিঁড়ি বেয়ে হুড়মুড় করে নিচে নেমে যাওয়ার শব্দ।

খুব কাছ থেকে লেটির গলার স্বর কানে আসলো এই সময়। এখানে থেকে আমার প্রস্তাবটা গ্রহণ করলেই মঙ্গল হতো সবার জন্যে। টের পেলাম যে আমার চেহারা থেকে কাপড়গুলো টেনে সরেছে ও। আগের মতই অদ্ভুত শব্দ করে সরে যেতে লাগলো ওগুলো, কিন্তু এখন জ্বালাপোড়া

করছে না। মাটিতে পড়ে সেখানেই স্থির হয়ে থাকলো কাপড়গুলো। কিন্তু এতক্ষণ বাঁধা থাকার কারণে হাত পা নাড়াতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে আমার। লেটির সাহায্য নিয়ে উঠে দাঁড়িলাম। ওকে দেখে খুশি মনে হচ্ছে না মোটেও।

“কোথায় গেল জিনিসটা?” জিজ্ঞেস করলাম।

“বাসা থেকে বের হয়ে আমার ফেলে আসা বন্ধনীগুলোর উদ্দেশ্যে গিয়েছে সে। ভয় পেয়ে গেছে বেচারি”।

“তুমিও ভয় পেয়েছো”।

“অল্প অল্প। আশা করি, এতক্ষণে ওটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বন্দি সে,” বললো লেটি।

বেডরুম থেকে বাইরে বের হয়ে আসলাম আমরা। সিঁড়ির ওপরে যেখানে খেলনা সৈনিকটা ছিল সেখানটা এখন ফাঁকা। সে জায়গায় ভাসছে এক ধরণের ধূসর আভা, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায়না ওটার দিকে (এর চেয়ে ভালো ভাবে বর্ণনা করতে পারছি না এ মুহূর্তে)।

“কিসের ভয় ওর?”

“শুনেছো তো তুমি। হিংস্র শিকারী সত্তাগুলোর। নানীমা ‘ক্ষুধার্ত পাখির দল’ বলে ডাকে যেগুলোকে”।

“তুমিও কি ভয় পাও?”

কিছুক্ষণ চুপ করা থাকলো লেটি, যেন দ্বিধায় ভুগছে যে বলবে কিনা। এরপর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললো, “হ্যাঁ”।

“কিন্তু তুমি তো এই জিনিসটাকে ভয় পাও না। আরসালা মঙ্কটনকে”।

“তাকে ভয় পেলে চলবে না আমার। যেমনটা নানীমা বলেন- ছারপোকা যেমন রক্ত খেয়ে ফুলে ওঠে, তেমনি ক্ষমতার গর্বে ফুলে ওঠে ওরা। আসলে খুব দুর্বল। ওরকম জিনিস আগেও অনেকবার দেখেছি আমি, আমাদের সময়ে। একবার স্বাধীনতা দিবসের দিন এসে উপস্থিত হয়েছিল একটা, বেশ যন্ত্রনা দিয়েছিল। সবাইকে ভীষণ রকম একাকীত্বে ভুগতে বাধ্য করতো সে। নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করতো আক্রান্তরা। চোখ টেনে বের করে ফেলতো, কুয়োয় ঝাঁপ দিতো- শুধুই সেই একাকীত্বের যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। আর গোটা ব্যাপারটা চিলেকোঠায় বসে বসে উপভোগ করতো সেটা। দেখতে একটা ব্যাঙের মত ছিল জিনিসটা, তবে কুকুরের সমান”।

সিঁড়ির নিচে পৌঁছে গেছি আমরা, হাঁটছি হলঘরে।

“তুমি কিভাবে জানলে যে কোথায় গেছে সে?”

“আমি তার জন্যে যেটুকু রাস্তা করে রেখে এসেছি এর বাইরে যাওয়ার সাধ্য নেই ওটার”।

আমার বোন এখনও পিয়ানো বাজিয়েই যাচ্ছে। একটা ছড়াগানের সুর। টুংটাং, টুংটাং আওয়াজ ভেসে বেড়াচ্ছে।

সামনের দরোজা দিয়ে বের হয়ে আসলাম আমরা। “স্বাধীনতা দিবসের দিন যেটা এসেছিল সেটা খুবই ঝামেলা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শূন্যের শকুনগুলো এখানে এসে পৌঁছানোর আগেই ওটাকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হই আমরা”।

“শূন্যের শকুন?”

“হিংস্র সত্ত্বাগুলোকে এই নামেও ডাকে নানীমা। ওদের দায়িত্ব এই জগতের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা”।

শুনে ওগুলোকে খারাপ কিছু মনে হলো না আমার। আরসালা মঙ্কটন হয়তো ওগুলোকে ভয় পেতে পারে, কিন্তু আমি ভীত নয় মোটেও। যারা পরিবেশ পরিষ্কার রাখে, তাদের ভয় পাওয়ার কি আছে?

আরসালা মঙ্কটনকে আমাদের বাগানে গোলাপ ঝাড়গুলোর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম আমরা। জ্যামের বয়ামটা শক্ত করে ধরে আছে এক হাতে। অদ্ভুত লাগছে তাকে দেখতে। একবার বয়ামের ঢাকনা খোলার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। হতাশ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ।

এরপর হঠাৎ আমার বিচ গাছটার কাছে ছুটে গিয়ে ওটার কাণের দিকে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে ছুড়ে মারলো বয়ামটা। এবারও কোন লাভ হলো না, ভাঙলো না বয়ামটা। শুধু ধাক্কা খেয়ে নিচের ঘাসের ওপর পড়ে গেলো। লেটিংর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকালো (তাকে আর আপনি করে বলার কোন মানে নেই, তাই না?) আরসালা মঙ্কটন। “কেন?” জিজ্ঞেস করলো। “তুমি ভালোমতোই জানো কেন”।

“কেন ওদেরকে এখানে আসার অনুমতি দিলে?” এটুকু বলে কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। অস্বস্তিবোধ জেঁকে ধরলো আমাকে। বড়রা কাঁদলে কি করতে হয় জানা নেই আমার। এর আগে শুধু দু’বার বড়দের কাঁদতে দেখেছি আমি যখন আমার ফুপু মারা গিয়েছিলেন, দাদা দাদী কেঁদেছিলেন খুবই। আর আমার মা’কে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে দেখেছিলাম একবার। আমার মতে বড়দের কাঁদা উচিত না। তাদের মায়েরা তো সবসময় তাদের সাথে থাকেন না স্বাস্থ্যনা দেয়ার জন্যে।

আরসালা মঙ্কটনের কি মা আছে? কখনো ছিল?

কাঁদায় হাঁটু গেঁড়ে বসে কাঁদছে এখন সে।

ক্ষীণ একটা শব্দ কানে আসলো এই সময়। তবে শব্দটা অদ্ভুত, গিটারের ভুল তারে টান দিলে যেরকম শব্দ হয়, সেরকম।

“এখানে আসার জন্যে আমার অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই ওদের,” লেটি হেম্পস্টক বললো তাকে। “নিজেদের মর্জি মারফিক যেখানে ইচ্ছে সেখানে যায় তারা। তবে এদিকে সাধারণত আসে না কারণ এখানে তাদের খাওয়ার মত কিছু নেই। কিন্তু...এখন আছে”।

“আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও,” আরসালা মঙ্কটন বললো। এখন আর তার চেহারার সাথে সাধারণ কোন মানুষের চেহারার কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে যেন কেউ খুবই খারাপ দেখতে একটা মানুষের মুখোশ পরে আছে। আর মুখোশের পেছনে ধূসর কিছু একটা ভাসছে। ক্ষণে ক্ষণে

বদলাচ্ছে সেটার আকৃতি। অনেকটা পুরনো টেলিভিশনে বারবার ছবি আসা যাওয়া করতে থাকলে যেরকমটা দেখায়, সেরকম।

লেটি জ্যামের বয়ামটা তুলে নিল ঘাসের ওপর থেকে। “এটাকে আরো শক্ত করে আটকে দিয়েছো তুমি,” এটুকু বলে পাথর দিয়ে বাঁধানো হাঁটার রাস্তার ওপরে গিয়ে সেখানে সজোরে একবার উল্টো করে আঘাত করল বয়ামটা। এরপর ডানদিকটা দিয়ে আঘাত করলো পাথরে। এবার আর বয়ামের মুখ খুলতে কোন বেগ পেতে হলো না লেটিকে।

আরসালা মঙ্কটনের হাতে তুলে দিল বয়ামটা। ওটা হাতে নিয়ে ভেতর থেকে কেঁচোর খোলসের মত দেখতে স্বচ্ছ জিনিসটা বের করে আনলো সে। একসময় আমার পায়ের ভেতরে ছিল ওটা, ভাবতেই যেন কেমন লাগছে। তার হাতের সংস্পর্শে এসে কোন রকম মোচড়ালো না জিনিসটা, যেন এতদিন এটার অপেক্ষাতেই ছিল।

ওটাকে মাটিতে ফেলে দিলো সে। সেখানে বাড়তে লাগলো জিনিসটা। বাড়ার সাথে সাথে বদলাতেও লাগলো। দেখতে দেখতে একটা সুড়ঙ্গের পরিণত হলো। অপর পাশটাও দেখা যাচ্ছে ওটার ভেতর দিয়ে। ওপাশের কমলা আকাশটা দেখা না গেলে হয়তো সুড়ঙ্গটার ভেতরে ঢুকেও দেখতাম আমি।

ওটার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় আমার বুকের ভেতর সেই শীতল অনুভূতিটা ফিরে আসলো আবার, যেন অনেক বেশি আইসক্রিম একবারে খেয়ে ফেলেছি।

আরসালা মঙ্কটন হেঁটে গেলো সুড়ঙ্গমুখটার কাছে (আসলেও কি ওটা একটা সুড়ঙ্গ? বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার। এখনও কালচে-রূপালী একটা আভা ছড়াচ্ছে জিনিসটা। তবে খুব বেশিদূর পর্যন্ত ছড়াচ্ছে না আভাটা, বড়জোর এক ফুট। কিন্তু ওটা একটা সুড়ঙ্গই, একটা আস্ত বাসা টেনে নেয়া যাবে ওটার ভেতর দিয়ে)।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো আরসালা মঙ্কটন, থেমে গেলো সুড়ঙ্গের বাইরে। “ফিরে যাবার রাস্তাটা অসম্পূর্ণ,” বললো সে। “ভাঙা ওটা, শেষের জাতি নেই...” এটুকু বলে আশেপাশে উদভ্রান্তের মত তাকাতে লাগলো আরসালা মঙ্কটন। এসময় আমার ওপর চোখ পড়লো তার, আমার বুকের ওপর। হেসে উঠলো।

এরপর কাঁপতে লাগলো ভীষণভাবে। এক মুহূর্ত আগেও একজন নগ্ন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার বেশে ছিল সে, এখন রূপ বদলাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।

ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরলো তার একটা অংশ, হ্যাঁচকা টানে তুলে ফেললো মাটি থেকে অনেক ওপরে। ভয়ে হাত পা ছুড়তে লাগলাম আমি, ছোঁয়া লাগলো তার বাড়িয়ে দেয়া অংশে।

মাটি থেকে পনেরো ফিট কিংবা তার চেয়েও বেশি উঁচুতে ভাসছি আমি। বাঁচার চেষ্টা হিসেবে আকড়ে ধরলাম আরসালা মস্কটনকেই।

টের পেলাম যে একটা কাপড়ে হাত দিয়েছি আমি- জীর্ণ, পুরনো ক্যানভাস কাপড়। আর সেটার নিচে অনুভব করতে পারছি কাঠের উপস্থিতি। ভালো কাঠ নয়, শেওলা ধরা পচা কাঠ, ভেজা ভেজা লাগছে। আর কাঠের নিচে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে গুবড়ে পোকের দল।

আমাকে ধরে থাকা অবস্থাতেই দুলতে লাগলো জিনিসটা।

“তুমি রাস্তাগুলো আটকে দিয়েছো,” লেটি হেম্পস্টকের উদ্দেশ্যে বললো।

“আমি কিছুই আটকাইনি,” লেটি জবাব দিলো। “আমার বন্ধুকে নিচে নামাও এখনই”। অনেক নিচে দেখতে পাচ্ছি ওকে। উচ্চতাজীতি আছে আমার। আর যে জিনিসটা ধরে আছে আমাকে, সেটাকেও দারুণ ভয় পাই।

“রাস্তাটা অসম্পূর্ণ! কেউ আটকে দিয়েছে!”।

“ওকে সাবধানে নিচে নামিয়ে রাখো”।

“এই ছেলেটাই পূর্ণ করবে রাস্তাটা। ওর বুকোর ভেতরে আছে শেষ দরজাটা”।

আমার মৃত্যু হতে যাচ্ছে খুব শিগগিরই, এ ব্যাপারে শেষ সন্দেহটুকুও দূর হয়ে গেলো।

কিন্তু মরতে চাই না আমি। অবশ্য বাবা মা আমাকে বলেছেন যে প্রকৃত মৃত্যু বলে কিছু নেই। শুধু বাহ্যিক দেহটার মৃত্যু ঘটে। ভেতর থেকে আত্মাটা বের হয়ে আবার কোন নতুন দেহে প্রবেশ করে ফিরে আসে পৃথিবীতে। সেই ওপাল মাইনার আর আমার বেড়াল ছানাটার ক্ষেত্রেও নাকি অমনটাই ঘটেছে। কথাটা সত্য নাকি মিথ্যা সেটা জানি না। শুধু জানি যে আমার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট আমি। যেখানে আমার সময় কাটে বই পড়ে। লেটি হেম্পস্টক আর আমার দাদা দাদীর মত ভালো মানুষগুলোও এই জীবনের।

“ওকে মারতে হবে আমার। রাস্তাটা ভাঙা, দরজার শেষটুকু বের করা দরকার”।

কষে লাথি বসাতাম আমি, কিন্তু শুধু শুধু বাতাসে লাথি বসিয়ে কোন লাভ নেই। আমাকে যে অংশটা দিয়ে ধরে আছে জিনিসটা, সেটার ওপর হাত

দিলাম। নখ বসে গেলো পুরনো ক্যানভাস আর নরম কাঠে। আমাকে আরো কাছে টেনে নিলো জিনিসটা।

“ছেড়ে দাও আমাকে,” চিৎকার করে উঠলাম। “ছেড়ে! দাও! এখনই!”।
“না!”।

“মা! বাবা!,” ডাকলাম জোরে জোরে। “লেটি! আমাকে নিচে নামাতে বলো জিনিসটাকে”।

আমার বাবা মা উপস্থিত নেই এখানে, কিন্তু লেটি আছে। ও বললো, “নামাও আমার বন্ধুকে। ওর ভেতরের সুড়ঙ্গের শেষ অংশটুকু থাকা সত্ত্বেও তোমাকে ফেরত পাঠাবো আমরা, সেটা যত কঠিনই হোক না কেন। আমার মা না পারলে নানীমা অবশ্যই পারবে। তাই নামিয়ে রাখো ওকে”।

“ওর ভেতরে আছে জিনিসটা। সুড়ঙ্গ না, শুধু একটা দরজা। পা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে এখন একদম বেশি ভেতরে ঢুকে গেছে। ওর বুক চিড়ে হৃৎপিণ্ডটা বের করে আনলেই কেবল পথটা পূর্ণ হবে”।

কোন মুখ ছাড়াই কথা বলছিলো বাতাসে ঝাঁপটাতে থাকা জিনিসটা। তা সত্ত্বেও আরসালা মঙ্কটনের সুরেলা কণ্ঠের একটা রেশ যেন রয়েছে গেছে। যা বলছে সেটাই করার ইচ্ছে ওটার, বুঝতে পারলাম।

“তোমার সব সুযোগ শেষ, আর সুযোগ দেয়া যাবে না,” মানুষ যেভাবে বলে যে আকাশের রঙ নীল, ঠিক সেই ভঙ্গিতে কথাটা বললো লেটি। এরপর মুখের কাছে দুই আঙুল নিয়ে শিশু দিয়ে উঠলো প্রচণ্ড জোরে।

ছুটে আসলো তারা।

আকাশের কোণা থেকে ছুটে আসলো। কালো বর্ণ ধারণ করলো আকাশের সেই কোণটা। কিন্তু সেই কালোর মাঝেও চকচকে একটা ভাব আছে, মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখছি। পাখা থাকা সত্ত্বেও পাখি নয় ওগুলো। পাখির চেয়ে অনেক অনেক বড়। ঝাঁকে ঝাঁকে গোল হয়ে ঘুরতে লাগলো জিনিসগুলো। আস্তে আস্তে নামছে নিচে।

আমার সবসময়ই ধারণা যে ডায়নোসরদের আমলে যে শকুনগুলো ছিল সেগুলো অনেক বড় হতো। একে অপরের সাথে মারামারি করে যখন তারা পড়তো কোন ডায়নোসর, তখন তাদের মৃতদেহ খুবলে খেতো টুকটকে লাল চোখের সেই অতিকায় শকুনের দল। কিন্তু এখন যে অপাখিস জিনিসগুলো দেখছি সেগুলো খুব নিমেষে সাফ করে ফেলবে সেই শকুনের দলকে, শুধু হাড়ি পড়ে থাকবে সে জায়গায়।

বড় বড় জিনিসগুলোর দিকে একটানা তাকিয়ে থাকা যায় না, চোখ ব্যাথা করে।

“এখনই,” বললো লেটি হেম্পস্টক। “নামিয়ে রাখো ওকে”।

যে জিনিসটা ধরে আছে আমাকে সেটা কোন জবাব দিলো না, কিন্তু আমাকে নিচেও নামিয়ে রাখলো না। বরং দ্রুত বেগে ঘাসের ওপর দিয়ে সুড়ঙ্গটার দিকে ছুটে যেতে লাগলো ওটা।

লেটি হেম্পস্টকের রাগান্বিত চেহারাটা দেখতে পারছি। এত শক্ত করে মুঠো করে আছে হাত যে নখ বসে গেছে হাতের তালুতে। আর আকাশে দেখতে পাচ্ছি ক্ষুধার্ত পাখিদের দলকে। গোল হয়ে ঘুরছে তো ঘুরছেই...

এরপর আমার কল্পনার চেয়েও দ্রুত বেগে একটা পাখি নেমে আসলো নিচে। টের পেলাম পাশ দিয়ে বাতাস কেটে ছুটে গেলো ওটা। খোলা মুখে সারি সারি কাঁটা আর চোখে যেন আগুন জ্বলছে। কিছু একটা ছেড়ার শব্দ পেলাম, যেন বড় কোন পর্দা ছিড়ে যাচ্ছে।

মুখে ক্যানভাসের কাপড়ের বিশাল একটা টুকরো নিয়ে ওপরে উঠে গেলো উড়ন্ত জিনিসটা।

আমার মাথার ভেতরে এবং বাইরে আর্ত চিৎকার দিয়ে উঠলো একটা স্বর, আরসালা মঙ্কটনের কণ্ঠস্বর।

এরপর ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসতে লাগলো জিনিসগুলো। আমাকে যে জিনিসটা ধরে ধরে আছে সেটাকে আক্রমণ করে মুখে কাপড়ের টুকরো নিয়ে আবার ওপরে উঠে যেতে লাগলো।

“ওদের চাহিদা পূরণ করছিলাম আমি,” ভয়াবহ স্বরে চিৎকার করে চলেছে আরসালা মঙ্কটনের কণ্ঠস্বর, “যা যা দরকার ছিল কেবল সেগুলোই দিচ্ছিলাম”।

“আমার বাবাকে আমাকে কষ্ট দিতে বাধ্য করেছো তুমি,” বললাম আমি, আরসালা মঙ্কটনের চিৎকার ছাপিয়ে। ক্ষুধার্ত পাখিগুলো আক্রমণ করেই যাচ্ছে জিনিসটাকে, সন্তর্পণে ছিড়ে নিয়ে যাচ্ছে কাপড়ের টুকরো।

“ওদের কখনোই কিছু করতে বাধ্য করিনি আমি,” আমাকে বললো জিনিসটা। ক্ষণিকের জন্যে মনে হলো যেন আমার উদ্দেশ্যে টিটকারির হাসি দিচ্ছে ওটা, কিন্তু পরক্ষণেই হাসিটা রূপ নিল আর্তচিৎকারে। এত জোরে চিৎকার করে উঠলো যে কানের ভেতর ব্যাথা করতে লাগলো।

এসময় দুমড়ে পড়ে যেতে থাকলো আমাকে ধরে রাখা জিনিসটা, যেন দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি পাচ্ছে না। আমিও নিচে পড়তে লাগলাম ওটার সাথে সাথে।

উল্টো হয়ে ঘাসের ওপর পড়লাম আমি। ছিলে গেলো হাতের তালু আর হাঁটুর কিছু অংশ। লেটি উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো আমাকে। দূরে সরে আসলাম ধূসর ক্যানভাস কাপড়ে তৈরি জিনিসটা থেকে, আরসালা মঙ্কটনের বেশ ধরে ছিল যেটা।

তবে এখন আর কাপড় বলার জো নেই সেটাকে। ধূসর শতচ্ছিন্ন জিনিসটা কাতরাচ্ছে মাটিতে পড়ে থেকে। মনে হচ্ছে যেন ঘূর্ণিঝড়ের ভেতরে পড়েছে ধূসর রঙের বিশাল কোন চাদর।

ঈগল পাখি যেভাবে হামলে পড়ে শিকারের ওপর, ঠিক সেভাবে ওটার ওপর হামলে পড়ছে কাল জিনিসগুলো। যেন হাজার বছরের ক্ষুধার্ত। ‘অন্ধকারের কুহকিনী’কে ছিড়ে খাচ্ছে তারা আর সেটার আর্তচিৎকার ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে বাতাসে।

আমার বাহু শক্ত করে চেপে ধরে আছে লেটি। কিছু বলছে না।

অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা।

চিৎকারটা থেমে গেলো একসময়। আরসালা মঙ্কটনের কোন অস্তিত্ব নেই এখন আর।

ঘাসের ওপর পড়ে থাকা জিনিসটা খেয়ে শেষ করার পর ক্ষুধার্ত পাখিগুলোর নজর পড়লো সুড়ঙ্গটার ওপর। ওটা ভীষণভাবে মোচড়াচ্ছে এখন, ঠিক জীবিত কোন কিছুর মত। কতগুলো পাখি নেমে এসে নখ দিয়ে চেপে ধরে আকাশে উঠিয়ে নিল সুড়ঙ্গটা। আর বাকি পাখিগুলো খুবলে খাচ্ছে ওটাকে।

আমি ভেবেছিলাম যে সুড়ঙ্গটাকে খাওয়া শেষ হলে যেখান থেকে এসেছে সেখানে চলে যাবে পাখিগুলো। কিন্তু তেমনটা হলো না। নিচে নেমে আসলো ওগুলো। নামার সময় ওগুলোকে গোণার চেষ্টা করলাম আমি, লাভ হলো না। আমার মনে হলো যে একশো হতে পারে পাখিগুলোর সংখ্যা। আবার বিশটাও হতে পারে, হাজারটাও হতে পারে। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলা সম্ভব না। তারা যেখান থেকে এসেছে সেখানটা নিশ্চয়ই এসব গণনার উর্ধ্বে, সময়ের উর্ধ্বে।

ওগুলো যদিও নামলো সেখানে ছায়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়লো না আমার।

অনেকগুলো ছায়া।

আর ওগুলো ভাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

“তোমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলে সেটা পূরণ হয়েছে। তোমাদের শিকারের আর কোন অস্তিত্ব নেই। এই জায়গাটা এখন আবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। ফিরে যাও তোমরা”।

কিন্তু ছায়াগুলো নড়লো না।

“যাও,” বললো লেটি।

যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই রয়ে গেলো ছায়ার দল। উল্টো মনে হচ্ছে যে আরো গাঢ় হচ্ছে ছায়ার ধরণ।

-আমাদের ওপর কোন ক্ষমতা নেই তোমার।

“হয়তো,” বললো লেটি। “কিন্তু তোমাদের আমিই ডেকে এনেছি এখানে। এখন আবার আমিই অনুরোধ করছি ফিরে যেত। অন্ধকারের কুহকিনীকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছো তোমরা। তোমাদের কাজ শেষ। এখন ফিরে যাও”।

-আমাদের কাজ পরিষ্কার করা। এখানে পরিষ্কার করার কাজে এসেছি আমরা।

“হ্যাঁ, আর যে জিনিসটা থেকে মুক্তির দরকার ছিল এই জগতটার, সেটাকে পরিষ্কার করেছে তোমরা। এখন ফিরে যাও”।

-সবকিছু পরিষ্কার করা হয়নি এখনও- যেন ছায়াগুলোর দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়াতে লাগলো পরিবেশে।

লেটি আমার হাত ধরে টান দিয়ে বললো, “আমার সাথে আসো, তাড়াতাড়ি”।

উঠোনের ওপর দিয়ে হেঁটে অন্যপাশে চলে আসলাম আমরা। তোমাকে পরীদের বৃন্তটার ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি আমি,” বললো লেটি। “সেখানেই অপেক্ষা করবে তুমি আমার জন্যে। কোনভাবেই বের হবে না ওটার বাইরে”।

“কেন না?”

“কারণ খুব খারাপ কিছু একটা ঘটে যেতে পারে তোমার সাথে। তোমাকে এই মুহূর্তে খামারবাড়িতে নিয়ে যেতে পারবো না আমি। আর এই ব্যাপারটা একা একা সামলানোর ক্ষমতা নেই আমার। যা-ই ঘটুক না কেন, যা-ই দেখো চোখে এর বাইরে বের হবে না। তাহলেই নিরাপদে থাকবে”।

“কিন্তু এটা তো আসল নয়,” ওকে বললাম আমি। “শ্বাস কেটে বানানো হয়েছে বৃন্তটা”।

“সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে,” বললো লেটি। “এটার ভেতরে থাকলে কোন কিছু ক্ষতি করতে পারবে না তোমার,” এটুকু বলে আমাকে ঘাসের বৃন্তটার ভেতরে নিয়ে আসলো ও। আমার হাতে একবার আলতো চাপ দিয়ে বের হয়ে গেলো পরমুহূর্তেই। রোডেনড্রন গাছের ঝোপের মধ্য দিয়ে হারিয়ে গেলো ওপাশে।

ঘাসের বৃত্তের চারপাশে ছায়ার মত দেখতে জিনিসগুলো এসে জমা হতে লাগলো। নির্দিষ্ট কোন আকৃতি নেই ওগুলোর, শুধু এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে কিছু একটা আছে সেখানে। আড়চোখে তাকালে তাদের উপস্থিতি বোঝা যাচ্ছে। একমাত্র তখনই পাখিদের দেহাবয়বের সাথে খানিকটা মিল খুজে পেলাম ওগুলোর। ক্ষুধার্ত পাখিদের দেহাবয়ব।

এই মুহূর্তে ভয় যেভাবে জেঁকে বসেছে আমার মনে, সেরকমটা এর আগে কখনো হয়নি। কোন পাখির গানের সুর ভেসে আসছে না, ঝাঁ ঝাঁ পোকারাও ডেকে চলছে না অবিরাম। সবকিছু যেন থেমে আছে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ার শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। লেটি এখনও ফিরে আসেনি। কারো গলার স্বরও শুনতে পাচ্ছি না। শুধুমাত্র এই ছায়াগুলো বৃত্তটাকে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু ওগুলোর দিকে সরাসরি তাকালে সেখানে কিছুই চোখে পড়ে না।

সূর্য ধীরে ধীরে ঢলে পড়ছে পশ্চিমাকাশে। সন্ধ্যা নেমে আসবে খুব দ্রুত। ছায়াগুলোর তখন আরো সুবিধা হবে। সময়ের সাথে সাথে আরো অদৃশ্য হয়ে উঠছে ওগুলো। এখন তো আমার রীতিমত সন্দেহ হচ্ছে যে আদৌ সেখানে আছে কিনা ক্ষুধার্ত পাখির দল। কিন্তু বৃত্ত ছেড়ে বের হলাম না।

“এই ছেলে!”

ঘুরে তাকালাম ডাক শুনে। উঠোন পেরিয়ে আমার দিকে হেঁটে আসছেন তিনি। তাকে শেষবার যে পোশাকে দেখেছিলাম সেগুলোই পরে আছেন এখন একটা ডিনার জ্যাকেট, একটা সাদা শার্ট আর বো টাই। তার চেহারা এখনও টকটকে লাল, কিন্তু তার হাতজোড়া একদম সাদা। তাকে দেখে মানুষ কম মোমের পুতুল মনে হচ্ছে বেশি। যেমন মোমের পুতুল দেখেছিলাম মাদাম তুসো জাদুঘরের চেম্বার অফ হররসে। আমাকে তার দিকে তাকাতে দেখে একটা হাসি দিলেন, এখন মনে হচ্ছে যেন একটা মোমের পুতুল হাসছে জোর করে। ঢোক গিললাম শব্দ করে।

“কোন লাভ হবে না ছেলে,” বললেন ওপাল মাইনার। “যা ঘটবে ঘটবেই। তুমি শুধু একটু দেরি করিয়ে দিচ্ছো মাত্র”।

একটা কথাও বললাম না আমি। দেখতে লাগলাম তাকে। তার চকচকে কালো জুতোজোড়া অবস্থান করছে বৃত্তের ঠিক বাইরে, ভেতরটা স্পর্শও করছে না। যেন অদৃশ্য একটা বলয় ঘিরে রেখেছে ভেতরের জায়গাটুকুকে।

জোরে জোরে লাফাচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ড, কেউ পাশে থাকলে নির্ঘাত শব্দ শুনতে পেতো।

“ছেলেমানুষ তুমি একদম,” সাউথ আফ্রিকান টানে বললেন তিনি। “ওদের কাজ শেষ করতে হবে তো, নাকি! ওরা হচ্ছে শূন্যের শকুন। ওদের কাজ অপ্রয়োজনীয় সবকিছু খেয়ে শেষ করা। যাতে পরিস্কার থাকে সব জগত। তোমাকে এমন ভাবে সরানোর ব্যবস্থা করবে যে মনেই হবে না তোমার কোনদিন কোন অস্তিত্ব ছিল। ওদের কাছে সঁপে দাও নিজেকে। ব্যাথাও লাগবে না কোন প্রকার”।

তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। বড়রা এই কথাটা তখনই বলে যখন ব্যাথা লাগার সম্ভাবনা শতভাগ।

ধীরে ধীরে আমার চোখে চোখ রাখলেন মৃত ওপাল মাইনার। চোখের মণির জায়গাটা সাদা হয়ে আছে।

“তোমার বন্ধু তোমাকে বাঁচাতে পারবে না,” বললেন তিনি। “তোমার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছিল তখনই যখন অন্ধকারের কুহকিনী তোমাকে তার এই জগতে আসার প্রবেশদ্বার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। প্রবেশপথের একটা অংশ বাঁধা আছে তোমার হৃদয়ের সাথে।

“এসব আমি শুরু করিনি,” তাকে বললাম আমি। “আমার কোন দোষ নেই। আপনার মৃত্যুর কারণে শুরু হয়েছে এসব”।

“হ্যাঁ,” মৃত লোকটা জবাব দিলো। “বের হবে তুমি?”

ঘাসের বৃন্তটার ভেতরে যে গাছটা আছে সেটার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বসে চোখ বন্ধ করে রাখলাম। নড়ছি না একটুও। মনোযোগ অন্যদিকে ঘোরানোর জন্যে মনে মনে গান গাইতে লাগলাম

‘এলিস ইন ওয়াভারল্যান্ড’ বইয়ে এলিস যখন নিজের চোখের পানিতে সাঁতার কাটছিলো তখন একটা হুঁদুর তার কাছে এসে এই গানটা গেয়েছিল। পুরো গানের কথা এক নিঃশ্বাসে বলে যেতে পারি আমি।

কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে ওপাল মাইনারকে কোথাও খুঁজে পেলাম না আশেপাশে।

আকাশ আস্তে আস্তে ধূসর হয়ে আসছে। গোধূলীক্ষণের বেশি দেরি নেই। ছায়াগুলোকে এখন আর দেখতে পারছি না আমি। হয়তো আশেপাশের সবকিছুর সাথে একেবারে নিবিড়ভাবে মিশে গেছে ওগুলো।

বাসার দিক থেকে আমার বোন ছুটে আসলো আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে। ঠিক বৃত্তের বাইরে এসে থেমে গেলো। “তুমি কি করো?” জিজ্ঞেস করলো।

“কিছু না”।

“বাবা ফোন করেছে। তোমার সাথে কথা বলতে চায়”।

“না”।

“কি?”

“অমন কিছু বলেনি সে”।

“এখন ভেতরে না আসলে বিপদে পড়বে তুমি”।

এটা কি আসলেও আমার বোন কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই আমি। এখনও বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সে।

সাথে একটা বই থাকলে খুব ভালো হতো, অবশ্য এখন আর পড়ার মত আলো নেই বাইরে। সেই হুঁদুরের গাওয়া গানটা আবার গাইতে লাগলাম।

“আরসালা মস্কটন কোথায়?” জিজ্ঞেস করলো আমার বোন। “উপরের ঘরে ছিল সে, কিন্তু এখন আর খুঁজে পাচ্ছি না। রান্নাঘর আর বাথরুমেও নেই। ক্ষুধা পেয়েছে আমার”।

“নিজের জন্যে কিছু বানিয়ে নাও,” বললাম আমি। “আর বাচ্চা নেই তুমি”।

“আরসালা কোথায়?”

ক্ষুধার্ত শকুনের দল ছিড়ে খুবলে খেয়েছে তাকে। আর আমার ধারণা তোমাকেও তারাই নিয়ন্ত্রন করছে এখন- মনে মনে বললাম।

“বাবা মা ফিরে আসলে আমি বলবো যে আমার সাথে আজকে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে তুমি। তখন মজা বুঝবে”। এটা কি আসলেও আমার বোন কিনা সে সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি আমি। গলার আওয়াজ তো ওর মতই। কিন্তু ঘাসের বৃত্তের এপাশে এখনও পা রাখছে না সে। একবার ভেঙেচি কেটে আবার বাসার দিকে দৌড় দিলো সে।

এখনও আমার মাথায় ঘুরছে গানটা।

গোধূলীলগ্নও শেষের দিকে। আঁধার জেঁকে বসছে আশপাশের পরিবেশে। কিছুক্ষণ ধরে মশারা ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমণ করছে আমাকে। গলা, মাথা, হাত- কোথাও বাদ রাখছে না। মনে মনে লেটিকে ধন্যবাদ দিলাম ওর আত্মীয়ের এই অদ্ভুত পুরনো জামাকাপড়গুল আমাকে পরতে দেয়ার জন্যে। খুব বেশি জায়গায় এটার কারণেই কামড়াতে পারছে না মশাগুলো। থাপড় দিয়ে মারার চেষ্টা করছি ওগুলোকে। কয়েকটা মশা আমার কজিতে বসার

সাথে সাথে আক্রমণ করলাম। বেশিরভাগ উড়ে গেলেও একটা মশা পালাতে পারলো না। সে জায়গায় রক্ত দেখতে পেলাম আমি। আমার নিজের রক্ত, চুষে খেয়েছিল ওটা।

রাত নেমে এসেছে আর ঘুটঘুটে অন্ধকারে আর বাগানের একদম কোণায় বৃন্তটার ভেতরে বসে আছি আমি। আমাদের বাসায় আলো জ্বলে উঠতে দেখলাম এসময়।

অন্ধকারে সাধারণত ভয় লাগে না আমার। আসলে কোনকিছুকেই ভয় পাই না আমি। শুধু এখানে এই অন্ধকারে আর বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমার বন্ধু সেই যে গেছে, আসার কোন নাম নেই।

ইঁদুরের গাওয়া গানটা এখনও ঘুরছে মাথায়।

যেখানে আছি সেখানেই বসে থাকলাম। আরসালা মঙ্কটনকে শতচ্ছিন্ন হতে দেখেছি আমি নিজের চোখে। আর সেই শতচ্ছিন্ন টুকরোগুলোও শেষ করেছে সেই ক্ষুধার্ত পাখির দল। এই বৃন্তের বাইরে পা দিলে আমারও সেই একই পরিণতি হবে।

লুইস ক্যারলের এলিস ইন ওয়াভারল্যান্ডের বদলে অন্য বই নিয়ে ভাবতে লাগলাম। মাথা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই সব দুশ্চিন্তা।

টয়লেটে যাওয়া জরুরী দরকার আমার। বাসার দিকে তাকালাম। গাছটা থেকে মাত্র কয়েক কদম দূরে। কিন্তু বৃন্তের বাইরে এক পা দেয়ার সাথে সাথে কি হবে সেটা ভাবতেও ভয় লাগছে আমার। অন্ধকারেই কাজ সারলাম।

হঠাৎ একটা টর্চের আলো এসে পড়লো আমার চোখে। দেখতে পাচ্ছি না কিছু। বাবার গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। “এখানে কি করছো তুমি!”

“কিছুনা... বসে আছি,” কোনমতে জবাব দিলাম।

“হ্যাঁ, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। বাসায় আসো এখনই। খাবার লাগানো হয়েছে টেবিলে”।

নড়লাম না আমি। “না,” বলে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকলাম।

“বোকার মত কথা বলো না”।

“বোকার মত কথা বলছি না। এখানেই থাকবো আমি”।

“আসো বাবা,” মোলায়েম স্বরে বললো বাবা। “এসে পড়ো, আমার হারকিউলিস”।

একদম ছোট বেলায় আমাকে এই নামে ডাকতেন বাবা। নামের সাথে মিলিয়ে একটা গানও বানিয়েছিলো। খুব ভাল লাগতো আমার গানটা।

কিছু বললাম না আমি।

“তোমাকে এখান থেকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবো না আমি,” বললো বাবা। ধীরে ধীরে রেগে উঠছে। “বড় হয়েছে এখন তুমি”।

হ্যাঁ, মনে মনে ভাবলাম, সেটা করতে হলে বৃষ্টিটা পার হতে হবে তোমাকে। এখন আর বৃষ্টির এপার-ওপার জিনিসটা ভালো লাগছে না আমার। এটা তো আমার বাবা। ক্ষুধার্ত পাখিগুলোর পক্ষ থেকে পাঠানো মোমের তৈরি কোন নকল পুতুল নয়। রাত হয়ে গেছে, তাই বাবা এসেছে আমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে। সময় হয়েছে এখান থেকে বের হবার।

“আরসালা মঙ্কটন চলে গেছে। আর কখনো ফিরে আসবে না সে,” বললাম। “কি করেছে তুমি?” বিরক্ত শোনালো তার গলা। “খারাপ কিছু বলেছো? বেয়াদবি করেনি তো?”

“না”।

আবার আমার চেহারা বরাবর টর্চের আলো ফেললো বাবা। নিজেকে সামলাতে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে তার। “তাকে কি বলেছো সেটা গুনতে চাই আমি,” বললো সে।

“কিছুই বলিনি আমি। একা একাই চলে গেছেন তিনি”।

এটাই সত্য।

“বাসায় আসো এখন”।

“না বাবা... আমাকে থাকতে হবে এখানে,” অনুরোধের সুরে বললাম।

“এই মুহূর্তে বাসায় আসবে তুমি!” চিল্লিয়ে উঠলো বাবা। চেষ্টা করেও সামলাতে পারলাম না নিজেকে। কাঁপতে লাগলাম, চোখের কোণে পানির উপস্থিতি টের পাচ্ছি। জ্বলছে চোখ।

আমি কি আমার আসল বাবার সাথে কথা বলছি কিনা সেটা জানি না এখনও।

“তুমি আমার সাথে এভাবে জোরে জোরে কথা বললে ভালো লাগে না আমার,” বললাম।

“তুমি যখন অমানুষের বাচ্চার মত আচরণ করো তখন আমার ভালো লাগে না,” বাবা বললো। এখন পুরোদমে জল গড়াচ্ছে আমার চোখ দিয়ে। মাটিতে গর্ত করে সেখানে ঢুকে যেতে ইচ্ছে করছে।

গত কয়েক ঘন্টায় বাবার চাইতেও অনেক ভয়ঙ্কর জিনিসের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমার। এসময় একদম হঠাৎ করেই অবসানটা উদয় হল মাথায় এসবে আর কিছু যায় আসেনা আমার। টচটা পোহনের ছায়াবয়বের দিকে

তাকিয়ে বললাম, “ছোট একটা বাচ্চাকে কাঁদাতে এত ভালো লাগে তোমার? নিজেকে বড় বড় মনে হয়?” সাথে সাথে বুঝতে পারলাম যে কথাটা বলা উচিত হয়নি আমার।

টর্চের আলো ছাপিয়ে তার চেহারার যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, সেটুকুতে মনে হলো যেন অবাক হয়ে গেছে বাবা। একবার কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও বন্ধ করে নিলো। বাবাকে এর আগে কখনও এভাবে ভাষা হারিয়ে ফেলতে দেখিনি। একটু খারাপই লাগলো আমার। খুব দ্রুতই হয়তো মারা যাবো আমি। এভাবে তার সাথে কথা বলাটা উচিত হলো না।

টর্চের আলোটা সরে গেলো আমার চেহারার ওপর থেকে। “বাসাতেই আছি আমরা। ওভেনের ওপর রেখে দেবো তোমার খাবার,” ভেসে আসলো বাবার গলা।

টর্চের আলো উঠোন পেরিয়ে বাসার দিকে যেতে দেখলাম। একসময় চোখের আড়ালে চলে গেলো গোলাপ ঝাড়ের পাশ দিয়ে।

মনে মনে গান গাইতে লাগলাম আবার।

কেউ একজন হেসে উঠলো এসময়। গান বন্ধ করে আশেপাশে তাকালাম, কিন্তু কাউকে চোখে পড়লো না।

“বাহ! দুঃস্বপ্নের গান গাইছো দেখছি,” একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠলো। “একদম মিলে গেছে”।

কাছে হেঁটে আসলো সে। চেহারা অনেকটা বোঝা যাচ্ছে এখন। এখনও পুরোপুরি নগ্ন তার দেহ, ঠোঁটের কোণে হাসি। তাকে কয়েক ঘণ্টা আগে টুকরো টুকরো হতে দেখেছি আমি। কিন্তু এখন আবার আসল মানুষের মতন দেখাচ্ছে তাকে। তার পেছনে বাসার আলোগুলো দেখতে পেলাম, তার মধ্য দিয়ে।

“তুমি তো মারা গেছো,” বললাম তাকে।

“হ্যাঁ, আমাকে খেয়ে ফেলা হয়েছে,” আরসারা মঞ্চটন বললো।

“তুমি একটা ভ্রম! বাস্তব কিছু নও”।

“আমাকে তো খেয়ে ফেলা হয়েছে,” আবার বললো সে। “বাস্তব কিছু হবো কিভাবে গুনি? কিন্তু আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে ওদের ভেতর বসে হওয়ার অনুমতি দিয়েছে ওরা। ওখানটা অনেক ঠাণ্ডা, আমি বাদে আর কেউ নাই। তাই ওরা কথা দিয়েছে যে খেলা করার মত একটা জিনিস যোগাড় করে দেবে। যেটা অন্ধকারে সঙ্গ দেবে আমাকে। তুমি আমাকে খেয়ে ফেলা হলে তোমারও কোন অস্তিত্ব থাকবে না, আমার মত। তখন তোমাকে আমার

কাছে পাঠিয়ে দেবে ওরা। জগতের একদম শেষ দিন পর্যন্ত একসাথে থাকবো আমরা, খেলা করবো”।

হাতটা মুখের কাছে নিয়ে আমার দিকে একবার চুমুর ভঙ্গি করলো আরসালান মঙ্কটন।

“তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো আমি,” বললো।

এসময় রোডেনড্রন ঝাড়গুলোর পাশ থেকে কথার আওয়াজ ভেসে আসলো। অল্পবয়সী কারো কণ্ঠস্বর। খুশি খুশি ভঙ্গিতে বললো, “সব ঠিক হয়ে গেছে। নানীমা ব্যবস্থা নিয়েছে। বের হয়ে আসো এখন”।

অ্যাজালিয়া গাছগুলোর মাথার ওপর চাঁদ দেখা যাচ্ছে এখন।

বৃন্তের ভেতরে বসেই থাকলাম আমি, নড়লাম না।

“এসে পড়ো। বললাম তো, চলে গেছে ওরা,” লেটি হেম্পস্টক বললো।

“তুমি যদি আসলেই লেটি হেম্পস্টক হয়ে থাকো, তাহলে তুমি এখানে আসো,” বললাম।

কিন্তু ঝোপের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকলো মেয়েটা। হেসে উঠলো হঠাৎ... এরপর ছায়ায় পরিণত হলো।

“তোমার ক্ষিধে পেয়েছে,” বলে উঠল কণ্ঠস্বরটা, কিন্তু এখন আর লেটির মত শোনাচ্ছে না ওটা। আমার কল্পনাও হতে পারে কণ্ঠটা। পরক্ষণেই আবার শুনলাম, “ক্লান্ত হয়ে পড়েছো তুমি। তোমার পরিবার ঘৃণা করে তোমাকে। তোমার কোন বন্ধু নেই। আর আফসোসের সাথে তোমাকে জানাচ্ছি, লেটি হেম্পস্টক আর কোনদিন ফিরে আসবে না”।

কে কথা বলছে সেটা দেখতে পারলে খুব ভালো হতো। অচেনা কোন কিছুকে ভয় পাওয়ার চেয়ে পরিচিত কিছুকে ভয় পাওয়া অনেক ভালো, যাকে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়।

“তোমার জন্যে কারো কোন মাথাব্যথা নেই,” একদম স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাটা বললো অদৃশ্য কণ্ঠস্বরটা। “এখন বৃন্তটার ভেতর থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে আসো। শুধু এক কদম বাইরে বের হলেই হবে। তোমার জীবনের সব দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দেবো আমরা। অতীতের দুঃখ, ভবিষ্যতের দুঃখ- সব”।

এখন আর একটা কণ্ঠস্বর নয়, দু’টা কণ্ঠস্বর একসাথে কথা বলছে। কিংবা একশোটা, বুঝতে পারছি না আমি। অনেকগুলো কণ্ঠস্বর।

“এই পৃথিবীতে কিভাবে খুশি থাকবে তুমি? তোমার হৃদয়ে তো একটা শূন্যস্থান রয়ে গেছে। যেনতেন শূন্যস্থান নয়। একটা প্রবেশদ্বার ওটা। এক

জগত থেকে অন্য জগতে যাওয়া যায় ওটার মাধ্যমে। সেই সব জায়গা থেকে অনেকে ডাকবে তোমাকে। তাদের কখনো ভুলতে পারবে না তুমি। কিন্তু তাদের অস্তিত্বের কথা কখনো বোধগম্য হবে না তোমার, সবসময় একটা পর্দার আড়ালে থাকবে তারা। রাতে ঘুমোতে পারবে না কখনও। কিন্তু এক সময় বাধ্য হবে চিরতরে চোখ বুজতে। তোমাকে বিষ দিয়ে হত্যা করে অ্যানাটমির লোকের কাছে বিক্রি করে দেবে তোমার পরিবারের লোকজন। এসবের হাত থেকে বাঁচতে পারো তুমি, যদি এখন বের হয়ে আসো বৃত্তের ভেতর থেকে। নিজেকে সাঁপে দাও আমাদের হাতে। আর সেটা না করলে একসময় এখানেই অনাহারে মৃত্যু হবে তোমার, তখন আর এই বৃত্ত রক্ষা করতে পারবে না তোমাকে। তোমার হৃদয় ছিড়ে খাবো আমরা, বন্দি করে রাখবো তোমার আত্মাকে”।

“সেটা হতেও পারে,” বললাম সেই অন্ধকারের কণ্ঠস্বরগুলোর উদ্দেশ্যে। “আবার নাও হতে পারে। আর হলেও কিছু যায় আসে না আমার। এখানে বসে লেটি হেম্পস্টকের জন্যে অপেক্ষা করবো আমি। একসময় আমার কাছে ফিরে আসবেই সে। আর এখানে যদি আমার মৃত্যুও হয়, তাহলে ওর জন্যে অপেক্ষা করতে করতেই মরবো। তোমাদের মত জঘন্য জিনিসগুলোর হাতে মৃত্যুর চেয়ে সেই মৃত্যু অনেক ভালো হবে। তোমরা আমাকে আমার হৃদয়ে আটকে থাকা এমন একটা জিনিসের কারণে মারতে চাইছো, যেটার ওপর কোন হাত নেই আমার”।

নিরবতা নেমে আসলো। ছায়াগুলো যেন আবার রাতের অংশ হয়ে গেছে। যা যা বললাম সেগুলো নিয়ে আবার চিন্তা করতে লাগলাম। সত্য কথাই বলেছি আমি। সাত বছরের জীবনে এই প্রথম অন্ধকারকে ভয় লাগছে না আমার। আর লেটির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আসলেও মরতে রাজি আছি আমি (একজন সাত বছরের বাচ্চার পক্ষে যতটা রাজি হওয়া সম্ভব)। ওর জন্যে অপেক্ষা করবো কারণ ও আমার বন্ধু।

সময় যেতে লাগলো। অপেক্ষা করছি কখন আবার ছায়াগুলো কথা বলবে আমার সাথে। আবার হয়তো কেউ আসবে আমাকে উল্লিখে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু কিছুই ঘটছে না। শুধু অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি।

চাঁদ একদম মাথার ওপরে এখন। অন্ধকারে সমুদ্র এসেছে চোখ। আগের গানটা গাওয়া শুরু করলাম আন্তে আন্তে। পুরো গানটা শোনালাম নিজেকে।

একবার, দুইবার, তিনবার। গানের সব কথা একদম পরিষ্কার মনে আছে আমার।

তুমি অসম্পূর্ণ, তোমার হৃদয় শূন্য
তোমার ঘুম অতল, তোমার ভাবনা শীতল,
আর তোমার শরীর ভঙ্গুর, সেখানে বাজে বার্ষিক্যের সুর,
তোমার তৃষ্ণা অফুরান,
আর এ এক মহাপুরাণ।।
তুমি অসম্পূর্ণ.....

অধ্যায় ১৩

একসময় লেটি ফিরে আসলো। আসল লেটি হেম্পস্টক, আমাকে ঘাসের বৃত্ত থেকে বের করার উদ্দেশ্যে পাঠানো মোমের তৈরি কোন পুতুল নয়। ওর হাতে একটা পানির বালতি। বহন করার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বেশ ভারি বালতিটা। কোনরকম দ্বিধাবোধ ছাড়া বৃত্তের দাগ পার হয়ে আমার কাছে চলে আসলো ও।

“দুঃখিত, তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম,” বললো ও। “যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগলো কাজটা করতে। আমাদের একদমই সহযোগিতা করতে চায়নি ওটা। শেষে নানীমাকেও আমার সাথে হাত লাগাতে হয়। তার সাথে তর্ক করার সাহস নেই ওটার। তবুও বিন্দুমাত্র সাহায্য করেনি...”

“কি?” জিজ্ঞেস করলাম। “কিসের কথা বলছো তুমি?”

বালতিটা আমার পাশে ঘাসের ওপর সাবধানে নামিয়ে রাখলো লেটি, একফোটা জলও ছলকে পড়লো না। “সাগরটার কথা বলছি,” বললো ও, “যেতে চাচ্ছিলো না ওটা। নানীমাকে অনেক জোরাজুরি করতে হয়। অবশেষে ওটাকে এই বালতিটাতে তুলে রাখতে সক্ষম হই আমরা”।

এসময় খেয়াল করলাম যে বালতিটা জ্বলজ্বল করছে, সবুজাভ নীল একটা আভা ছড়াচ্ছে ওটা থেকে। লেটির চেহারা দেখতে পাচ্ছি সেই আভায়। বালতির ভেতরের পানিটুকুতে ছোট ছোট ঢেউ খেলা করছে, একদম আসল সাগরের মতন।

“কিছুই বুঝতে পারছি না”।

“তোমাকে তো সাগরটার কাছে নিয়ে যাতে পারিনি,” বললো ও। “কিন্তু তার মানে এটা না যে ওটাকে তোমার কাছে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে পারবো না”।

“আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে লেটি,” বললাম, “এসব ভালো লাগছে না মোটেও”।

“মা রাতের খাবার তৈরি করেছে। কিন্তু তোমাকে আরো বেশ খানিকটা সময় না খেয়ে থাকতে হবে। এখানে একা একা থাকতে কি ভয় লাগছিলো তোমার?”

“হ্যাঁ”।

“তোমাকে এই বৃত্তের ভেতর থেকে বাইরে বের করার চেষ্টা করেছে?”

“হ্যাঁ” ।

আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরলো ও । “তবুও এখান থেকে বের হওনি তুমি, ওদের কথায় কান দাও নি । এটাই আশা করেছিলাম তোমার কাছ থেকে,” মৃদু হেসে বললো লেটি, গর্বিত শোনাচ্ছে ওর গলা । ক্ষুধা আর ভয় দুটাই ভুলে গেলাম কিছুক্ষণের জন্যে ।

“এখন কি করবো আমি?” জিজ্ঞেস করলাম ওকে ।

“এখন,” বললো লেটি । “এই বালতিটার ভেতরে নামবে তুমি । জুতা খোলা লাগবে না । শুধু পা দাও” ।

কেন যেন বিন্দুমাত্র অবাক হলাম না ওর কথাটা শুনে । আমার একটা হাত ছেড়ে দিলো লেটি, অন্য হাতটা ধরে আছে শক্ত করে । তোমার হাত আর কখনোই ছাড়বো না আমি, যতক্ষণ না তুমি নিজের মুখে ছাড়তে বলো- মনে মনে ভাবলাম ।

এক পা বালতির পানির ভেতর ডুবলাম, প্রায় উপচে পড়ার অবস্থা হলো । তলাটা ঠাণ্ডা ঠেকছে পায়ে । আরেক পা ভেতরে দেয়ার সাথে সাথে ডুবে গেলাম ভেতরে । লেটি হেম্পস্টকের সাগরের পানি গ্রাস করে নিলো আমাকে । ঠিক যেন একটা পাথর ছেড়ে দেয়া হয়েছে ওপর থেকে ।

অনুভূতিটা এভাবে ব্যাখা করা যায় উল্টোদিকে হাঁটতে হাঁটতে সুইমিং পুলে পড়ে গেলে যেমন লাগে, ঠিক সেরকম । চোখ বন্ধ করে রাখলাম শক্ত করে ।

সাঁতার পারি না আমি । জানি না যে এই মুহূর্তে কোথায় আছি, কিন্তু এটা টের পেলাম যে লেটি এখনও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছে আমার এক হাত ।

দম বন্ধ করে আছি ইচ্ছে করে ।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না নিঃশ্বাস না নিয়ে । একসময় বড় করে শ্বাস নিতে বাধ্য হলাম । ভেবেছিলাম যে পানি ঢুকে যাবে নাকে মুখে, মারা যাবো আমি ।

কিন্তু সেরকম কিছু হলো না । নাকে, ফুসফুসের ভেতরে ঠাণ্ডা পানির উপস্থিতি অনুভব করতে পারছি (আদৌ যদি পানি হয়ে থাকে ওটা) । কিন্তু দম আটকে আসলো না মোটেও ।

মনে হয় এই সাগরের পানিতে শ্বাস নিতে কোন সমস্যা হয় না আমার প্রথম চিন্তা ছিল এটাই ।

আর দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা মনে হলো সব জানি আমি। লেটি হেম্পস্টকের সাগর প্রবাহিত হচ্ছে আমার ভেতরে। আর সেটার অভ্যন্তরে আছে ডিম থেকে গোলাপ পর্যন্ত সবকিছু। ডিমটা দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে সেটাও জানি আমি- সৃষ্টির শুরু, যেভাবে শূন্য থেকে ভাঙনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে সবকিছু। আর প্রস্ফুটিত গোলাপের মতই সম্প্রসারিত হচ্ছে আমাদের এই মহাজগৎ। একসময় মারা যাবে এই গোলাপ, সেই সাথে ধ্বংস হবে সব কিছু। আরেকটা বিগ ব্যাং এর সূচনা ঘটবে।

আমি এটাও জানি যে সেই সময়টাতেও থাকবেন নানীমা হেম্পস্টক, যেমনটা ছিলেন গতবারেরটার সময়।

যে পৃথিবীতে নিত্য হেঁটে বেড়াই আমরা, সেটাকে দেখলাম এক ভিন্ন আলোকে। কতই না ঠুনকো সবকিছু! একদম পাতলা নাজুক কাঁচের মতন। একটু এদিক ওদিক হলেই গুড়িয়ে পড়বে। সেই পাতলা কাঁচের ওপাশে অপেক্ষা করছে- ক্ষুধা, মৃত্যু আর অন্ধকার। ওপর এবং নিচ- দু'জায়গা থেকেই পৃথিবীটাকে দেখছি আমি। সাধারণ দৃষ্টিচক্ষুর আড়ালে যে পথগুলো রয়েছে সেগুলো ও নজর এড়ালো না। হঠাৎ সবকিছুই বোধগম্য মনে হতে লাগলো আমার। মস্তিষ্ক ভরে উঠলো এসব তথ্যে, ঠিক যেভাবে সাগরের পানিতে ভরে উঠলো আমার ভেতরটা।

সবকিছু যেন ফিসফিস করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে আমাকে। আর সেই কথাগুলো বুঝতে পারছি আমি।

চোখ খুললাম। আমার বাইরের জগতটা কেমন সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছে।

পানির গভীরে ভেসে আছি আমি।

নিচের দিকটায় অনন্ত নীল মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে। ওপরেও একই দৃশ্য। আর এরপর, মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকালাম। এখনও আমার হাত ধরে আছে ও, বলেছিলো যে ছাড়বে না, কথা রেখেছে।

প্রথমে বুঝতে পারলাম না যে কিসের দিকে তাকিয়ে আছি। আরসাদা মঙ্কটনের দেহটা তৈরি হয়েছিল ধূসর, জীর্ণ ক্যানভাস কাপড় দিয়ে। আর লেটি হেম্পস্টকের দেহটা বরফরঙা মসৃণ রেশমী কাপড়ের মতো মাঝে মোমবাতির মত আগুনরঙা ফুটকি।

পানির নিচেও কি মোমবাতি জ্বলতে পারে? পারে, এই সাগরে সবই সম্ভব। কিভাবে জ্বলতে পারে সেটাও বুঝতে পারছি আমি। কিন্তু সেটা ঠিক ডার্ক ম্যাটারের উপস্থিতি বোঝার মত আমরা জানি না যে ওটার উপস্থিতি আছে,

কিন্তু সেটার কোন প্রমাণ খুঁজে পাই না। আমার মনে হতে লাগলো যে পুরো পৃথিবীর নিচ দিয়েই বয়ে চলেছে একটা সাগর। ঠিক যেমন বন্দরগুলোতে পুরনো কাঠের তৈরি ঘাটের নিচ দিয়ে বয়ে চলে পানি। এই সাগরটার ব্যাপ্তি অনন্ত, অসীম। কিন্তু একটা বালতির মধ্যে আবার ঠিকই এঁটে যায়। তবে এর পেছনে নানীমা হেম্পস্টকের ভূমিকা আছে, তার অনুরোধেই সম্ভব হয়েছে ঘটনাটা।

ফ্যাকাসে রেশমী কাপড় আর মোমবাতির আলোর মত লাগছে লেটি হেম্পস্টককে। চিন্তা করতে লাগলাম যে এখানে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে লেটির চোখে। সেই সাথে এটাও বুঝতে পারলাম যে এরকম একটা জায়গায় যেখানে সব প্রশ্নের উত্তর জানা সম্ভব, শুধুমাত্র এই প্রশ্নটার উত্তরটাই জানা যাবে না শত চেষ্টা সত্ত্বেও।

মোমবাতির আলোতে পরিপূর্ণ রেশমী কাপড়টা পানির ভেতরে ভাসছে। এসময় মৃদু শ্রোত বয়ে গেলো আশেপাশে। লেটির চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো সেই রেশমী কাপড়টার জায়গায়।

“আমি সত্যিই দুঃখিত,” লেটির স্বর কানে আসলো।

“কেন?”

কোন জবাব দিলো না ও।

বসন্তকালে মৃদু আরামদায়ক বাতাসে যেরকম অনুভূতি হয়, এই সাগরের মৃদু শ্রোতে ঠিক সেরকম অনুভূতি হচ্ছে আমার। কোন প্রকার ঠাণ্ডা লাগছে না, ক্ষুধাও দূর হয়ে গেছে। শুধুমাত্র প্রশান্তিদায়ক একটা অনুভূতি। যেন জগতের সব জটিলতা দূর হয়েছে, সব কিছুর উর্ধ্বে আমি। এখানে বাকিটা জীবন কাটিয়ে দিতেও কোন সমস্যা হবে না আমার। এখান থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি।

“পারবে না তুমি,” বললো লেটি। “তোমাকে ধ্বংস করে দেবে সেটা”।

কিছুই এখন মারতে পারবে না আমাকে- এটা বলতে যাবো, এসময় আবার বলে উঠলো লেটি, “তোমাকে মারবে না, ধ্বংস করবে। শুষ্ক নৈর্দেহ তোমার অস্তিত্ব। তোমার সত্ত্বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ছড়িয়ে পড়বে সব জায়গায়। কিন্তু একক সত্ত্বার কোন উপস্থিতি থাকবে না। মানে বুঝতে পারছো? তুমি আর তুমি থাকবে না। হয়ে পড়বে সব কিছুর ক্ষুদ্র একটা অংশ মাত্র”।

ওর সাথে তর্ক করতে ইচ্ছে করছে আমার। বলতে ইচ্ছে করছে যে ওর ধারণা ভুল। এখানে এই অবস্থায় ভালো লাগছে আমার। কখনোই ফিরে যাবো না এখান থেকে।

আর ঠিক এই সময়ে পানির বাইরে বের হয়ে আসলাম। কেশে উঠলাম ভীষণভাবে। হাঁটুপানিতে দাঁড়িয়ে আছি আমি, লেটিদের খামারের পেছনের পুকুরটায়। আর লেটি দাঁড়িয়ে আছে পাশে, এখনও ধরে আছে আমার হাত। আবারও কেশে উঠলাম। মনে হচ্ছে যেন পানি ঢুকে গেছে আমার নাকে, ফুসফুসে। বুক ভরে পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস নিলাম আমি। লেটিদের বাসার লাল টালির চালের ওপরে পূর্ণচাঁদটা দেখতে পেলাম। ঠিক সেই মুহূর্ত পর্যন্তও সবকিছু পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম আমি। কিভাবে এরকম একটা চাঁদ বানাতে হবে, যেটার আঁকার ইচ্ছেমত বদলে দেয়া যাবে সেটা বুঝতেও কোন সমস্যা হচ্ছে না।

কিন্তু লেটি আমাকে পুকুরের বাইরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে ফিকে হয়ে আসছে সব তথ্য।

এখনও সকালের সেই অদ্ভুত পোশাকগুলো আমার পরনে। আর পানি থেকে ডাঙ্গায় পা রেখে বুঝতে পারলাম যে ওগুলো একদম শুকনো। সাগরটা আবার ফিরে এসেছে পুকুরের ভেতরে। আর আমি কিছুক্ষণ আগেও যা যা জানতাম সেসব রয়ে গেছে ওখানে। ঠিক যেন স্বপ্নের মত। আমি জানি যে স্বপ্নটা দেখেছি, কিন্তু কি দেখেছি সেটা মনে করতে পারছি না।

চাঁদের আলোয় লেটির দিকে তাকালাম। “তোমার জন্যে কি ব্যাপারটা এরকমই?”

“কোন ব্যাপারটা কিরকম?”

“এই জগতের সব কিছু জানো তুমি?”

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলো ও। হাসছে না এখন, “সবকিছু জানাটা বড্ড একঘেয়ে। এখানে থাকার সময়টা ওসব ভুলে যেতে হবে”।

“তারমানে একসময় ঠিকই সবকিছু জানতে তুমি?”

ভ্রমজোড়া কুঁচকে গেলো ওর, “সবাইই জানতো। বললাম তো তোমাকে, সেরকম কোন ব্যাপার না এটা। আর এসব নিয়ে খেলতে হলে তোমাকে সব ত্যাগ করতেই হবে”।

“কি খেলতে হলে?”

“এই সবকিছু,” বলে হাত দিয়ে বাড়িটা আর আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলো ও, যেখানে ভাসছে অদ্ভুত সুন্দর চাঁদটা।

ও কি বোঝাতে চাইছে সেটা জানতে পারলে ভালো হতো। বড্ড হেয়ালি মনে হচ্ছে ওর কথাবার্তা এখন। যেন একসাথে কোন একটা স্বপ্ন দেখেছি

আমরা, সেটার ব্যাপারে বলছে। একবার মনে হলো যে প্রায় বুঝেই গেছি, কিন্তু পরক্ষণেই দূর হয়ে গেলো সে অনুভূতি।

“তোমার নিশ্চয়ই ক্ষুধা পেয়েছে,” লেটির কথায় সংবিত্ত ফিরে পেলাম। টের পেলাম এত ক্ষিধে পেয়েছে যে মাথা রীতিমত ঘুরছে।

রান্নাঘরের বিশাল টেবিলটাতে আমি যেখানে বসি সেখানে একটা পেন্সট সাজিয়ে রাখা। সেটার ওপরে শেফার্ড’স পাই, মাংস আর সবজি দেখতে পেলাম। সাধারণত বাসার বাইরে অন্য কোথাও খেতে খুবই অস্বস্তি লাগে আমার, কিন্তু হেম্পস্টকদের এখানে সেই অস্বস্তিটা কাজ করে না। ওদের সব খাবার খুবই সুস্বাদু।

জিনি হেম্পস্টক আছেন রান্নাঘরে, অ্যাপ্রনটা এখনও তার পরনে। তার সাথে কোন কথা হলো না আমার, মাথা নিচু করে চুপচাপ খেতে লাগলাম। মেয়ের সাথে নিচু গলায় কথা বলছেন তিনি।

“খুব তাড়াতাড়ি এখানে পৌঁছে যাবে ওরা,” বললো লেটি। “বোকা নয় ওগুলো। আর যেটা দরকার সেটা না নেয়া পর্যন্ত এখান থেকে ফিরবে না”। নাক দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ করলেন জিনি হেম্পস্টক। রান্নাঘরের উষ্ণতায় তার গাল একদম লাল হয়ে উঠেছে। “ওগুলো তো শুধু পারে বড় বড় কথা বলতে। মুখ ছাড়া আর কি আছে ওদের?”

কাউকে আগে কখনও এরকম মন্তব্য করতে শুনিনি আমি। অবশ্য খুব একটা ভুল মনে হলো না তার কথা, কারণ ঐ জিনিসগুলো কিভাবে আরসালা মস্কটনকে ছিড়ে খুবলে খেয়েছে সেটা দেখেছি আমি। সুযোগ পেলে আমাকেও খুবলে খাবে, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

“ওদের এতগুলোকে একসাথে এর আগে কখনও দেখিনি আমি,” বললো লেটি। “আগের দিনগুলোতে যখন এখানে আসতো, তখন সংখ্যা একদমই কম থাকতো”।

আমার দিকে এক গম্ভীর পানি এগিয়ে দিলেন লেটির মা। “সেটা তোমার নিজের দোষেই হয়েছে,” লেটিকে বললেন তিনি। “তুমিই ওদের এখানে আসতে ইশারা করেছো। যেভাবে ঘন্টা বাজিয়ে খাবারের জন্যে ডাকা হয়। সবগুলোই যে উড়ে এসেছে এখানে সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে না আমার”।

“আমি শুধু চাইছিলাম ঐ জিনিসটাকে যেভাবেই হোক এখান থেকে দূর করতে,” লেটি বললো।

“অন্ধকারের কুহকিনী! নামও দিয়েছিল নিজের একখান!” ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বললেন জিনি হেম্পস্টক। “এরকম জিনিসগুলো একবার নিজের খাঁচা থেকে

বের হলে বড্ড বাড় বেড়ে যায়। তাদের শিকার করার জন্যেও যে অপেক্ষা করছে অনেকে সেটা মাথায় থাকে না। যাইহোক, এখন আরো বড় উটকো ঝামেলা এসে জড়ো হয়েছে। সেগুলোকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের, যেমনটা করেছিলাম গত কয়েকবার। এরকম কাজ তো আগেই করেছি আমরা, তাই না?”

“মনে হুঁস না,” লেটি বললো। “প্রতিবারই ছারপোকার মত জিনিসগুলকে ফেরত পাঠিয়ে দিতাম আমরা, তাই ক্ষুধার্ত পাখিগুলোর এখানে থাকার কোন প্রয়োজন হতো না। স্বাধীনতা দিবসের ঘটনটার সময় এমনটাই হয়েছিল। কাজ শেষে আপনা আপনিই দূর হয়ে গিয়েছিল ওগুলো, আমাদের কিছু করতে হয়নি”।

“ঐ একই কথা,” কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন ওর মা। “এবার নাহয় আমাদের একটু কষ্ট করতে হবে”।

“ওরা এসেছে কোথা থেকে?”

এখন একটু আস্তে আস্তে খাচ্ছি আমি, আর খুব বেশি খাবার অবশিষ্ট নেই পেম্পটে। কাঁটাচামচ দিয়ে পাইয়ের শেষ অংশটুকু পেম্পটে নাড়াচাড়া করছি।

“কোথা থেকে এসেছে সেটায় কিছু আসে যায় না,” বললেন জিনি হেম্পস্টক।

“এক সময় না এক সময় ফেরত যেতেই হবে অপেক্ষা করতে করতে”।

“ওদের দূরে সরানোর চেষ্টা করেছি আমি,” একদম সহজ ভাবে কথা বলছে লেটি। “কিন্তু আঁকড়ে ধরার মত কিছু পাইনি। তাই একটা প্রতিরক্ষা বলয় দিয়ে আটকে রেখেছিলাম, কিন্তু খুব বেশিক্ষণ কাজে দিতো না ওটা। এখানে অবশ্য একদম নিরাপদ আমরা। খামারের ভেতরে আমাদের অনুমতি ছাড়া কিছু প্রবেশ করতে পারবে না”।

“প্রবেশও করতে পারবে না, বেরও হতে পারবে না,” আমার খালি পেম্পটটা সরিয়ে সেখানে এক বাটি কাস্টার্ড রাখতে রাখতে বললেন জিনি হেম্পস্টক। আনন্দের সাথে বাটিটা খালি করার কাজে লেগে পড়লাম আমি।

(ছোটবেলার কথা ভেবে এখন আর স্মৃতিকাতর হই না। কিন্তু আগে ছোটখাট ব্যাপারগুলো যেভাবে উপভোগ করতাম সেটা ভারবক্ষে কিছুটা মন খারাপ হয়। যা ঘটবে সেটার ওপরে তো কোন হাত নেই আমাদের, যে ব্যাপারগুলো আমাদের কষ্ট দেবে সেগুলো থেকে দূরে থাকারও সম্ভব নয়। কিন্তু যে বিষয়গুলো আমাকে খুশি করত, সেগুলো উপভোগের চেষ্টা করতাম পুরোদমে। এই যেমন কাস্টার্ডটা, ওটা মুখে দিতেই কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে গেলাম সব বিপদের কথা)।

হয়তো আবার কখনো বাসায় ফিরে যেতে পারবো না আমি, মৃত্যুবরণ করবো কিছুক্ষণের মধ্যেই। তবুও রাতের খাবারটা উপভোগ করলাম।

লেটি হেম্পস্টকের ওপর ভরসা আছে আমার।

রান্নাঘরের বাইরে কি ঘটছে সেটা জানি না আমি। এসময় হেম্পস্টকদের মোটা বেড়ালটা (ওটার নাম জিজ্জেন্স করা হয়ে ওঠেনি কোন দিন) ভেতরে ঢুকলো। ওটাকে দেখে আরেকটা কথা মনে হল আমার।

“মিসেস হেম্পস্টক? বেড়াল ছানাটা কি এখনও আছে এখানে?”

“নাহ নেই। সন্ধ্যার দিকে বেরিয়েছে বাইরে। সারাদিন হলরুমের চেয়ারটায় ঘুমিয়েছে”।

ওটার লোমশ গায়ে হাত বোলাতে পারলে ভালো হতো। বিদায় জানাতে পারতাম।

“আজ রাতে যদি মারা যাই আমি,” এটুকু বলে থেমে গেলাম। কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না। হয়তো মা বাবাকে আমার পক্ষ থেকে বিদায় জানানোর কথা বলতাম। কিংবা আমার বোনের ব্যাপারে অভিযোগ করতাম যে তার সাথে আমার মত খারাপ কিছু ঘটেনা। নিরাপদ একটা জীবন ওর, আর আমার জীবনের পদে পদে বিপদ। আমি আর কিছু বলার আগেই কথা বলে উঠলেন জিনি হেম্পস্টক।

“কেউ মারা যাবে না আজকে,” দৃঢ় কণ্ঠে বললেন তিনি। আমার সামনে থেকে খালি বাটিটা নিয়ে সিন্ধের নিচে ধুয়ে ফেললেন। এরপর অ্যাপ্রনটা খুলে রেখে ভেতরে হলরুমে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর যখন ফেরত আসলেন তখন তার পরনে একটা বাদামী রঙের কোট আর ওয়েলিংটন বুট। লেটিকে দেখে অবশ্য জিনি হেম্পস্টকের মত আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে না। কিন্তু ওর মা’র চাইতে ওর বয়স আর অভিজ্ঞতা দু’টোই কম, এটা স্বীকার করতেই হবে। তার আত্মবিশ্বাস সাহস যোগালো আমাকে। তার দু’জনের ওপরই ভরসা আছে আমার।

“নানীমা হেম্পস্টক কোথায়?” জিজ্জেন্স করলাম।

“শুয়ে আছে,” মিসেস হেম্পস্টক বললেন। “বয়স হয়েছে তার”।

“তার আসল বয়স কত?” কোন উত্তর পাবো না জেনেও প্রশ্নটা করলাম।

জবাবে কেবল হাসলেন মিসেস হেম্পস্টক। লেটি একবার কাঁধ ঝাঁকালো।

লেটির হাত ধরে খামার থেকে বের হলাম আমি, এবার আর ছাড়ছি না মোটেও।

পেছনের দরজা দিয়ে রান্নাঘরে যখন ঢুকেছিলাম আমরা, বাইরে ছিল সেই পূর্ণচাঁদের আলো। বসন্তের বাতাস বইছিল আশেপাশে। কিন্তু লেটি আর ওর মা'র সাথে বাইরে বের হয়ে দেখলাম আকাশের চাঁদটা অর্ধেকের চেয়েও ছোট হয়ে গেছে। একটা বাঁকা হাসির মত বুলছে আকাশে। আর সবদিক দিয়ে বাতাস এসে ঝাঁপটা দিচ্ছে চোখে মুখে। সেই সাথে টিপটিপ বৃষ্টি।

খামারের উঠোনের ভেতর দিয়ে হেঁটে গলিতে পৌঁছুলাম আমরা। একটা বাঁক পেরিয়ে অন্য পাশে বের হয়ে আসলাম। এই অন্ধকারের ভেতরেও বুঝতে সমস্যা হল না যে কোথায় এসেছি আমরা। এখানেই শুরু হয়েছিল যাবতীয় ঘটনা। এখানেই আত্মহত্যার আগে আমার বাবার মিনিভ্যানটা পার্ক করে রেখেছিল সেই ওপাল মাইনার। গাড়ির ভেতরে একা একা মৃত্যু হয়েছিল তার, হারানো টাকার ব্যাপারে আফসোস করতে করতে। খেয়াল করলাম জায়গাটা হেম্পস্টক খামারের সীমানার মধ্যেই।

“নানীমা হেম্পস্টককে জাগানো উচিত আমাদের,” বললাম।

“সেটা সম্ভব না,” লেটি বললো। “নানীমা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন অনির্দিষ্ট সময় ধরে ঘুমান। সেটা কয়েক মিনিট হতে পারে আবার কয়েক বছরও হতে পারে। তখন তাকে জাগানো যায় না”।

এই সময় জিনি হেম্পস্টক হাঁটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন গলির মাঝ বরাবর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন উল্টোদিকে।

“দেখা দাও এবার,” জোরে অন্ধকারের উদ্দেশ্যে বললেন তিনি। “বোঝাপড়া হয়ে যাক!”।

কোন জবাব আসলো না। কেবল ভেজা বাতাস বয়ে যাবার শব্দ।

“মনে হয় চলে গেছে ওরা,” লেটি বললো।

“সেটা হলে তো ভালোই হতো,” মিসেস হেম্পস্টক বললেন। “এত ঝামেলা করতে হতো না আমাদের”।

অপরাধবোধ কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে। এসব আমার কারণেই হয়েছে। সেদিন যদি লেটির হাতটা না ছাড়তাম আমি, তাহলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। আরসিলা মঙ্কটন, ক্ষুধার্ত পাখির দল এগুলো আমার কারণেই এখানে এসেছে। যদি অতীতে ফিরে গিয়ে সেদিনের ঘটনাটা মুছে ফেলতে পারতাম, তাহলে বেশ হত। একটা বুদ্ধি আসলো মাথায়।

“নানীমা হেম্পস্টক গতরাতে যেভাবে আমার জীবন থেকে বাখটাবের ঘটনাটা বের করে নিয়েছেন সুই-সুতা আর কেঁচি ব্যবহার করে, সেভাবে আমার হৃৎপিণ্ড থেকে ঐ প্রবেশদ্বারটা বের করে নেয়া যায় না?”

অন্ধকারের ভেতরেই আমার হাতে চাপ দিলো লেটি।

“সেটা নানীমা থাকলে হয়তোবা সম্ভব হত,” বললো ও। “আমার পক্ষে সম্ভব না ওটা। মা’ও পারবে বলে মনে হয় না। সময়ের বিশাল চাদর থেকে কিছু একটা কেটে বের করে এনে আবার জোড়া লাগিয়ে দেয়া খুবই কঠিন আর বিপজ্জনক কাজ। খেয়াল রাখতে হবে যে সেলাইয়ের কোন চিহ্ন যাতে না রয়ে যায়। আর এই ব্যাপারটা আরো কঠিন। নানীমাও তোমার হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি না করে ঐ জিনিসটা বের করে আনতে পারবে বলে মনে হয় না। আর বেঁচে থাকার জন্যে হৃদয়ের দরকার তোমার,” এটুকু বলে থেমে গেলো লেটি। “ওরা আসছে,” কিছুক্ষণ পর বললো।

কিন্তু ও সাবধান করার আগেই বুঝতে পেরেছিলাম সেটা আমি। বুঝতে পারছিলাম যে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। জীবনে দ্বিতীয়বারের মত আশেপাশের সবকিছু সোনালী আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখলাম। গাছ, ঝোপঝাড়, ড্যাফোডিল ফুল সবকিছু জ্বলজ্বল করছে। অদ্ভুত এক ধরণের মুগ্ধতা আর ভয় একসাথে ভর করেছে আমার মনে। অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম চারপাশ। খেয়াল করলাম যে লেটিদের খামারবাড়ির পেছনের অংশ, যেখানে সাগরটা অবস্থিত সেদিকটা সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল।

অনেকগুলো ডানা ঝাপটানোর শব্দ কানে আসলো আমার। থপথপ শব্দ করে মাটিতে আছড়ে পড়তে লাগলো অদৃশ্য কিছু জিনিস। তবে খুব বেশিক্ষণ অদৃশ্য থাকলো না। ঘুরতেই দেখতে পেলাম ওগুলোকে। ক্ষুধার্ত পাখির দল। শূন্যের শকুনের দল।

এখন আর ছায়াবয়ব নয় ওগুলো। একদম বাস্তব মনে হচ্ছে। সোনালী আভার বিচ্ছুরণ যেখান থেকে শুরু হয়েছে ঠিক তার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পাখিগুলো। আশেপাশের গাছগুলোও বোঝাই পাখিতে, বিশাল একেকটা। আমার থেকেও বড়। ধীর পায়ে সামনে এগোনের চেষ্টা করছে কিন্তু হেম্পস্টক খামারের ভেতরে পা দেয়ার সাহস নেই।

ওগুলো দেখতে ঠিক কেমন সেটার বর্ণনা দেয়া খুব কঠিন কাজ। তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু যেই মাত্র অন্য দিকে তাকিয়েছি, অমনি ভুলে যাচ্ছি। তাদের আসল চেহারা মনে রাখতে পারছে না আমার মস্তিষ্ক। ধারাল নখ, বিশাল চোঙার মত বাঁকানো ঠোঁট আর পক্ষীর জায়গায় গুঁড় বড়জোর

এটুকু বলতে পারবো। অন্যদিকে তাকানো সত্যেও এটা বুঝতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না যে তাদের সমগ্র মনোযোগ আমার দিকে।

“বেশ, তোমরা এসেই গেছো যখন, এবার খুলে বলি নাহয়,” কোমরে হাত রেখে মিসেস হেম্পস্টক বললেন ওগুলোর উদ্দেশ্যে, “এখানে থাকতে পারবে না তোমরা। সেটা তোমাদের ভালো মতই জানা আছে নিশ্চয়ই? এবার দূর হও এখান থেকে,” একদম স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন তিনি।

একটা গুঞ্জন উঠলো ওগুলোর মধ্যে, যেন ফিসফিসিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। এরপরে সেই গুঞ্জনটা রূপ নিলো ব্যঙ্গাত্মক হাসির শব্দে।

ওগুলোর সম্মিলিত স্বর কানে আসলো একটু পর। নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয় যে ঠিক কোনটা কথা বলছে।

-আমরা শূন্যের শকুন- ক্ষুধার্ত পাখির দল। প্রাসাদ, রাজ্য, রাজা সবকিছু মাথা নত করেছে আমাদের সামনে যুগে যুগে। যেখানে ইচ্ছে সেখানে থাকতে পারি আমরা।

-আমাদের কাজে বাঁধা দেবার সুযোগ নেই।

-এই জগতের রক্ষী আমরা। আমাদের অবদান অনস্বীকার্য।

এরপরে এত জোরে হেসে উঠলো ওগুলো যে মনে হতে লাগলো একটা ট্রেন ঠিক আমাদের সামনে হুইসেল বাজাচ্ছে বিকট শব্দে। লেটির হাত শক্ত করে চেপে ধরলাম। আমাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে একবার মাথা দোলালো ও।

-ছেলেটাকে আমাদের দিয়ে দাও।

“এখানে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছো- তোমাদের আর আমাদের,” বললেন জিনি হেম্পস্টক। “ফিরে যাও যেখান থেকে এসেছো”।

-আমাদের এখানে ডাকা হয়েছিল। প্রাপ্য জিনিস না নিয়ে এখান থেকে যাবো না আমরা। সবকিছুর মধ্যে যাতে সাম্য বজায় থাকে সেদিকে নজর রাখাই আমাদের কাজ। তোমরা কি আমাদের সে কাজে ব্যাঘাত ঘটাবে?

“দরকার হলে ঘটাবো,” বললেন লেটির মা। “তোমাদের যে জমি ডাকা হয়েছিল সে কাজ শেষ করেছো তোমরা। এখন শুধু শুধু আমাদের সৃষ্টি করছো। চলে যাও, শকুনের দল। এখানে আর কোন দরকার নেই তোমাদের। চলে যাও!”

এবার হতাশার স্বর ভেসে আসলো পাখিগুলোর দিক থেকে।

লেটি এখনও দৃঢ়ভাবে ধরে আছে আমার হাত। “ওকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব আমাদের। আমাদের জমির ভেতরে আছে ও। আর এই জমিতে একবার পা রাখলেই নিঃশেষ হয়ে যাবে তোমরা। ভালোয় ভালোয় চলে যাও,” বলে উঠলো ও।

কিন্তু ওর হুমকিতে কাজ হলো বলে মনে হয় না। ওগুলো যেন আরো কাছে এগিয়ে আসলো। সাসেজের এই আন্দ্র আবহাওয়ায় শুধু বাতাসের শব্দ কানে আসছে, আর পাতার শব্দ। দূরে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠলো। কিন্তু এই নৈঃশব্দের মাঝেও বুঝতে পারলাম যে ক্ষুধার্ত পাখিগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। এখনও আমার দিকে চোখ ওগুলোর।

এসময় একটা গাছের ওপর থেকে বিশাল ডানা ঝাপটানোর শব্দ কানে আসলো আমাদের। সেই সাথে কানে আসলো ক্ষুধা আর বিজয় মিশ্রিত এক চিৎকার। কিভাবে ঠিক ক্ষুধা আর বিজয়ের কথাই মনে হলো শব্দটা শোনার পর সেটা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। শুধু অনুভব করতে পারলাম। আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো সে চিৎকার শুনে। যেন ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে সেখান থেকে।

-আমরা তোমাদের সীমানায় পা দিতে পারবো না, এটা সত্যি। তোমাদের জমি থেকে বাচ্চাটাকে ছিনিয়ে আসতে পারবো না, এটাও সত্যি। তোমাদের খামারেরও কোন ক্ষতি করতে পারবো না।

“একদম ঠিক। পারবে না তোমরা। তাই ভালোয় ভালোয় ফিরে যাও। তোমাদের তো একটা যুদ্ধে অংশ নেয়ার কথা এখন”।

-তোমাদের জগতের কোন ক্ষতি করতে পারবো না আমরা।

-কিন্তু এপাশের জগতের ক্ষতি করা থেকে কেউ থামাতে পারবে না আমাদের।

একটা পাখি সেটার ধারালো চঞ্চু দিয়ে আঘাত করল পায়ের কাছের মাটিতে। তুলে আনতে শুরু করলো সেখানকার সবকিছু। সাধারণ একটা পাখি মাটিতে ঠোকর দিলে যেমন হয়, তেমন কিছু ঘটলো না এক্ষেত্রে। বরং এই পাখিটা যেখানে ঠোকর দিচ্ছে সেখানেই সৃষ্টি হতে থাকলো খনিত। সেখানকার সব কিছু মিশে যেতে শুরু করলো অন্ধকারে।

বাস্তবতার পর্দা ছিড়ে যেতে শুরু করলো।

ঝাঁকে ঝাঁকে আশপাশের সবকিছু আক্রমণ করলো ক্ষুধার্ত পাখির দল। মুহূর্তের ব্যবধানে একটা ওক গাছ অদৃশ্য হয়ে গেলো। সেই সাথে ওটার পেছনে যা যা ছিল সেসবও।

একটা শেয়াল ঝোপ থেকে বের হয়ে গলি দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু সেটা দু'কদম না যেতেই আক্রমণ করলো পাখিগুলো। অদৃশ্য হয়ে গেলো ওটাও। সেখানে কেবল শূন্যতা।

“নানীমাকে জাগাতেই হবে আমাদের,” এবার লেটি বললো কথাটা।

“সেটা মোটেও পছন্দ হবে না মা'র,” মিসেস হেম্পস্টক বললেন জবাবে।

“তার চেয়ে বরং-”

“আর কোন উপায় নেই। তাকে জাগাতে না পারলে ধ্বংস হয়ে যাবে সবকিছু”।

“কিন্তু তাকে কিভাবে জাগাতে হবে সেটা জানা নেই আমার,” মিসেস হেম্পস্টক বললেন।

একদল পাখি উড়ে গেলো আকাশে। সেখানে মেঘের ফাঁকে ঠোট ঢুকিয়ে ছিড়ে ফেললো এক চিলতে রাতের আকাশ। এরপর গিলে ফেলো সেটা। কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা আকাশ চলে গেলো ওদের পেটে। সেখানে এখন ভর করেছে ধূসরাভ অসীম শূন্যতা।

আমি খুব সাধারণ একটা বাচ্চা ছেলে। আমার ভেতরেও কাজ করে স্বার্থপরতা, আমার ধারণা আমাকে ঘিরেই ঘোরে গোটা পৃথিবী। আমার চাহিদাগুলোর দাম সবচাইতে বেশি। গোটা জগতের সবচেয়ে মূল্যবান সৃষ্টি আমি। আমার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই।

তা সত্ত্বেও, বুঝতে পারলাম যে কি দেখছি। ক্ষুধার্ত পাখির দল ধ্বংস করে দেবে এই পৃথিবীকে। নাহ, ভুল বললাম- এখনই ধ্বংস করছে। আমার মা, বাবা, বোন, আমাদের বাসা, আমার স্কুল, বন্ধুবান্ধব, আমার শহর, দাদা দাদী, লন্ডন, ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়াম, ফ্রান্স, টেলিভিশন, বইপত্র, প্রাচীন মিশর কোন কিছুই কোন অস্তিত্ব থাকবে না। আর সেটার জন্যে দায়ী একমাত্র আমি।

মরতে চাই না আমি। আরসিলা মঙ্কটন যেভাবে মারা গেছে সেটার কথা মনে হলেই শিউরে উঠছি। এমন মৃত্যু কোনভাবেই কাম্য নয়- পাখিগুলোর ধারালো নখ আর চঞ্চুর আঘাতে।

লেটি হেম্পস্টকের হাত ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে দৌড় দিলাম। দ্বিধাবোধ করলাম না একটুও, একবার থামলেই সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হবো। জীবন বাঁচানোটাই মুখ্য মনে হবে তখন।

কতদূর দৌড়েছিলাম আমি? বেশিদূর না বোধহয়। পেছন থেকে লেটি হেম্পস্টক চিৎকার করে থামতে বলছে আমাকে। তবুও দৌড়াতে থাকলাম।

খামারের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে দৌড়াতে লাগলাম অসীম অন্ধকারের উদ্দেশ্যে। দৌড়ানোর সময়টাতেও নিজের প্রতি কাজ করছে প্রচণ্ড ঘৃণাবোধ। ঠিক যেমন ঘৃণাবোধ কাজ করেছিলো স্কুলের সুইমিং পুলে ঝাঁপ দেয়ার সময় সামনে যে খারাপ সময় এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম।

কবুতরের ঝাঁকের দিকে দৌড়ে গেলে ওগুলো যেভাবে উড়ে যায়, ক্ষুধার্ত পাখির দলও সেই একই ভঙ্গিতে উড়ে গেলো। তবে আমি জানি, আমাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে ওগুলো

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম ওগুলোর নেমে আসার। অপেক্ষা করতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম যে এই বুঝি আমার হৃদয় খুবলে নেয়া হবে।

বড়জোর দু'সেকেন্ড সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। কিন্তু মনে হতে লাগলো যেন অনন্ত কাল।

অবশেষে ঘটলো ব্যাপারটা। কিছু একটা পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো আমাকে। কাঁদায় মুখ খুবড়ে পড়ে গেলাম আমি। দম আটকে যাবার জোগাড় হলো।

(একটা কথা বলে রাখি সেই সময় কিছুক্ষণের জন্যে আমার মনে হয়েছিল যে আমি অনুভব করতে পারছি বুকের ভেতর থেকে হৃদয় সরিয়ে নেয়া হলে কেমন লাগবে। তবে কখনোই বেশি সময়ের জন্যে স্থায়ী হয়না এই স্মৃতিটা- দূরে সরে যায় স্বপ্নের মত)।

“বোকা ছেলে! একদম নড়বে না,” লেটির গলার স্বর কানে আসলো। চাইলেও নড়তে পারতাম না আমি সে মুহূর্তে। আমার ওপরে ভর দিয়ে আছে ও, আর আমার চেয়ে ওর ওজন অনেক বেশি। ভেজা মাটির ওপর আমাকে চেপে রেখেছে ও। কিছু দেখতেও পারছি না।

কিন্তু ওগুলোকে অনুভব করতে পারছি আমি।

বুঝতে পারছি যে ওর গায়ে আছড়ে পড়ছে পাখিগুলো। আমাকে ওগুলোর ছোবল থেকে রক্ষা করছে লেটি।

লেটির গলা থেকে একটা কাতর যন্ত্রনা বের হয়ে আসলো।

টের পেলাম যে কাঁপছে ভীষণভাবে।

“এসব কি হচ্ছে!” কেউ একজন বলে উঠলো

কণ্ঠস্বরটা আমার পরিচিত, কিন্তু সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম না যে কে কথা বলছে।

লেটি এখনও আমাকে রক্ষা করছে, কাঁপছে। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরটা শোনার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেলো ওর কাঁপুনি।

“কোন অধিকার বলে আমার বংশধরকে আক্রমণ করেছো তোমরা?”

কিছুক্ষণের নীরবতা। এরপর,

-আমাদের প্রাপ্য শিকার থেকে বঞ্চিত করছিলেন সে।

“তোমরা শূন্যের শকুন। আবর্জনা পরিষ্কার করা তোমাদের কাজ। আমাদের পরিবারের কাউকে আঘাত করার সাহস হলো কিভাবে?”

এখন আমি জানি কে কথা বলছে। লেটির নানীমা হেম্পস্টকের মত শোনাচ্ছে কণ্ঠস্বরটা। তবুও সেটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে আমার। যদি নানীমা হেম্পস্টক একজন সম্রাজ্ঞী হতেন, তাহলে অবশ্য মেনে নিতে কষ্ট হতো না। এতটা কর্তৃত্ব পরায়ন কণ্ঠস্বর আগে কখনও শুনিনি।

আমার পিঠে উষ্ণ আর ভেজা কিছু একটার স্পর্শ পেলাম এই সময়।

-“না... না, কত্রী”।

এই প্রথম পাখিগুলোর কণ্ঠস্বরে দ্বিধার আভাস পেলাম।

“সব কিছুর একটা নিয়ম আছে, আইন আছে। ওগুলো ভঙ্গ করেছো তোমরা”।

চুপ করে থাকলো ক্ষুধার্ত পাখির দল। তাদের বলার মত কিছু নেই।

লেটির শরীর গড়িয়ে পড়ে গেল আমার ওপর থেকে। ঘুরে তাকাতেই জিনি হেম্পস্টককে দেখতে পেলাম। মাথা গুঁজলাম তার কোলে। এক হাতে আমাকে আরেক হাতে লেটিকে ধরে রেখেছেন তিনি।

ছায়ার মধ্যে একটা পাখি বলে উঠলো, “আপনার ক্ষতির জন্যে আমরা দুঃখিত”।

“দুঃখিত!” স্পষ্ট রাগ আর ঘৃণা নানীমা হেম্পস্টকের কণ্ঠে।

জিনি হেম্পস্টক আমার লেটির উদ্দেশ্যে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলছেন। এখনও জড়িয়ে রেখেছেন আমাকে। মাথা উঠিয়ে কণ্ঠটা যদিও থেকে আসছিলো সেদিকে তাকালাম। সাথে সাথে চোখ জ্বালা করে উঠলো।

তবুও তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে।

নানীমা হেম্পস্টককেই দেখতে পাচ্ছি, জানি আমি। কিন্তু কি এখন একটা অন্যরকম। বোঝাতে পারবো না।

উজ্জ্বল একটা আভা ছড়াচ্ছে তাকে ঘিরে। তার চুল এখনও বয়স্কদের মত ধূসর, কিন্তু এই মুহূর্তে একদম সটান ভস্মিত হয়ে গেছে। আর তার চোখের জ্বালা জ্বলছে আতশবাজির

বিচ্ছুরণের মত। ভরদুপুরে মধ্য গগণে সূর্য যেভাবে আলো ছড়ায়, ঠিক সেভাবে আলো ছড়াচ্ছে তার মুখ থেকে।

যতক্ষণ সম্ভব তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে। এরপর চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

“তোমাদের কি সেই পুরনো অন্ধকার তারার ধ্বংসাবশেষের সাথে আটকে রাখবো আমি? যেখানে কেবল যন্ত্রনার অস্তিত্ব, আর একেকটা মুহূর্ত হাজার বছরের সমান। নাকি সৃষ্টির শুরুতে গিয়ে তোমাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলবো চিরতরে? তখন আর শূন্যের শব্দদের কেউ চিনবে না”।

জবাবের আশায় কান পেতে থাকলাম। কিন্তু কিছু শুনতে পেলাম না।

“তোমাদের সাথে কাজ শেষ আমার। কোন সুবিধাজনক সময়ে তোমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবো। এখন বাচ্চাদের দিকে মনোযোগ দিতে হবে আমাকে”।

-জী, কর্ত্তী।

-ধন্যবাদ, কর্ত্তী।

“দাঁড়াও! যাওয়ার আগে সবকিছু আগের অবস্থানে ফিরিয়ে রেখে যাও। আকাশের যেখানে যা ছিল ঠিক সেখানে ফিরিয়ে দেবে, ঐ ওক গাছটা ফিরিয়ে দেবে আর ফিরিয়ে দেবে শেয়ালটাকে। এরপর ফিরে যাবে তোমরা,” এটুকু বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন সম্রাজ্ঞী হেম্পস্টক। “হতচ্ছাড়া শবুনের দল”।

কে যেন একটা ছড়াগান গাইছে বিড়বিড় করে। কিছুক্ষণ পর খেয়াল করলাম যে আমি নিজেই গাইছি সেটা, সুর করে।

জিনি হেম্পস্টককে এখনও শব্দ করে ধরে আছি আমি। খামারের পরিবেশের গন্ধ পাচ্ছি তার শরীরে।

এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে লেটির কাঁধ হুঁলাম। কোন প্রকার নড়াচড়া করছে না ও।

“সব সীমা লঙ্ঘন করেছে ওরা। তোমাকে অনায়াসেই আঘাত করতে পারতো, তাতে খুব বেশি কিছু ঘটতো না। এই জগতটাকেও আঘাত করতে পারতো ওরা, ওতেও খুব বড় কোন ক্ষতি হতো না। কত জগতই তো এরকম মিশে গেছে অসীমে। কিন্তু আমাদের ছোট্ট লেটি হেম্পস্টক পরিবারের সদস্য। নিজেদের সীমার বাইরে গিয়ে ওকে আঘাত করেছে ওগুলো”।

লেটির দিকে তাকালাম। নিজীবভাবে মাথাটা ঝুঁকে আছে নিচের দিকে।
চোখজোড়া বন্ধ।

“ও আবার ঠিক হয়ে উঠবে তো?” জিজ্ঞেস করলাম।

কিছু জবাব দিলেন না লেটির মা। কেবল আমাকে আর লেটিকে আবার শক্ত করে চেপে ধরলেন বুকের মাঝে। আর গাইতে লাগলেন আগের গানটা।
এখন আর জ্বলছে না খামারটা। ছায়ার আড়াল থেকে কোনকিছু নজর রাখছে না আমার ওপর।

“আর দুশ্চিন্তা করো না,” নানীমা হেম্পস্টক বললেন। আবার আগের স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গি ফিরে এসেছে তার মধ্যে। “একদম নিরাপদ তুমি এখন।
চলে গেছে ওরা”।

“আবার ফিরে আসবে,” বললাম। “আমার হৃদয় খুবলে নেবে”।

“এই জগতে ফেরত আসবার মত দুঃসাহস আর হবে না ওদের,” বললেন নানীমা হেম্পস্টক।

একটা ধূসর রঙের জামা তার পরণে। কিছুক্ষণ আগে এটাকেই রূপালী মনে হচ্ছিল। তবে এই ধরণের জামা পরতো কয়েকশো বছর আগের মানুষজন।
নাতনীর ফ্যাকাসে কপালে হাত রাখলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর সরিয়ে নিলেন।

“সব শেষ,” লেটির মা মাথা নাড়িয়ে বললেন।

তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। নিজেকে বোকা মনে হতে লাগলো আরো আগে না বোঝার জন্যে। আমার পাশে মায়ের কোলে যে মেয়েটা গুয়ে আছে, সে তার নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে আমাকে বাঁচানোর জন্যে।

“ওগুলো তো আমার ক্ষতি করতে চেয়েছিলো, ওর না,” বললাম।

“তোমাদের কারোরই কোনপ্রকার ক্ষতি করার অধিকার ছিল না ওদের,”
একবার নাক টেনে বললেন নানীমা হেম্পস্টক। ভীষণ ক্ষম অপরাধবোধ হলো আমার। মনে হল কেউ যেন বুকের ওপর একশ মন ওজনের একটা পাথর চাপিয়ে দিয়েছে।

“ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত আমাদের,” উৎসাহী কণ্ঠে বললাম।

“ডাক্তার ডাকলেও হবে। তারা হয়তো ওকে সুস্থ করে তুলতে পারবে”।

জিনি হেম্পস্টক মাথা নাড়লেন কেবল।

“ও কি মারা গেছে?” জিজ্ঞেস করলাম।

“মারা গেছে?” নানীমা হেম্পস্টক আমার কথাটারই পুনরাবৃত্তি করলেন। একটু যেন ক্ষুব্ধ হয়েছেন আমার কথা শুনে। “হেম্পস্টকরা এতটাও সাধারণ না”।

“আহত হয়েছে ও,” জিনি হেম্পস্টক বললেন, আমাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। “খুব খারাপ ভাবে আহত হয়েছে। আমরা যদি এখনই কোন ব্যবস্থা না নেই তাহলে হয়তো ওর অস্তিত্ব মুছে যাবে চিরতরে”।

আমাকে শেষবারের মত আলিঙ্গন করলেন তিনি। ধীরে ধীরে তার কাছ থেকে সরে এসে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

জিনি হেম্পস্টকও দাঁড়ালেন। মেয়েকে ধরে আছেন দু’হাতে। লেটির শরীরটাকে দেখে আমার বোনের জীর্ণ পুতুলগুলোর কথা মনে পড়ে গেলো। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে থাকলাম। “সব দোষ আমার। আমি দুঃখিত, ভীষণ দুঃখিত”।

নানীমা হেম্পস্টক বললেন, “খারাপ কোন উদ্দেশ্য ছিল না তোমার”।

কিন্তু লেটির মা কোন কথা বললেন না। মেয়ের দেহটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন খামারের দিকে। মনেও হচ্ছে না যে লেটির কোন ওজন আছে, একটা বিড়ালছানাকে যেভাবে বয়ে নেয় কেউ, ঠিক সেভাবে ওকে ধরে আছেন জিনি হেম্পস্টক। যেন একটা বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। একসময় খামারবাড়ির পেছনের পুকুরটার কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা।

কোন প্রকার বাতাস বইছে না এখন। চারদিক একদম নীরব। চাঁদের আলোয় পুকুরটা দেখা যাচ্ছে, একদম সাধারণ একটা পুকুর। আর সেটার পানিতে প্রতিফলিত চাঁদটা একদম সাধারণ। কিছুক্ষণ আগের পূর্ণিমার চাঁদটা আর দেখা যাচ্ছে না।

পুকুর পাড়ে এসে থেমে গেলাম আমি। নানীমা হেম্পস্টক থামলেন আমার পাশে।

কিন্তু জিনি হেম্পস্টক থামলেন না।

হাঁটু অবধি পানিতে নেমে গেলেন। তার পরনের কোট আর স্কাটো ভাসছে পানিতে। একসময় একদম পুকুরটার মাঝে পৌঁছে গেলেন তিনি। পানি এখন তার কোমর অবধি।

এরপর কাঁধ থেকে লেটিকে নামিয়ে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিলেন পানির ওপর। মেয়েটার শরীর ভাসতে লাগলো পানিতে।

পেছাতে গুরু করলেন জিনি হেম্পস্টক। এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরিয়েছেন না মেয়ের দিক থেকে।

এসময় কিছু একটা ধাবিত হবার শব্দ কানে আসলো। যেন ঝড়ো হাওয়া বয়ে আসছে আমাদের দিকে।

লেটির শরীর কেঁপে উঠলো।

আশেপাশে কোন বাতাস নেই। তবুও পুকুরের পানি নড়ছে। ঢেউগুলো বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে, সাগরের পানির মত। “আমি দুঃখিত, লেটি,” বিড়বিড়িয়ে বললাম।

এক ধরনের আভা বিচ্ছুরিত হতে লাগলো পানি থেকে। ঠিক যেমন ভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল বালতি থেকে। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম সেদিকে। পানিতে কালো রঙের যার অবয়বটা ভাসতে দেখা যাচ্ছে সে আমার জীবন বাঁচিয়েছে।

কেউ একজন হাত রাখলো আমার কাঁধে। “কেন দুঃখপ্রকাশ করছো তুমি? ওকে মেরে ফেলার জন্যে?”

মাথা নাড়লাম আমি। মুখ খোলার সাহস হচ্ছে না।

“মারা যায়নি ও। তুমি মারোনি ওকে। ক্ষুধার্ত পাখির দলও কিছু করতে পারেনি, অবশ্য ওকে ডিঙিয়ে তোমার সান্নিধ্য পাবার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েছিল। লেটিকে ওর সাগরের কাছে দিয়ে দিয়েছি আমরা। একদিন, সময়মতো আবার ওকে ফেরত দেবে সাগরটা”।

আমার গোল্ডফিশটার কথা মনে পড়লো। মনে পড়লো যে কিভাবে মারা যাবার আগের মুহূর্তে শেষবারের মত লেজটা নাড়িয়েছিল ও। “ও কি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে?” জিজ্ঞেস করলাম।

“কোন কিছুই আগের জায়গায় স্থির থাকে না,” নানীমা হেম্পস্টক মৃদু হেসে বললেন। “প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বদলায় সবকিছু। এটাই নিয়ম। লেটিও বদলাবে নিশ্চয়ই, ঠিক যেমন বদলাবে ওর সাগরটা”।

জিনি হেম্পস্টক উঠে এসেছেন পুকুর থেকে। আমার পাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। ঢেউগুলো একবার তীরে আছড়ে পড়ছে, আবার ফিরে যাচ্ছে। দূর থেকে একটা গর্জন ভেসে আসছে। ধীরে ধীরে জোয়ারলো হচ্ছে গর্জনটা। যেন সাগরের ওপার থেকে আমাদের দিকে এসে আসছে কিছু একটা।

অবশেষে দেখতে পেলাম ওটাকে। নীল রঙের একটা বিশাল ঢেউ। আমার থেকে উঁচু, এমনকি খামারবাড়িটা থেকেও উঁচু। লেটি হেম্পস্টকের দেহের কাছে এসে ভেঙে পড়লো ওটা। ভেঙেছিলাম যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমাদেরকে, কিন্তু সেরকম কিছু হলো না।

কোন শব্দ হলো না ঢেউটা আছড়ে পড়ার। মুখের কাছে তুলে নেয়া হাতটা নিচে নামালাম। এখন আবার শান্ত হয়ে এসেছে পুকুরের পানি, জ্বলজ্বল করছে না একটুও। আর পদ্মপাতা ছাড়া আর কিছু ভেসে বেড়াচ্ছে না পুকুরের বুকে। সেখানে বাঁকা চাঁদের প্রতিবিম্বটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। নানীমা হেম্পস্টকও চলে গেছেন। আমি ভেবেছিলাম যে এখনও আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আমি আর জিনি হেম্পস্টক ছাড়া আর কেউ নেই পুকুর পাড়ে। “আমিই বাসায় পৌঁছে দেবো তোমাকে,” বললেন তিনি।

লেটিদের গোয়ালঘরের পেছনে একটা ল্যান্ড রোভার গাড়ি রাখা আছে দেখলাম। দরজাগুলো খোলা ওটার, ইগনিশনে চাবিও লাগানো আছে। প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসলাম আমি। কিছুক্ষণ পর মিসেস হেম্পস্টক এসে ড্রাইভিং সিটটাতে বসে ইঞ্জিন চালু করলেন।

হেম্পস্টকদের কেউ যে গাড়ি চালাতে পারে সেটা আগে কেন যেন মাথায় আসেনি আমার। “আপনাদের গাড়ি আছে সেটা জানতাম না আমি,” বললাম।

“অনেক কিছুই জানো না তুমি,” কিছুটা রুক্ষ শোনালো মিসেস হেম্পস্টকের গলা। “আর কারো পক্ষে সবকিছু জানা সম্ভবও নয়,” এই কথাটা আমার দিকে তাকিয়ে নরম স্বরে বললেন তিনি। গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে চালাতে শুরু করলেন এরপর। খামার থেকে বের হয়ে এবড়ো খেবড়ো পথ ধরে এগোতে থাকলাম আমরা।

একটা বিষয় এখনও আমার মাথায় ঘুরছে।

“নানীমা হেম্পস্টক বললেন যে লেটি মারা যায় নি,” বললাম আমি। “কিন্তু ওকে দেখে তো জীবিত মনে হচ্ছিল না আমার”।

জিনি হেম্পস্টককে দেখে মনে হলো যেন সত্যটা স্বীকার করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পরে বললেন, “খুব বেশি আহত হয়েছে ও। সাগরটা ওকে বরণ করে নিয়েছে। সত্যি কথা বলতে, আমি আসলে নিজেও জানি না যে কখনও ওকে ফেরত দেবে নাকি সাগরটা। কিন্তু আশা তো আর ছাড়া যাবে না, তাই না?”

“না, মোটেও ছাড়া যাবে না,” দৃঢ় কণ্ঠে বললাম।

গলি ধরে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে গাড়িটা।

“ও কি আসলেও আপনার মেয়ে ছিল?” (আমি জানি না সেদিন আমার মাথায় কি ঘুরছিলো, কেন এই অদ্ভুত প্রশ্নটা করেছিলাম)। হয়তো লেটির সম্পর্কে আমার স্বাভাবিক কৌতূহলের কারণেই প্রশ্নটা করা। যে মেয়েটা নিজের জীবন দিয়ে আমাকে রক্ষা করেছে তার সম্পর্কে জানতে চাওয়াটা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়?

“সেটা বলা যায়,” বললেন জিনি হেম্পস্টক। “পুরুষ হেম্পস্টকরা, মানে আমার ভাইদের কথা বলছি - খামার থেকে বেরিয়ে অনেকের সাথে সম্পর্কে জড়ায়। সেখানে বাচ্চাকাচ্চা হয় তাদের। তেঁাদের জগতে খুঁজলে আরো

নারী হেম্পস্টকদের পাওয়া যাবে। কিন্তু লেটির নানীমা, আমি আর লেটিই হচ্ছে সবচেয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বা”।

“তার মানে ওর কোনদিনই বাবা ছিল না?” জিজ্ঞেস করলাম।

“না”।

“আপনার কি বাবা ছিল?”

“তুমি দেখি আজ একটার পর একটা প্রশ্ন করেই যাচ্ছে। তোমার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, নাহ, আমাদের ক্ষেত্রে অমনটা হয় না, তুমি যেরকম ভাবছো”।

“আমাকে বাসায় নিয়ে যাবার কোন দরকার নেই। সাগর থেকে লেটি না ফিরে আসা পর্যন্ত আপনাদের সাথেই থাকতে চাই আমি। আপনাদের খামারের কাজে সাহায্য করতে পারবো, ট্র্যাক্টর চালানো শিখতে পারবো”।

“না,” আন্তরিক স্বরে বললেন জিনি হেম্পস্টক। “তোমার নিজের একটা আলাদা জীবন আছে। আর সেই জীবনের জন্যে অনেক বড় মূল্য চুকিয়েছে লেটি। ও নিশ্চয়ই চাইবে না যে বাকি জীবনটা খামারেই কাটিয়ে দাও তুমি”।

আবার আক্ষেপে ভরে উঠলো মন। কেউ একজন আপন্যার জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে সেটা জানার পর স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করাটা ভীষণ কঠিন। সর্বক্ষণ মনের এক কোণে এই চিন্তাটা ঘুরতে থাকে যে উৎসর্গকারীর উৎসর্গটা যাতে বৃথা না যায়।

“সেটা সহজ হবে না অবশ্য,” যেন আমার মনের কথাটাই বললেন জিনি হেম্পস্টক।

আমাদের বাসার ড্রাইভওয়েতে গাড়িটা পার্ক করলেন তিনি। দু’জনই বের হয়ে আসলাম গাড়ি থেকে।

মিসেস হেম্পস্টক আমাদের বাসায় কলিংবেল বাজিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তার আগে পাপোসে ভালমতো মুছে নিয়েছেন রুটজোড়া। কিছুক্ষণ পর মা এসে দরজা খুলে দিল। গোলাপী রঙের ঘুমানোর পোশাক তার পরনে।

“আপনার ছেলেকে পৌঁছে দিতে এসেছি,” বললেন জিনি হেম্পস্টক।

“লেটির চলে যাওয়া উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানটা করা হয়েছিল সেখানে অনেক মজা করেছে ও। এখন কিছুটা বিশ্রাম দরকার”। কিছুক্ষণ বিভ্রান্তি খেলা করলো মা’র চোখেমুখে। এরপর সেখানে ভর করলো হাসির আভাস।

“আপনি কষ্ট করে আসতে গেলেন কেন?” বললো মা। “আমাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন গিয়ে নিয়ে আসলেই তো হতো”। এরপর আমার দিকে চোখ বড় করে তাকালো মা।

“আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মিসেস হেম্পস্টক,” তাড়াতাড়ি বললাম আমি।

“লেটি চলে যাচ্ছে?” মা জিজ্ঞেস করলো।

“হ্যাঁ,” জবাব দিলেন মিসেস হেম্পস্টক। “অস্ট্রেলিয়ায় ওর বাবার সাথে থাকবে ও। আপনার ছেলের কথা মনে পড়বে আমাদের। লেটি ফিরে আসলে জানাবো আমি, তখন আবার একসাথে খেলতে পারবে ওরা”।

খুব ক্লান্ত লাগছে আমার। দাওয়াতে গিয়ে একটু বেশিই ছুড়োছুড়ি করে ফেলেছি, যদিও ওটার ব্যাপারে খুব বেশি কিছু মনে করতে পারছি না এখন। হেম্পস্টকদের খামারে আর কখনও যাওয়া হবে না আমার, লেটিই তো থাকবে না সেখানে। অস্ট্রেলিয়ার চলে যাবে ও।

অস্ট্রেলিয়া অনেক দূরে। সেখান থেকে আবার কবে ফিরবে ও কে জানে। পৃথিবীর আরেক প্রান্তে থাকবে লেটি, আর আমাদের মাঝে থাকবো অনেকগুলো সাগর।

মনের এক কোণে কেন যেন মনে হচ্ছিল যে আজ সন্ধ্যায় কোন অনুষ্ঠানে নয়, অন্য কোথাও ছিলাম আমি। তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না সে চিন্তাটা। মিসেস হেম্পস্টক তার পুরনো ল্যান্ড রোভারটায় চড়ে বের হয়ে গেলেন আমাদের ড্রাইভওয়ে থেকে। তাকে সেবারই শেষ দেখেছিলাম আমি।

আমি যে পোশাকগুলো পরে আছি সেগুলো দেখে একটুও অবাক মনে হলো না মা’কে।

“একটা খারাপ খবর আছে,” আমার দিকে তাকিয়ে বললো সে।

“কি?”

“আরসালা চলে গেছে। ওর পরিবারের কে যেন ভীষণ অসুস্থ”।

কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। আরসালা মঞ্চটনকে কখনোই পছন্দ ছিল না আমার।

তার চলে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সিঁড়ির ওপরে আমার পুরনো বেডরুমটা আবার ফাঁকা হয়ে যাওয়া। মা যখন জিজ্ঞেস করলো যে আগামী কয়েক দিন সেখানেই ঘুমোতে চাই কিনা, না করে দিল্লীতে কেন না করলাম সেটা অবশ্য আমার নিজেরই বোধগম্য হলো না। ঐ ঘরটার ছোট হলুদ বেসিনটাও আর টানছে না আমাকে।

আমার বোন আর আমি এক ঘরেই থাকতাম এর পরের ছয় বছর। এরপর সেই বাসাটা থেকে চলে আসি আমরা (যদিও আমাদের দু'জনই ঘোর বিরোধী ছিলাম এই সিদ্ধান্তের)।

আমরা চলে আসার পরপরই ভেঙে ফেলা হয় বাড়িটা। কিন্তু সেটা দেখতে যাইনি আমি। বাড়িটার প্রতিটা ইট আমার মজ্জার সাথে মিশে গিয়েছিলো। ওগুলো গুড়িয়ে যাবার দৃশ্য সহ্য করাটা কঠিন হতো আমার জন্যে।

তারও বেশ কয়েক বছর পর আমার বোন আমাকে বলে যে মা আরসালা মঙ্কটনকে চাকরি থেকে বের করে দিয়েছিলো কারণ তার সাথে পরকীয়া করছিলো বাবা (এখনও আরসালা মঙ্কটনের একনিষ্ঠ ভক্ত আমার বোন)। আমিও খুব একটা দ্বিমত পোষণ করিনি ওর সাথে। অবশ্য তাকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেসও করিনি।

সেই রাতটার ব্যাপারে বাবার সাথে কোনদিন কথা হয়নি আমার। বাবার জীবন থেকে একটা শিক্ষা নিয়েছিলাম। কোনদিন কারো উদ্দেশ্যে চিৎকার করিনি আমি, বিশেষ করে শিশুদের উদ্দেশ্যে।

একসময় বাবার সাথেও বন্ধুর মত সম্পর্ক হয়ে যায় আমার। তবে সেটা আমার বয়স বিশ বছর হবার পর। তার ইচ্ছে ছিল যে ছেলে খেলাধুলায় মনোযোগী হবে, গল্পের বইয়ে নয়। আমাকে বড়র বানাতে চেয়েছিলো বাবা। কিন্তু ওসব কোনদিনই টানেনি আমাকে, যতটা টানতো বইয়ের পাতায় সারাদিন বুঁদ হয়ে থাকার উন্মত্ততা।

গলির শেষ মাথায় আর কোনদিন যাইনি আমি। সাদা মিনিভ্যানটার কথাও মনে পড়তো না। সেই ওপাল মাইনারের স্মৃতি বলতে শুধু দুটো ওপাল পাথর, আমাদের খাবার ঘরের তাকের ওপর রাখা। আমার স্মৃতিতে তার চেহারাটা বাদামী রঙের, কার্বন মনোঅক্সাইডের বিসক্রিয়ায় মৃত ব্যক্তির মত লাল নয়।

আমাকে মস্টার নামের যে বেড়ালটা দিয়েছিলেন ওপাল মাইনার সেটা কিছুদিন পরেই আমাদের বাসা ছেড়ে চলে যায়। মাঝেমাঝে গলিতে ঘুরতে দেখতাম ওটাকে। আমরা ডাকলে কাছেও আসতো না। সত্যি কথা বলতে, সেটার জন্যে খুব একটা আফসোসও হতো না আমার।

আমাদের বড় বাড়িটা ভেঙে সেখানে ছোট ছোট বেশ কয়েকটা বাড়ি বানানো হয়। কর্মজীবী লোকজনেরা থাকতো ওগুলোতে। সেই ছোট ছোট বাড়িগুলো কোনদিনই টানেনি আমাকে।

সব গল্পেই দেখা যায় যে শুরুতে যে চরিত্রগুলো থাকে সেগুলো শেষদিকে এসে বদলে যায়। কিন্তু আমার জীবনে গল্পের মত দিনগুলোর স্থায়ীত্ব ছিল মোটে কয়েক দিন। তাই খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেনি আমার মধ্যে।

লেটি চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরের ঘটনা, মে মাস নাহয় জুন মাস হবে তখন- স্কুল থেকে বাসায় ফিরে দেখি আমাদের বাড়ির দরজার সামনে একটা কালো রঙের বেড়াল বসে আছে। যেন আমার জন্যেও অপেক্ষা করছিল ওটা। বেড়ালটার চোখদু'টো সবুজাভ-নীল বর্ণের। দেখলেই সাগরের কথা মনে পড়ে। কানের কাছটা সাদা ওটার।

আমার সাথে সাথে ভেতরে চলে আসে বেড়ালটা।

মস্টারের জন্যে যে খাবার কেনা হয়েছিল সেখান থেকেই খাবার নিয়ে একটা বাটিতে করে খেতে দেই ওকে।

আমার বাবা-মা মস্টারের অনুপস্থিতি নিয়েও কোন সাড়াশব্দ করেনি আবার এই নতুন বেড়ালটা নিয়েও কিছু বললো না। কয়েক সপ্তাহ পার হবার পর বাবা খেয়াল করেন যে আমাদের বাসার বেড়ালটার রঙ কমলা থেকে কালো হয়ে গেছে।

রাতের বেলা বাতি নিভিয়ে দেয়া হলে আমার বিছানাতে উঠে পড়তো বেড়ালটা। বালিশের পাশে শুয়ে ঘুমাতো। ওটার গায়ে অন্ধকারে হাত বুলিয়ে দিতাম আমি।

ওর চোখগুলো দেখলেই সাগরের কথা মনে পড়তো আমার। তাই ওর নামও রাখি 'সাগর'। সেটার পেছনে অন্য কোন কারণ ছিল কি না বলতে পারবো না।

লাল ইটের খামার বাড়িটার পেছনে পুকুর পাড়ের সবুজ রঙের বেঞ্চটাতে বসে আছি আমি এখনও। ভাবছি আমার বেড়ালটার কথা।

আমার সাথে বেশ কয়েক বছর ছিল সাগর নামের বেড়ালটা। ওকে ভীষণ আদরও করতাম আমি। কিন্তু এক সময় যা হবার তাই হয়েছিলো মারা যায় ও। ওর মৃত্যুর সময়গুলোর কথা কখনও মনে পড়ে না আমার।

এসময় খামারবাড়ির দরজা খুলে কারো আমার দিকে হেঁটে আসার শব্দ কানে আসলো। কিছুক্ষণের মধ্যে বয়স্ক মহিলাটা আমার পাশে এসে বসলেন।

“তোমার জন্যে চা নিয়ে এসেছি আমি,” বললেন। “এত সময় ধরে বসে আছো এখানে! আমি তো ভেবেছিলাম পড়েই গেছো বুঝি পানিতে”।

“সেখানেই ডুবে ছিলাম বলা যায়,” বললাম আমি। চা আর স্যান্ডউইচের জন্যে ধন্যবাদ জানালাম। এখানে বসে থাকতে থাকতে কখন যে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, খেয়ালই করিনি আমি।

চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে একবার চুমুক দিলাম। এরপর তার দিকে তাকালাম ভালো করে। চল্লিশ বছর আগের স্মৃতির সাথে তুলনা করলাম কিছুক্ষণ, এরপর বললাম, “আপনি লেটির মা নন, তাই না? আপনি নানীমা হেম্পস্টক”।

“ঠিক বলেছো,” একদম স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন তিনি। “এবার স্যান্ডউইচটা শেষ করো”।

স্যান্ডউইচে একবার কামড় বসলাম। দারুণ হয়েছে খেতে এটা। এখনও স্মৃতিগুলো খেলা করছে আমার মনে। “এসব কি আসলেও ঘটেছিল?” জিজ্ঞেস করলাম।

“যা তোমার মনে পড়েছে?” কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন নানীমা হেম্পস্টক। “ঘটতেও পারে। সবার স্মৃতিতে সব জিনিস একরকম থাকে না। একই ঘটনা দুইজন দু’ভাবে মনে রাখে”।

আরেকটা প্রশ্নের জবাব চাই আমার। “এখানে কেন এসেছি আমি?” জিজ্ঞেস করলাম।

এমন ভাবে আমার দিকে তাকালেন তিনি যেন বোকার মত প্রশ্ন করে ফেলেছি। “শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে,” বললেন তিনি। “সেখানে সবার থেকে কিছুক্ষণ দূরে থাকার ইচ্ছে হয়েছিলো তোমার, তাই পুরনো

বাড়িটার ওখানে ফিরে গিয়েছিলে। কিন্তু সেখানে গিয়েও শান্ত হয়নি তোমার মন, তাই এখানে ছুটে এসেছো, বরাবরের মতনই”।

“বরাবরের মতন মানে?” কড়া লিকারের চাটায় এক চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

“প্রতিবারই এমনটা ঘটে”।

“না,” বললাম আমি। “লেটি অস্ট্রেলিয়া চলে যাবার পর এখানে আর আসিনি আমি,” এটুকু বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। “আমি জানি যে আসলে অস্ট্রেলিয়ায় যায়নি ও, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমি কি বলতে চাচ্ছি”।

“এখানে মাঝেমাঝেই ফিরে আসো তুমি,” বললেন তিনি। “চব্বিশ বছর বয়সে একবার এসেছিলে। তারপরের যখন এসেছিলে তখন দু’টা ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে তোমার। ত্রিশ-বত্রিশ হবে তোমার বয়স তখন। ভালো করে তোমাকে খাইয়েছিলাম সেবার”।

“আমার মনে নেই”।

“সেটাতেই মঙ্গল সবার জন্যে,” চোখের ওপর থেকে চুল সরাতে সরাতে বললেন।

চা এবং স্যান্ডউইচ শেষ করলাম। পেন্সট আর কাপ- দু’টোই খালি এখন।

“এখানে কেন এসেছি আমি?” তাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম।

“লেটি চেয়েছিলো যে তুমি আসো,” কেউ একজন বলে উঠলো।

খেয়াল করলাম পুকুরে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মহিলা, তিনিই বলেছেন কথাটা। একটা বাদামী ড্রেসিং গাউন আর ওয়েলিংটন বুট তার পরনে। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মহিলার বয়স আমার চেয়ে কম মনে হচ্ছে, ত্রিশের কাছাকাছি হবে। বুঝতে পারলাম যে জিনি হেম্পস্টকের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। তার চেহারা গত চল্লিশ বছরে একটুও পরিবর্তন হয়নি।

তিনিও আমার পাশে এসে বসলেন বেঞ্চ। আমার দু’পাশেই এখন দু’জন হেম্পস্টক মহিলা বসে আছেন। “আমার ধারণা ও জানতে চায় যে কেমন আছো তুমি”।

“কেন?”

“ওর উৎসর্গটা বৃথা যায়নি এটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায় বোধহয়”।

“আমার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলো ও”।

“ক্ষুধার্ত পাখিগুলো তোমার হৃৎপিণ্ড টেনে বের করে এনেছিলো। মারা যাবার আগে বিকট চিৎকার করছিলে তুমি। কিন্তু সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি লেটি। তাই কিছু একটা করতেই হতো ওকে”।

ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করলাম। “কিন্তু আমার স্মৃতিতে তো ব্যাপারটা অন্যভাবে ঘটেছিল”।

“বললাম না তোমাকে? একেকজন একেক ভাবে মনে রাখে একটা ঘটনা,” বললেন নানীমা হেম্পস্টক।

“ওর সাথে কথা বলতে পারি আমি?”

“ঘুমোচ্ছে ও,” লেটির মা বললেন। “সেরে উঠছে ধীরে ধীরে। কিন্তু এখনও কথা বলার পর্যায়ে আসেনি”।

“ওখান থেকে লেটি ফিরে না আসা পর্যন্ত কথা বলতে পারবে না,” পুকুরটার দিকে ইঙ্গিত করে নানীমা হেম্পস্টক বললেন।

“কবে আসবে?”

“যখন একদম সেরে উঠবে ও,” নানীমা হেম্পস্টক বললেন। “শীঘ্রই”।

“বেশ,” বললাম আমি। “আমাকে দেখার জন্যেই যদি এখানে নিয়ে এসে থাকে ও, তাহলে দেখতে দিন ওকে,” কথাটা বলার মাঝেই বুঝতে পারলাম যে ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। কতক্ষণ এই বেঞ্চটাতে বসে আছি আমি? এতক্ষণ ধরে নিশ্চয়ই আমার ওপর নজর রেখেছে ও। “আমাকে দেখেছে ও, তাই না?”

“হ্যাঁ”।

“পরীক্ষায় পাস করেছি আমি?”

আমার ডান পাশে বসে থাকা বয়স্ক মহিলার মুখের ভঙ্গি দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আমার বাম পাশ থেকে মিসেস হেম্পস্টক বললেন, “জীবনের পরীক্ষায় পাস ফেল বলে কিছু নেই”।

খালি কাপ আর পেন্সটটা মাটিতে নামিয়ে রাখলাম।

“গতবার তোমাকে যে অবস্থায় দেখেছিলাম এখন সে তুলনায় ভালো আছো মনে হচ্ছে,” জিনি হেম্পস্টক বললেন।

এই জিনি হেম্পস্টকের বুকেই একদিন ভয়ে মাথা গুজেছিলাম আমি। কিন্তু আজ তাকে আমার চেয়ে ছোট মনে হচ্ছে। এখন আর তিনি আমাকে স্বাস্থ্যনা দিতে পারবেন বলে মনে হয় না।

আকাশে পূর্ণ চাঁদ দেখা যাচ্ছে এখন। শেষবার যখন চাঁদের দিকে তাকিয়েছিলাম তখন সেটা কত বড় ছিল তা মনে পড়ছে না। আসলে শেষ কবে মনোযোগ দিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়েছি সেটাও বলতে পারবো না।

“এখন কি হবে?”

“তুমি এখানে আসার পর প্রতিবার যা হয়,” বললেন নানীমা হেম্পস্টক।

“বাড়ি ফিরে যাবে তুমি”।

“আমার কোন বাড়ি নেই এখন আর,” বললাম আমি।

“প্রতিবারই এই কথা বলো তুমি,” জিনি হেম্পস্টক বললেন।

আমার স্মৃতিতে লেটি হেম্পস্টকের বয়স এখনও এগারো বছর। কিন্তু আজ যদি দেখা হতো ওর সাথে, তাহলে কেমন চেহারা হত?

উঠে দাঁড়িয়ে পুকুরটার কাছে এগিয়ে গেলাম। ঝুঁকে পানি ছুঁয়ে বললাম, “লেটি, আমার জীবন বাঁচানোর জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। এই ঋণ কখনো শোধ করতে পারবো না”।

“প্রথম দিনেই তোমাকে ঐ কমলা আকাশের নিচে নিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি ওর,” নানীমা হেম্পস্টক বললেন। “না করেছিলাম আমি। যাইহোক, এ থেকে পরবর্তীতে শিক্ষা নেবে ও”।

ঘুরে নানীমা হেম্পস্টকের দিকে তাকলাম। “আপনি কি আসলেও মনে করতে পারেন যে চাঁদটা কখন তৈরি হয়েছিল?” জিজ্ঞেস করলাম।

“অনেক কিছুই মনে করতে পারী আমার,” বললেন নানীমা হেম্পস্টক।

“এখানে কি আবার ফিরে আসবো আমি?”

“সেটা তোমার জানার দরকার নেই,” জবাবে বললেন তিনি।

“ফিরে যাও এখন,” জিনি হেম্পস্টক বললেন। “তোমার খোঁজ করতে শুরু করেছে তোমার আত্মীয় স্বজনরা”।

তার কথায় সংবিৎ ফিরে পেলাম আমি। আমার বোন, তার স্বামী, ভাগ্না-ভাগ্নিসহ অন্য সবাই এতক্ষণে আমার অনুপস্থিতির কথা শুনে অবাক হচ্ছে নিশ্চয়ই।

“আশা করি আপনাদের বিরক্ত করিনি আমি,” বললাম।

“না, মোটেও বিরক্ত হইনি আমরা,” নানীমা হেম্পস্টক বললেন।

এসময়ের একটা বিড়ালের ডাক শুনতে পেলাম। অন্ধকার থেকে একটা কালো রঙের বেড়াল ছানা বের হয়ে এসে আমার পায়ে মুখ ঘষতে লাগলো। ওটার কানের কাছে একটা সাদা দাগ।

“এরকম একটা বিড়াল ছিল আমার,” বললাম। “কিন্তু ওর ব্যাপারে বেশি কথা মনে নেই আমার”।

“ওকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলে তুমি,” জিনি হেম্পস্টক বললেন। এরপর খুব অল্প সময়ের জন্যে আমার কাঁধে হাত রাখলেন, চাপ দিলেন আলতো ভাবে।

উঠে গেলেন বেঞ্চ থেকে।

পেন্সট আর কাপটা নিয়ে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। বয়স্ক মহিলাটার পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম পুরনো বাড়িটার উদ্দেশ্যে।

“কিছুক্ষণের জন্যে আমার মনে হয়েছিল যে আপনার মত আরেকজন বসে আছে আমার পাশে। অদ্ভুত না ব্যাপারটা?”

“আমি বাদে অন্য কেউ ছিল না”।

“সেটা জানি আমি”।

পেন্সট আর কাপটা রান্নঘরে নিয়ে যাবো ভাবছিলাম, কিন্তু আমাকে বাড়িটার দরজার কাছে থামিয়ে দিলেন তিনি, বললেন, “তোমার ফিরে যাওয়া উচিত এখন। নাহলে খুঁজতে বের হবে সবাই”।

“আজকে আমার অনুপস্থিতি মনে হয় না কাউকে ভাবাবে,” বললাম আমি। অবশ্য আমার বোন নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা করবে। আর যারা আমাকে সমবেদনা জানাতে এসেছিল তারাও নিশ্চয়ই হতাশ হয়ে ফেরত যাবে।

“আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমাকে পুকুর পাড়ে বসতে দেয়ার জন্যে”।

“ও কিছু না,” বললেন তিনি।

“লেটি আবার চিঠি দিলে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাবেন ওকে”।

“ঠিক আছে। তোমার কথা শুনে নিশ্চয়ই খুশি হবে ও”।

গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করলাম। বয়স্ক মহিলাটা পেছন থেকে তাকিয়ে থাকলো আমার দিকে। বের হয়ে আসলাম খামারটা থেকে। গাড়ির আয়নায় খামারবাড়িটা দেখা যাচ্ছে। সেখানে মনে হচ্ছে যেন একসাথে দু’টা চাঁদ বুলছে আকাশে। একটা পূর্ণ চাঁদ, আরেকটা অর্ধ পূর্ণ।

কৌতূহলবশত পেছনে ঘুরে তাকালাম। আকাশে একটাই চাঁদ। আলোর কারসাজিতে অমনটা দেখেছিলাম নিশ্চয়ই।

মাঝে মাঝে এমন হয়, অবাস্তব জিনিসকে বাস্তব মনে হয় ভীষণ। কিন্তু পরক্ষণেই ভেঙে যায় ভুল, মুখোমুখি হতে হয় জীবন নামের বাস্তবতার।

.....